নির্বাচিত চল্লিশ হাদীসের ব্যাখ্যা
بسم الله الرحمن الرحيم
আল-কাওলুল মাতীন
বা
মুক্তির বাণী
মাওলানা আব্দুল বাতেন জৌনপুরী (রহঃ)
সম্পাদনায়ঃ
মাওলানা মুফতী আবু সাঈদ (দাঃ বাঃ)
www.islamiclife.wapsite.me

প্রকাশক ঃ
দারুল কিতাব লিল-বাহ্ছিল ইলমী
(ইলমে দ্বীন গবেষণা গ্রন্থাগার)
শিলাস্তান, কচুয়া, চাঁদপুর
-এর পক্ষ হতে

জনাব আলহাজ্ব নূর মুহাম্মদ
সিটি ইঞ্জিনিয়ারিং সিণ্ডিকেট
২২২/বি নবাবপুর রোড, ঢাকা।

প্রথম প্রকাশ ঃ
মুহাররম-১৪২০
বৈশাখ-১৪০৬
এপ্রিল-১৯৯৯

মূল্য ঃ ৬০.০০ টাকা মাত্র

অক্ষর বিন্যাস ঃ
মনি কম্পিউটার, মনোহরপুর কুমিল্লা।

উৎসর্গ

স্নেহময়ী পরম শ্রদ্ধেয় আব্বা-আম্মা ও হযরাত আসাতিযায়ে কিরামের উদ্দেশ্যে, যাঁদের ত্যাগ-কুরবাণী, শাসন-সোহাগ ও পরিশ্রমের বদৌলতে ইল্‌মে দ্বীনের সংগে জড়িত থাকার তাওফীক প্রাপ্ত হয়েছি। সাথে সাথে স্মরণ করছি হযরত মাওঃ আব্দুল বাতেন জৌনপুরী (রহঃ)কে, যাঁর কিতাবকে কেন্দ্র করে অনুবাদ ও লিখার ক্ষেত্রের কলম ধরতে সুযোগ পেয়েছি।

জামেয়া হামীদিয়া বটগ্রাম কুমিল্লার প্রতিষ্ঠাতা তিলমীযে
শায়খুলহিন্দ ওলিয়ে কামেল আলহাজ্ব হযরত মাওঃ
আব্দুল হামীদ (রহঃ)-এর সুযোগ্য ছাহেবজাদা

হযরত মাওঃ আব্দুল আজীজ সাহেব

(দাঃবাঃ)-এর

দোয়া ও বাণী

আমার স্নেহাস্পদ জামেয়া হামীদিয়া বটগ্রাম-এর উস্তাদ মাওঃ মুহাম্মাদ ইবরাহীম সাহেব "আল কাউলুল মাতীন ফী শরহে আরবাঈন" নামক কিতাব খানার অনুবাদ ও ও সংযোজন করিয়াছেন। আমি ইহার বিভিন্ন জায়গা হইতে শুনিয়াছি। মা-শাআল্লাহ্ তাআলা! ইহাতে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় দ্বীনী বিষয়ের উপর আলোচনা করা হইয়াছে। তাই প্রত্যেক মুসলিম পরিবারে ইহার এক কপি রাখা অত্যন্ত আবশ্যক বলিয়া মনে করি। দোয়া করি, যেন আল্লাহ তাআলা ইহাকে কবুল ও মনযুর করেন এবং এই তরুন লেখককে এই ধরনের আরও বই-পুস্তক লিখিয়া ইসলাম ও মুসলমানগণের খেদমত করার তৌফীক দান করেন। আমীন।

আব্দুল আজীজ

তাং-২৭-০৪-৯৯ইং

(সাবেক মুহতামিম জামেয়া হামীদিয়া বটগ্রাম, কুমিল্লা।)

প্রখ্যাত বুযুর্গ ফেনীস্থ উলামা বাজার মদ্রাসার সাবেক মুহতামিম
হযরত মাওঃ আঃ হালীম (রহঃ)-এর বিশিষ্ট খলীফা
জামিয়া হামীদিয়া বটগ্রাম কুমিল্লার মুহতামিম

হযরত মাওঃ নূরুল হক সাহেব

(দাঃবাঃ)-এর

অভিমত ও দোআ ঃ

জনাব মাওঃ ইব্রাহীম ছাহেব মোহাদ্দেস বটগ্রাম মাদ্রাসা কর্তৃক অনূদিত ও সংযোজিত "আল-কাউলুল মাতীন বা মুক্তির বাণী" এর কিছু অংশ দেখার সুযোগ হইয়াছে। যতটুকু আমি দেখিয়াছি, মা-শাআল্লাহ! অতীব প্রয়োজনীয় মনে হইয়াছে। সকল মুসলমান এই কিতাবটি পড়া এবং নিজের ছেলেমেয়েদের পড়ানো দরকার মনে করি। দোয়া করি যেন, এই বইখানা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন কবুল করেন এবং অনুবাদকের জন্য ও মুসলমানদের জন্য নাজাতের উছীলা করিয়া দেন এবং এইরূপে আরো পুস্তক লিখার তাওফীক দান করেন। আমীন।

نور الحق
৭/১/১৫.

অনুবাদকের কথা

ওয়ারাছাতুল আম্বিয়া হিসাবে যুগে যুগে দ্বীনের সংস্কার ও প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিবেদিত প্রাণ যে সব আউলিয়ায়ে কেরামের নাম ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে ফেলা যায় না, তাঁদেরই একজন হলেন বিখ্যাত বুযর্গ মাওঃ কারামত আলী জৌনপুরী (কুঃ সিঃ ১২১৫-১২৯০ হিঃ)। উপমহাদেশে সুলতানী যুগের পর মোগল আমলে নানাবিধ কুসংস্কার ও বিভ্রান্তির শিকার হয় মুসলিম সমাজ। শীআ, বিদআতী ও বিভ্রান্ত আলিমদের দাপট পৌঁছে যায় প্রশাসনের সর্বোচ্চ মহল পর্যন্ত। ফলে, সম্রাট আকবর ইসলামসহ হিন্দু, বৌদ্ধ ও খৃষ্টান সকল ধর্মের সংমিশ্রনে দ্বীনে এলাহী নামে একটি সর্ব ভারতীয় ধর্মের জন্ম দেয়। এই সুকঠিন দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে প্রয়োজন ছিল একজন শক্তিশালী সংস্কারকের, যিনি একজন উলুল আয্ম পয়গম্বরের নায়েবরূপে বিবেচিত হবেন। সেই মুহূর্তে ঠিক এমনি এক মনীষী শায়খ আহমাদ সেরহিন্দী (রহঃ ৯৭১-১০৩৪ হিঃ) আবির্ভূত হলেন, যিনি মুজাদ্দিদে আলফে সানী নামে পরিচিত। এহেন পরিস্থিতির মোকাবেলায় তিনি প্রধানতঃ দুটি কর্মসূচী গ্রহণ করেন-দ্বীনে এলাহীর প্রতিবাদ ও যাবতীয় কুসংস্কারের প্রতিরোধ। দ্বীনে এলাহী নিপাতের পর হিজরী দ্বাদশ শতকে মুসলিম সমাজ প্রধানতঃ দুটি সমস্যার সম্মুখীন হয়-বিদ্আত ও কুসংস্কারের সয়লাব এবং বস্তুবাদী চিন্তা ও দর্শনের ক্রমাগত আগ্রাসন। হিজরী দ্বাদশ শতকের এই যুগ সন্ধিক্ষণে যেই সংস্কারক মনীষীর আবির্ভাব ঘটেছিল তিনি হলেন হযরত শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহঃ ১১১৪-১১৭৬ হিঃ)। তিনি বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন "সব ঘুনে ধরা ব্যবস্থা ভেঙ্গে দাও এবং বিশুদ্ধ উপায়ে পূনর্গঠন কর।" কালক্রমে অগ্রসরমান বস্তুবাদ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা লাভ করলে ১৮০৩ সালে ইংরেজ জাতি দিল্লী দখল করে নেয়। তখন ছিল শাহ্ ওয়ালিউল্লাহর পুত্র শাহ্ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহঃ ১১৫৯-১২৩৯ হিঃ)-এর যুগ। তিনি নতুন আরেকটি কর্ম সূচী যোগ করে ভারতবর্ষকে "দারুল হরব" ঘোষণা দেয়ার মাধ্যমে উপমহাদেশে স্বাধীনতা সংগ্রামের গোড়া পত্তন করেন। তাঁর এই চেতনাকেই সমর অভিযানে উন্নীত করে গোটা উপমহাদেশকে আলোড়িত করে তুলেন তাঁর সুযোগ্য খলীফা হযরত মাওঃ সাইয়েদ আহমাদ শহীদ বেরেলভী (রহঃ ১২০১-১২৪৬ হিঃ)। আজ পর্যন্ত তিনি মুসলিম সমাজে আমীরুল মুজাহিদীন ও শহীদে বালাকোট নামে পরিচিত। তাঁরই একজন প্রসিদ্ধ খলীফা ছিলেন হযরত মাওঃ শাহ কারামত আলী জৌনপুরী (রহঃ)। তিনি ও তাঁর আওলাদ

সাইয়েদ শহীদ বেরেলভী (রহঃ)-এর জিহাদ ও সংস্কার অভিযানের অংশ হিসাবে দাওয়াতী ও ইসলাহী কর্মসূচী নিয়ে বাংলায় আগমন করেন এবং স্বার্থপর বিদআতী সম্প্রদায় কর্তৃক ওহাবী আখ্যাসহ বিরুদ্ধাচরণ, অর্ধাহার ও অনাহার প্রভৃতি কষ্ট-যাতনা বরদাস্ত করেন। তাঁরই কনিষ্ঠ পুত্র সুযোগ্য আলেম হযরত মাওঃ আব্দুল আউয়াল (রহঃ)-এর সুযোগ্য ছাহেবজাদা হলেন হযরত মাওঃ আব্দুল বাতেন জৌনপুরী (রহঃ)। তিনি মানুষের সংশোধনের জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্বীনী বিষয়াদির উপর চল্লিশখানা হাদীস নির্বাচন করে উহার সরল তরজমা ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা সহ একখানা পুস্তক রচনা করেন এবং উহার নামকরণ করেন "আল-কাওলুল মাতীন ফী-শরহে আরবাঈন"। যেহেতু উলামায়ে জৌনপুর এ দেশবাসীর ভক্তিভাজন তাই তাঁদের কিতাবগুলো দ্বারা এ দেশবাসী মুসলিম জনগণ সহজে উপকৃত হতে পারবেন—এই আশা নিয়ে আমি উক্ত কিতাবখানার বঙ্গানুবাদ করেছি এবং এই কিতাবের অধিকাংশ হাদীসগুলো ও তার ব্যাখ্যার সাথে সামঞ্জস্য শীল কিছু কথা হাদীসগুলোর অধীনে উল্লেখ করেছি। যাতে বিস্তারিতভাবে জানতে আগ্রহী পাঠকগণ কিছুটা হলেও উপকৃত হতে পারেন।

অনুবাদের ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখা হয়েছে, যেন গ্রন্থকারের উদ্দেশ্যের মধ্যে বিচ্যুতি না ঘটে এবং সংযোজিত বিষয়গুলো বড়দের কিতাবাদি থেকেই সংগৃহীত হয়েছে। অবশ্য প্রাসংগিকভাবে এক-দুই কথা সংযোজকের পক্ষ থেকে হয়ে যাওয়াও অস্বাভাবিক নয়। জ্ঞানগত ও ভাষাগত দুর্বলতার সাথে সাথে লিখার ময়দানে ইহাই হলো আমার জীবনের সর্বপ্রথম উদ্যোগ। তাই ভুলত্রুটি থাকা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। সুহৃদ সুধী পাঠক মহল কর্তৃক আমাকে অবগত করা হলে আমি কৃতজ্ঞ থাকব এবং পরবর্তী সংস্করণে তা শুধরে নেয়ার চেষ্টা করব, ইন্‌শাআল্লাহ।

সবশেষে শুক্‌রিয়া জ্ঞাপন করছি সেই সকল দোস্ত-আহ্‌বাব ও ভাইদের প্রতি যারা অনুবাদ, সংযোজন, কম্পোজ ও ছাপানোর ব্যাপারে আমাকে সহযোগিতা করেছেন পরামর্শ, সংশোধন, অর্থসংস্থান ও কিতাবাদি ইত্যাদির মাধ্যমে। বিশেষভাবে শুকরিয়া আদায় করছি জনাব মুফতী সাহেবের। তিনি তাঁর অত্যধিক ব্যস্ততার মধ্য দিয়েও পাণ্ডুলিপি খানার সম্পাদনা করে দিয়েছেন। অবশ্য সম্পাদনার পরও কিছু কথা তাঁর সম্মতিক্রমে সংযোজিত হয়েছে। যদি কোন বিচ্যুতি কারো দৃষ্টি গোচর হয় তাহলে বুঝতে হবে তা অনুবাদকেরই দুর্বলতা, অন্য কারো নয়। মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে প্রার্থনা যে, তিনি অধমের এই নগন্য মেহনতটুকু আমাদের সকলের হেদায়েত ও নাজাতের মাধ্যমরূপে কবুল করুন। আমীন।

বিনয়াবনত

মুহাম্মদ ইবরাহিম

২১/১২/১৯ হিঃ

সূচীপত্র

বিষয় ঃ	পৃষ্ঠা ঃ

বিষয় ঃ	পৃষ্ঠা ঃ

বিষয় ঃ পৃষ্ঠা ঃ

গ্রন্থকারের ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

হাম্দ ও সালাতের পর অধম আব্দুল বাতেন বিন মাওলানা হাফেজ আব্দুল আউয়াল বিন মাওলানা শাহ কারামত আলী জৌনপুরী (কুদ্দিসা সিরূরুহু)-এর পক্ষ থেকে মুসলমানদের খিদমতে আরয এই যে, বান্দা তরজমা ও ব্যাখ্যা সহ এই চল্লিশখানা হাদীস সংকলন করেছে, যেন মুসলমান ভাইদের উপকারে আসে এবং আল্লাহ পাক স্বীয় করুনায় এই অধমকে চল্লিশ হাদীস সম্পর্কে নবী ঘোষিত সুসংবাদের অধিকারী করেন।

বস্তুতঃ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতিশ্রুতি ও সুসংবাদই অধমকে এ-কাজে উৎসাহিত করেছে। শাফাআতের আকাংখী প্রত্যেক আলেমের জন্য উচিত, দ্বীন বিষয়ক চল্লিশখানা হাদীস সংকলন করে মানুষের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়া। যাতে প্রত্যেকেই সারওয়ারে কাইনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শাফাআতের অধিকারী হতে পারেন। আলেম, হাফেজ ও ইমামগনের জন্য সমীচীন হবে, স্বীয় দ্বীনী অনুষ্ঠানগুলোতে-বিশেষভাবে জুমুআর দিনে অর্থ ও ব্যাখ্যা সহ এই হাদীসগুলো পড়ে জনসাধারনকে বুঝিয়ে দেয়া এবং তৎপ্রতি আমলের জন্য উৎসাহিত করা। এ-ভাবে সাধারণ লোকেরাও উক্ত সুসংবাদের অধিকারী হয়ে যেতে পারবে। উক্ত সুসংবাদের হাদীসখানা এইঃ

مَنْ حَفِظَ عَلٰى اُمَّتِىْ اَرْبَعِيْنَ حَدِيْثًا فِىْ اَمْرِ دِيْنِهَا بَعَثَهُ اللّٰهُ فَقِيْهًا وَكُنْتُ لَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ شَافِعًا وَشَهِيْدًا

"যে ব্যক্তি আমার উম্মতের কল্যানে দ্বীন বিষয়ক চল্লিশখানা হাদীস সংরক্ষন করবে, কিয়ামত দিবসে আল্লাহপাক তাকে ফকীহ তথা শরীঅত বিশেষজ্ঞ আলেম রূপে উঠাবেন আর আমি হব সে দিন তার পক্ষে সুপারিশকারী ও সাক্ষ্যদাতা।"

আলেমগনের মতে চল্লিশখানা হাদীস মানুষের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়াই এ-হাদীসটির উদ্দেশ্য।

এই হাদীসটির আলোকেই অধিকাংশ আলেম চল্লিশ হাদীস লিখে প্রচার করেছেন। একই আশা নিয়ে অধম নিজেও এই চল্লিশখানা হাদীস সংকলন করেছে এবং এর নামকরন করেছে "আল-কাওলুল মাতীন ফী-শরহে আরবাঈন"। আল্লাহ তাআলা ইহাকে কবুল করে নিন ॥ আমীন ॥

ওয়াস্সালাম -
আব্দুল বাতেন জৌনপূরী
যিলহজ্ব - ১৩৪২হিঃ

بسم الله الرحمن الرحيم

১ নং হাদীস

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوٰى ؛

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "আমলের মূল্যায়ন হয় একমাত্র নিয়তের দ্বারা। যে-যা নিয়ত করবে সে তাই পাবে।" - (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ নিয়তবিহীন আমল অশুদ্ধ কিংবা সওয়াবের অযোগ্য হয়। কোন ব্যক্তি তার কাজে যেরূপ নিয়ত করবে সেরূপ ফল-ই পাবে। যেমন, কেউ খাবার খেল ইবাদতে শক্তি পাওয়ার নিয়তে, পোষাক পরলো নামায শুদ্ধ হওয়ার উদ্দেশ্যে। আবার একটি আমলে একাধিক নিয়তের অবকাশ রয়েছে। যেমন, মসজিদে বসা একটি আমল। তাতে বিভিন্নরূপ নিয়ত করা যেতে পারে - নামাযের অপেক্ষা করা, চোখ-কান পাপমুক্ত রাখা, নফল এ'তেকাফ করা। এরূপ নিয়তকারী তার প্রত্যেকটি নিয়তের কারনে পৃথক পৃথক বসার সওয়াব লাভ করবে।

উক্ত হাদীসে যেসব আমলের বিশুদ্ধতার ক্ষেত্রে নিয়তকে জরুরী সাব্যস্ত করা হয়েছে তা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো "আ'মালে মাকসূদা বা উদ্দেশ্যসূচক ইবাদাত।" যেমন ঃ নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত ইত্যাদি। এরূপ আমল নিয়ত ব্যতীত শুদ্ধ হয় না। 'নিয়ত' অর্থ অন্তরে ইচ্ছা করা। মুখে কিছু বলা শর্ত নয়।

সংযোজন ঃ ইবাদত তিন প্রকার ঃ-

এক ঃ اَلْعِبَادَاتُ الْمَقْصُوْدَةُ وَالْمَحْضَةُ বা উদ্দেশ্য সূচক ইবাদাত। অর্থাৎ যে সব আমল শরীঅতে সরাসরিভাবে সাব্যস্ত হয়েছে - অন্য কোন আমলের মাধ্যমরূপে নয়। যেমন ঃ নামায, রোযা ইত্যাদি। এগুলোর বিশুদ্ধতা ও সওয়াব লাভ - উভয় ক্ষেত্রেই নিয়ত আবশ্যকীয়। এতে কারো দ্বিমত নেই।

দুই ঃ "اَلْعِبَادَاتُ الْاٰلِيَةُ وَالْغَيْرُ الْمَقْصُوْدَةِ" বা মাধ্যমরূপী ইবাদাত। অর্থাৎ যেসব আমল উদ্দেশ্যসূচক ইবাদত বিশুদ্ধ হওয়ার মাধ্যম হেতু ইবাদাতরূপে গণ্য হয়েছে। যেমন ঃ পোষাক এবং জায়গার পবিত্রতা নামায শুদ্ধ হওয়ার মাধ্যম। এগুলোর বিশুদ্ধতার ক্ষেত্রে নিয়ত শর্ত নয়, তবে সওয়াবের জন্য নিয়ত শর্ত। এতেও কারো দ্বিমত নেই।

তিন ঃ "اَلْعِبَادَاتُ ذَوَاتُ الْجِهَتَيْنِ" বা দ্বিবিধ ইবাদাত। অর্থাৎ ঐসব আমল যে গুলোকে একদিকে যেমন উদ্দেশ্যসূচক ইবাদতের বিশুদ্ধতার মাধ্যম বলা যায়,

অপরদিকে উদ্দেশ্য সূচক ইবাদতও বলা যায়। যেমন, ওযু এবং গোসল। এগুলোতে উদ্দেশ্য সূচক ইবাদতের বিশুদ্ধতার মাধ্যম হওয়ার দিকটা যেমন প্রযোজ্য, তেমনি ইবাদত হওয়ার দিকটাও বিদ্যমান রয়েছে। এগুলোর সওয়াব লাভের ক্ষেত্রে নিয়ত শর্ত। এতেও কারো ভিন্ন মত নেই। তবে বিশুদ্ধতার ক্ষেত্রে নিয়ত শর্ত কি-না, এ ব্যাপারে ফকীহ্ আলেমগনের মতভেদ রয়েছে।

শাফেয়ী ফকীহ্গন ইবাদতের দিকটাকে প্রাধান্য দিয়ে বলেছেন ঃ ওযু এবং গোসলে নিয়ত করা ফরয, নিয়ত ব্যতীত ওযু ও গোসল শুদ্ধ হয় না। পক্ষান্তরে হানাফী ফকীহ্গন ত্বাহারত ও মাধ্যম হওয়ার দিকটাকে প্রাধান্য দিয়ে বলেছেন ঃ ওযু ও গোসলে নিয়ত করা ফরয নয়, বিনা নিয়তেও ওযু-গোসল শুদ্ধ হয়ে যায়।

নিয়ত সংশ্লিষ্ট আমল তিন প্রকার ঃ যথা-নেককাজ, পাপকাজ ও মুবাহ্ কাজ। নেক কাজের বিশুদ্ধতা কিংবা সওয়াবের জন্য নিয়ত করা জরুরী। যে কোন নেক কাজে সওয়াবের জন্য সৎ নিয়ত জরুরী। নিয়ত অসৎ হলে সওয়াব পাওয়া যায় না, যদিও কাজটি শুদ্ধ হয়ে যায়। যেমন, রিয়া বা লোক দেখানোর নিয়তে ইবাদত করলে যদিও তা শুদ্ধ হয়ে যায়; কিন্তু সওয়াব পাওয়া যায় না। পাপকাজে সৎ নিয়ত হতেই পারে না; বরং কোন কোন ক্ষেত্রে সৎ নিয়তের কারণে ঈমান চলে যাওয়ার আশংকা থাকে। আর মুবাহ্কাজ স্বভাবগতভাবে সওয়াব ও গুনাহ কোনটারই কারণ নয়; বরং নিয়তের দ্বারাই সওয়াব বা গুনাহের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মুবাহ আমল সৎ নিয়তে সৎ কাজে, আর অসৎ নিয়তে অসৎকাজে পরিনত হয়।

নিয়তের হাদীসটির উদ্দেশ্য ঃ বিশ্বের অন্যতম মুহাদ্দিস আল্লামা আনওয়ার শাহ্ কাশ্মীরী (রহঃ) বলেন ঃ সৎ নিয়ত ও অসৎ নিয়তের বর্ণনা দেয়াই আলোচ্য হাদীসটির উদ্দেশ্য।

তাসাউফ শাস্ত্রের হাকীকত ঃ শায়খুল হাদীস আল্লামা যাকারিয়া মুহাজিরে মাদানী (রহঃ) বলেন ঃ নিয়তকে বিশুদ্ধ করাই তাসাউফ শাস্ত্রের হাকীকত। অতএব, যে কোন কাজে প্রথমে নিয়তকে শুদ্ধ করে নেয়া উচিত। কেননা, বিশুদ্ধ নিয়তের দ্বারা মুবাহ কাজও ইবাদতে পরিনত হয়।

তাসাউফের প্রাথমিক ও সর্বশেষ স্তর ঃ তিনি আরো বলেছেন, আমাদের ত্বরীকত ও তাসাউফের প্রাথমিক স্তর হলো - إنَّمَا الأعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ। অর্থাৎ সর্বকাজে নিয়তকে বিশুদ্ধ করণ এবং উহার সর্বশেষ স্তর হলো - أنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَأنَّكَ تَرَاهُ
অর্থাৎ এ - মনোভাব নিয়ে আল্লাহ্র ইবাদত করা, যেন তাঁকে দেখা যাচ্ছে।

নিয়তের হাদীসখানার গুরুত্ব ও মর্যাদা ঃ হযরত শায়খ মুহাক্কিক শাহ মুহাম্মদ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (রহঃ) বলেন ঃ "নিয়তের হাদীসখানা দ্বীনের মূলনীতি সমূহের মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সর্বাধিক পূর্নাঙ্গ ও উপকারী একটি হাদীস। যেহেতু

কথা, কর্ম ও নিয়ত-এ-তিনটির সমন্বিত রূপই দ্বীন, তাই কেউ কেউ একে দ্বীনী ইলমের এক তৃতীয়াংশ বলে আখ্যা দিয়েছেন। আবার কেউ একে অর্ধেক ইল্‌ম সাব্যস্ত করেছেন। কেননা, আমল দুই প্রকারঃ যথা-অন্তর দ্বারা সম্পাদিত আমল এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা সম্পাদিত আমল। অন্তর দ্বারা সম্পাদিত আমল সমূহের মধ্যে নিয়ত সর্বোত্তম আমল।

বস্তুত ঃ নিয়তই আন্তরিক ও দৈহিক যাবতীয় ইবাদতের মূল ভিত্তি। এ -সূত্রে নিয়তকে সম্পূর্ণ ইল্‌ম বলা হলেও অত্যুক্তি হবে না।"

অসৎ নিয়তের পরিণাম ঃ ✪ হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম তিন ব্যক্তির বিচার অনুষ্ঠিত হবে। প্রথম ব্যক্তি আল্লাহর পথে শহীদ হয়েছিল। তাকে হাজির করে তাকে দেয়া আল্লাহর নিয়ামত সমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। সে সকল নিয়ামতের স্বীকৃতি দিবে। অতঃপর তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, তুমি এই সমস্ত নিয়ামতের কৃতজ্ঞতাস্বরূপ কী কাজ করেছ? সে বলবেঃ আমি তোমার জন্য লড়াই করে শহীদ হয়েছি। আল্লাহ বলবেনঃ তুমি মিথ্যা বলেছ। আসলে তোমাকে যাতে লোকে বীর বলে সেই জন্য লড়াই করেছিলে। লোকে তোমাকে তো বীর বলেছে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার আদেশ দেয়া হবে। দ্বিতীয় ব্যক্তি আল্লাহর কাছ থেকে প্রচুর ধন-সম্পদ লাভ করেছিল। তাকে হাজির করে আল্লাহর নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হবে। সে আল্লাহর নিয়ামতের কথা স্বীকার করবে। অতঃপর জিজ্ঞাসা করা হবেঃ তুমি এই বিপুল সম্পদ দ্বারা কী সৎকাজ করেছ? সে বলবেঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার পথে যেখানেই অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন দেখেছি, সেখানেই অর্থ ব্যয়ে ইতস্তত ঃ করিনি। আল্লাহ বলবেন ঃ তুমি মিথ্যা বলেছ। তুমি আমার পথে নয়; বরং লোকে যাতে তোমাকে দানশীল বলে প্রশংসা করে, সেই জন্য দান করেছ। লোকেরা তোমাকে তো দানশীল বলেছেই। অতঃপর তাকেও জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তৃতীয় ব্যক্তি দুনিয়ার জীবনে ইল্‌মেদ্বীন অর্জন করেছিল, অন্যকেও তা শিক্ষা দিতো এবং কুরআন পাঠ করতো। তাকে হাজির করে তাকে প্রদত্ত আল্লাহর নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হবে এবং সে তা স্বীকার করবে। জিজ্ঞাসা করা হবে যে, তুমি এই দ্বীনি ইল্‌ম দ্বারা কী কাজ করেছ? সে বলবেঃ আমি ইল্‌মে দ্বীন শিখেছি, তা শিক্ষাও দিয়েছি এবং তোমার সন্তুষ্টির জন্য কুরআন পাঠ করেছি। আল্লাহ বলবেনঃ তুমি মিথ্যাবাদী। তুমি আমার সন্তুষ্টির জন্য নয়; বরং লোকেরা যাতে তোমাকে ক্বারী বলে প্রসংসা করে, সেই জন্য অধ্যয়ন করেছ। অতঃপর তাকেও জাহান্নামে নিক্ষেপ করার নির্দেশ দেয়া হবে। (সহীহ মুসলিম)

✪ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভয়ংকর যে জিনিসটি ছড়িয়ে পড়ার আশংকা করি, সেটি হচ্ছে ছোট শিরক। জিজ্ঞাসা

করা হলো যে, হে আল্লাহর রাসূল ! ছোট শিরক কী ? তিনি বললেন ঃ রিয়া অর্থাৎ লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে সৎ কাজ করা। আল্লাহ যেদিন তাঁর বান্দাদেরকে কর্মফল দিবেন সেদিন বলবেন ঃ যাদেরকে দেখানোর জন্য তোমরা সৎকাজ করতে তাদের কাছে চলে যাও এবং দেখ, তাদের কাছে কোন প্রতিদান পাও কিনা। (আহমাদ, বায়হাকী)

✪ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মানুষকে শুনানোর জন্য সৎকাজ করে, আল্লাহ তাকে শুনাবেন। আর যে ব্যক্তি মানুষকে দেখানোর জন্য করে, আল্লাহ তাকে দেখাবেন। (বুখারী ও মুসলিম) ইমাম খাত্তাবী (রহঃ) বলেন ঃ এই হাদীসের মর্ম এই যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তোষের জন্য নয়; বরং মানুষকে শুনানো ও দেখানোর জন্য কাজ করে আল্লাহ তাকে এভাবে শাস্তি দিবেন যে, তার কাজের প্রকৃত উদ্দেশ্য ফাঁস করে দিয়ে কিয়ামতের দিন জনসমক্ষে তাঁকে অপমানিত করবেন।

✪ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সামান্যতম রিয়াও শিরকের শামিল। (তাবঃ, হাঃ) ✪ ইব্‌নে আবিদ্দুনিয়া হাদীস বর্ণনা করেন যে, কিয়ামতের দিন রিয়াকারকে চারটি নাম ধরে ডেকে বলা হবে ঃ ওহে রিয়াকার, ওহে ভন্ড, ওহে পাপিষ্ঠ, ওহে ক্ষতিগ্রস্ত। যাও, যাকে খুশী করার জন্য কাজ করেছিলে, তার কাছ থেকে তোমার পুরস্কার নাওগে। আমার কাছে তোমার জন্য কিছুই নেই। (কিতাবুল কাবাইর)

খাঁটি নিয়ত বা ইখ্‌লাসের পরিচিতি ও উদ্দেশ্য ঃ জনৈক মুসলিম মনীষীকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা (ইখলাস) কাকে বলে ? তিনি জবাব দিলেন ঃ মানুষ নিজের পাপ যেমন লুকায়, তেমনি তার ভাল কাজকেও লুকাবে। এটা নিষ্ঠা বা ইখ্‌লাস। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো ঃ ইখ্‌লাস বা আন্তরিকতার উদ্দেশ্য কি ? তিনি বললেন ঃ লোকে তোমার প্রশংসা করুক এটা কামনা না করা।

হযরত ফুযায়ল ইব্‌নে ইয়ায (রহঃ) বলেন ঃ লোকের ভয়ে খারাপ কাজ ত্যাগ করা রিয়াকারী, আর মানুষকে খুশী করার জন্য ভাল কাজ করা শিরক। আর ইখ্‌লাস হচ্ছে এই উভয় রোগ থেকে মুক্ত থাকার নাম।

হযরত আবু উমামা বাহেলী (রাযিঃ) এক ব্যক্তিকে দেখলেন, মসজিদে সিজদায় থাকাকালে উচ্চস্বরে কেঁদে কেঁদে আল্লাহর কাছে দোআ করছে। আবু উমামা তাকে বললেন ঃ এরূপ কান্নাকাটি তোমার বাড়িতে বসে করলেই ভাল হতো। হযরত আলী (রাযিঃ) বলেন ঃ রিয়াকারের আলামত এই যে, একাকী থাকলে উদাসীন ও অলস হয়ে যায়, আর লোকজনের মধ্যে থাকলে সক্রিয় হয় এবং প্রশংসা করলে বেশী করে সৎ কাজ করে আর ভুল ত্রুটি ধরিয়ে দিলে বা নিন্দা সমালোচনা করলে সৎকাজ কমিয়ে দেয়। (কিঃ কাঃ)

'নিয়ত' শব্দের অর্থ ঃ এর আভিধানিক অর্থ, অন্তরে ইচ্ছা করা। শরীঅতের পরিভাষায় নিয়ত বলে, আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কোন কাজের প্রতি অন্তরে

ইচ্ছা পোষন করা। এতে বুঝা গেল যে, অন্তরের ইচ্ছাকে মুখের ভাষায় ব্যক্ত করার নাম নিয়ত নয়। না-অভিধানে, না-শরীঅতে।

নিয়তের সর্বনিম্ন স্তর ঃ অন্তরে নিয়তের বিষয় বস্তুর উপস্থিতি এ-পরিমান থাকা যে, কেউ এ-বিষয়ে প্রশ্ন করলে তাৎক্ষনিক তা- বলে দেয়া যায়। অতএব, যদি কারো অন্তরের নিয়ত সঠিক হওয়ার পর মুখের নিয়ত ভুল হয়ে যায়, তাতে কোন ক্ষতি নেই; কিন্তু এর বিপরীত হলে ইবাদত শুদ্ধ হবে না।

নামাজের নিয়ত করার তরীকা ঃ নিয়তের মধ্যে দিন এবং রাকাতের সংখ্যা নির্ধারন করা জরুরী নয়; বরং এগুলোতে আন্তরিক নিয়তের ভুলও ক্ষতিকর নয় এবং ওয়াক্তিয়া ফরয পড়ছি-এরূপ নিয়ত করাও জরুরী নয়; বরং ফরয নামাযের ওয়াক্ত এবং নামাযের নাম নির্ধারন করাই যথেষ্ট। যেমন, মনে মনে এতটুকু ইচ্ছা রাখা যে, আমি যোহরের ফরয পড়ছি, আমি আছরের ফরয পড়ছি, আমি জানাযার নামায পড়ছি। ওয়াজিব নামাযে কেবল ওয়াজিবের নাম নির্ধারন করাই যথেষ্ট। যেমন, এতটুকু ইচ্ছা রাখা যে, আমি বিতিরের নামায পড়ছি, আমি ঈদের নামায পড়ছি, আমি মান্নতের নামায পড়ছি। নফল, সুন্নত ও তারাবীহে শুধু নামাযের নিয়ত করাই যথেষ্ট। নফল, সুন্নত কিংবা তারাবীহ বলতে হবে না। যেমন এতটুকু নিয়ত করা যে, আমি নামায পড়ছি। তবে জমাআতের নামাযে ইমামের পিছনে ইক্তেদার নিয়ত করা জরুরী।

নামাজের নিয়ত সম্পর্কে একটি মাস্আলা ঃ নিয়ত তাকবীরে তাহরীমার পূর্বে করতে হবে। তাকবীরে তাহরীমার পরে নিয়ত করলে নামায শুদ্ধ হবে না। যদি কেহ তাকবীরে তাহরীমা বলার পূর্বে মনে মনে নিয়ত করে আর তাকবীরে তাহরীমার পরে মুখে নিয়তের উচ্চারণ করে তাহলে তার নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। কেননা, তাকবীরে তাহরীমার পূর্বে মনের নিয়তের কারণে তার নামাযের আরম্ভ শুদ্ধ হয়েছিল; কিন্তু পরে মুখের উচ্চারণের কারণে নামায ফাসেদ হয়ে গেছে। (আশবাহ ও নাযায়ের)

শরীঅতের দৃষ্টিতে নিয়তের মৌখিক উচ্চারন ঃ পরবর্তী যুগের কিছু সংখ্যক ফকীহ আলেমের মতে নিয়তের মৌখিক উচ্চারন মুস্তাহ্সান বা পছন্দনীয় বিষয়। কারণ, এতে নিয়তের বিষয়বস্তু অন্তরে হাযির রাখা সহজ হয়। বিশেষভাবে যারা নিয়তের ক্ষেত্রে ওয়াস্ওয়াসাগ্রস্ত, তাদের জন্য মৌখিক উচ্চারণ সহায়ক হয়।

পক্ষান্তরে, অনেকের মতে নিয়তের মৌখিক উচ্চারণ বিদ্আত এবং মাকরূহ। কেননা, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ), তাবেঈন, তাবে তাবেঈন এবং আইম্মায়ে মুজতাহেদীন (রহঃ) এর কারো থেকেই নিয়তের মৌখিক উচ্চারণ বর্নিত নেই।

শারেহে বুখারী আল্লামা কাস্তালানী (রহঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ত্রিশ হাজার নামায পড়েছেন; কিন্তু এক ওয়াক্তের নামাযেও

– ২

তাঁর থেকে নিয়তের মৌখিক উচ্চারণ বর্ণিত হয়নি। এরপর তিনি আরো বলেছেন যে, "রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক কোন কাজ পালিত হওয়া যেমন সুন্নত, কোন কাজ বর্জিত হওয়াও তেমনি সুন্নত।"

অতএব, আন্তরিক নিয়তের সহায়ক হিসাবে মৌখিক নিয়ত করা হলে এবং এ-নিয়ে বাড়া-বাড়ি করা না হলে, শরীঅতে এর অনুমতি রয়েছে। কারণ, বাড়াবাড়ি করার দরুন যেখানে পয়গম্বরী মুস্তাহ্সান বিষয় পর্যন্ত মাকরূহ এবং বিদ্আতে পরিনত হয়ে যায়, সেখানে পরবর্তী যুগের ফকীহগনের মুস্তাহ্সান বিষয় তো সহজেই অনুমেয়।

পক্ষান্তরে, কেউ যদি একমাত্র আন্তরিক নিয়তের উপরই ক্ষান্ত করতে চায়, তাকে নিন্দা করা উচিত হবে না; বরং সে সুন্নতেরই অনুসারী বলে গন্য হবে।

২ নং হাদীস ঃ

اَلْـحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْاِ يْمَانِ

রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "হায়া (মন্দ কাজ করতে লজ্জাবোধ করা) ঈমানের একটি শাখা।" (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ বিশেষভাবে হায়াকে ঈমানের শাখা বলার কারণ এই যে, হায়ার কারণে সৎকর্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করে থাকে। যেমন, হাদীস শরীফে আছে- اَلْحَيَاءُ لَايَــأْتِيْ اِلاَّ بِخَيْرٍ অর্থাৎ হায়া কেবল কল্যানই বয়ে আনে। অপর একটি হাদীছে আছে - اَلْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّــهُ অর্থাৎ হায়া সর্বাঙ্গীন কল্যানকর। এই হায়াই মানুষকে অন্যায় ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখে। লজ্জাহীন ব্যক্তি যে কোন অশ্লীল ও মন্দ থেকে মন্দতরকাজ নির্দ্বিধায় করতে পারে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন اِذَا لَــمْ تَسْتَحْيِ فَــاصْنَعْ مَــاشِئْتَ অর্থাৎ "যখন তোমার শরম না থাকে তখন তোমার যা-ইচ্ছা তা-ই করতে পার।" কেননা, কারো মধ্যে লজ্জা না থাকলে তাকে মন্দ থেকে ফিরাবে কিসে? তবে দ্বীনী কাজ পালন করতে এবং শিখতে ও শিখাতে আদৌ শরমানো উচিৎ নয়।

সংযোজন ঃ আলোচ্য হাদীস খানা একটি হাদীসের একাংশ মাত্র। পুরো হাদীস খানা এই যে, "ঈমান সত্তরের অধিক শাখা (সদ্গুন) বিশিষ্ট একটি বৃক্ষ সদৃশ। সর্বশ্রেষ্ঠ শাখা হলো, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা এবং সর্বনিম্ন শাখা হলো, চলার পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেয়া এবং হায়া ঈমানের একটি (বিশেষ) শাখা।" আবার কোন কোন বর্ণনায়-ষাট, চুষট্টি কিংবা সাতাত্তর শাখার উল্লেখ রয়েছে। সকল বর্ণনার মূল উদ্দেশ্য একটাই, তা হলো ঈমানী গুনাবলীর প্রাচুর্য বুঝানো, সীমা নির্ধারন করা নয়।

পুরো হাদীসটির সারমর্ম এই যে, পূর্নাঙ্গ মুসলমান হওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলার সমস্ত হক আদায় করা যেমন জরুরী, বান্দার সমস্ত হক আদায় করাও তেমনি জরুরী। উক্ত হাদীসে উভয় প্রকার হকের প্রতিই ইঙ্গিত রয়েছে। কেননা, তাওহীদের স্বীকৃতি দেয়া আল্লাহ তাআলার সর্বশ্রেষ্ঠ হক এবং পথের কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেয়া বান্দার সর্বনিম্ন হক। এতদুভয়ের মাঝখানে শামিল রয়েছে আল্লাহ তাআলা এবং বান্দার বাকী হক সমূহ। যেহেতু লজ্জাশীলতাই বাকী সমস্ত শাখার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে, তাই বিশেষভাবে হায়াকে উল্লেখ করা হয়েছে।

হায়া শব্দের অর্থ ঃ যে কোন অপছন্দনীয় কাজ করতে মনের সংকোচবোধ, চাই তা-শরীঅতে কিংবা সামাজিক ভাবে অথবা স্বভাবগত কারণে অপছন্দনীয় হোক। এখন প্রশ্ন হলো, এমন হায়া তো কাফেরদের মধ্যেও বিদ্যমান রয়েছে। যেমন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চাচা আবু তালিব সমাজের লজ্জার কারনে ঈমান আনতে পারেনি। তাহলে হায়া ঈমানের অংশ হলো কিভাবে ?

এর সহজ ও সুন্দর জবাব হলো, হাদীসে যে হায়ার কথা বলা হয়েছে তা-ঈমানী হায়া অর্থাৎ ঈমানের কারণে অন্যায় থেকে বাঁচার অনুভূতি। অতএব, ঈমানদারকে বাহ্যতঃ যে লজ্জাবোধ আল্লাহর হুকুম পালনে বাঁধা দেয় তা মূলতঃ হায়া নয়; বরং মনের দূর্বলতা মাত্র।

ঈমানকে শাখা বিশিষ্ট বৃক্ষের সংগে তুলনা করার তাৎপর্য ঃ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈমানকে শাখা বিশিষ্ট বৃক্ষের সংগে তুলনা করে এ-কথা বুঝিয়েছেন যে, বৃক্ষের সজীবতা ও শোভা-সৌন্দর্য যেমন ডাল-পত্রের দ্বারা রক্ষা পায় এবং ডাল-পত্র বিহীন বৃক্ষ আপাততঃ টিকে থাকলেও পরবর্তীতে মরে যাওয়ার সম্ভাবনাই থাকে প্রবল, তেমনি ঈমানের সজীবতা ও শোভা-সৌন্দর্য রক্ষা পায় আমলসমূহের দ্বারা এবং আমলবিহীন ঈমান মৃত প্রায় হয়ে যায়, শোভা-সৌন্দর্য হারিয়ে ফেলে এবং ভবিষ্যতে একেবারেই নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকে।

ইসলামকে তাঁবুর সংগে তুলনা করার তাৎপর্য ঃ আবার পঞ্চবেনার হাদীসে বলা হয়েছে, ইসলাম পাঁচটি বেনার উপর প্রতিষ্ঠিত। কালিমায়ে তাইয়েবার সাক্ষ্য দেয়া, নামায কায়েম করা, যাকাত দেয়া, হজ্জ করা ও রমযান মাসের রোযা রাখা। এখানে ইসলামকে একটি তাঁবুর সংগে তুলনা করে বুঝিয়েছেন যে, একটি তাঁবু যেভাবে একটি মধ্যবর্তী দন্ডায়মান খুঁটি ও চারদিকে চারটি রশির টানার উপর প্রতিষ্ঠিত হয় - মধ্যবর্তী খুঁটি ছাড়া তাঁবুর প্রতিষ্ঠাই অসম্ভব এবং পার্শ্ববর্তী টানাগুলো হয় তার সহায়ক, যেগুলো ব্যতীত তাঁবুর অস্তিত্ব হয়ে গেলেও থেকে যায় তা অসম্পূর্ণ, যে কোন মুহূর্তে পড়ে যাওয়ার আশংকা থাকে বিদ্যমান, তেমনি ইসলাম এমন পাঁচটি বিষয়ের সমন্বয়ে পরিপূর্ণ হয় যার মধ্যে কালিমায়ে তাইয়েবা হলো মধ্যবর্তী খুঁটি বা মূল বিষয়, যা-ব্যতীত ইসলাম ও মুসলমানির অস্তিত্বই

অসম্ভব। নামায, যাকাত, হজ্জ ও রোযা হলো চারদিকের রশির টানা স্বরূপ। কারো মধ্যে এগুলো বর্জনের পরিমান যত বাড়বে তার ইসলামের দূর্বলতাও তত বাড়বে। যদি চারটিই বর্জন করল তাহলে দূর্বলতার সীমাই ছাড়িয়ে গেল। ফলে, তার থেকে ইসলাম স্বমূলে চলে যাওয়ার আশংকা থাকে।

এখানে ইসলামকে তাঁবুর সংগে তুলনা করার কারণ হলো, মানুষ তাঁবুতে প্রবেশ করলে ভিতরগত ও বহিরাগত সর্বপ্রকার দুশমন থেকে রক্ষা পেয়ে যায়। সাথে সাথে শীত, গরম হতেও রক্ষা পেয়ে যায়। অনুরূপভাবে মানুষ পরিপূর্ণ ইসলামে দীক্ষিত হলে ভিতর গত দুশমন নফ্‌সে আম্মারা এবং বহিরাগত দুশমন শয়তান থেকে রক্ষা পেয়ে যায়। সাথে সাথে দোযখের অগ্নি এবং বরফের শাস্তি থেকেও রক্ষা পেয়ে যায়।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর ঃ এখন প্রশ্ন হতে পারে যে, পঞ্চবেনার হাদীসে ইসলামকে পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে এবং পূর্বের হাদীসটিতে ঈমানের শাখা সত্তরাধিক বলা হয়েছে। অথচ ঈমানের শাখাগুলোই ইসলামের শাখা, যার মধ্যে এ-পাঁচটিও রয়েছে।

এর জবাব এই যে, ঈমানের শাখাসমূহ যেমন দুই রকম-করনীয় আর বর্জনীয়, ইসলামের উক্ত পাঁচটি বিষয়ও তেমনি দুই রকম-করনীয় ও বর্জনীয়। ইসলামের এই মৌলিক পাঁচটি বিষয়ের উল্লেখের মধ্যে ঈমানের দুই রকমের সমস্ত শাখার প্রতিই ইংগিত হয়ে যায়। অতএব, উভয় হাদীসের মাঝে আর বিরোধ থাকল না।

ঈমান, ইসলাম ও দ্বীন এর সংজ্ঞা ঃ ঈমানের সংজ্ঞা ও তার প্রকার ঃ ঈমান হলো, নবীর প্রতি আস্থা রেখে দ্বিধাহীনচিত্তে সে সব বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা, যে গুলো নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দ্বীনের অন্তর্ভূক্ত হওয়া সুস্পষ্ট ও অকাট্য ভাবে প্রমানিত হয়েছে। তম্মধ্যে ইজমালীভাবে (সংক্ষিপ্তভাবে) অবগত বিষয়গুলোর প্রতি ইজমালী ঈমান রাখা এবং তফসীলীভাবে (বিস্তারিতভাবে) অবগত বিষয়গুলোর প্রতি তফসীলী ঈমান রাখা জরুরী।

তাওহীদ ও রিসালাতে বিশ্বাস স্থাপনের সংগে সংগে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সকল বিধি-বিধানের প্রতি সামষ্টিকভাবে বিশ্বাস স্থাপনের নাম ইজমালী ঈমান। একজন অমুসলিম ইসলামে প্রবেশ করার জন্য প্রথমতঃ ইজমালী ঈমানই যথেষ্ট। ইসলামে প্রবেশের পর দায়িত্ব আসে বিভিন্ন বিধান পালনের। সেই বিধান গুলো বিস্তারিতভাবে জেনে নিয়ে প্রত্যেকটির উপর পৃথক পৃথকভাবে বিশ্বাস স্থাপনকে তফসীলী ঈমান বলা হয়।

পবিত্র কুরআন ঈমানের আলোচনার ক্ষেত্রে গায়বের প্রতি ঈমান আনার কথা বলে দুটি শব্দ ব্যবহার করেছে, ঈমান এবং গায়ব। শব্দ দুটির অর্থ যথাযথভাবে অনুধাবন করতে পারলে ঈমানের পুরোপুরি তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হবে।

ঈমানের আভিধানিক অর্থ হল, কারো কথাকে তার বিশ্বস্ততার নিরিখে মনে-প্রানে মেনে নেয়া। এ জন্যই অনুভূতিগ্রাহ্য ও দৃশ্যমান কোন বস্তুতে কারো কথায় বিশ্বাস স্থাপনের নাম ঈমান নয়। উদাহরণত ঃ কোন ব্যক্তি এক টুকরো সাদা কাপড়কে সাদা এবং এক টুকরো কালো কাপড়কে কালো বলে দাবী করার পর অন্য কেউ তার কথাটা সত্য বলে মেনে নিলে-একে ঈমান বলা যায় না। কারণ, সাদা বা কালো হওয়াকে সত্য বলে মেনে নেয়াটা বক্তার প্রভাবে নয়; বরং চোখে দেখার কারণে। পক্ষান্তরে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কোন সংবাদ কেবলমাত্র তাঁর প্রতি বিশ্বাস বশত ঃ মেনে নেয়াকেই শরীঅতের পরিভাষায় ঈমান বলে।

গায়ব এর আভিধানিক অর্থ ঃ এমন সব বস্তু যা বাহ্যিকভাবে মানবকুলের জ্ঞানের উর্ধ্বে এবং পঞ্চইন্দ্রিয় দ্বারা-তা-অনুভব করতে মানুষ অক্ষম। কুরআনে ঈমান বিলগায়ব এর ক্ষেত্রে গায়বের আভিধানিক অর্থই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ ঐসব বিষয় যার সংবাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দিয়েছেন এবং নিজ বুদ্ধিবলেও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতার দ্বারা মানুষ তা জানতে অক্ষম। যেমন, আল্লাহর অস্তিত্ব ও সত্তা, সিফাত বা গুনাবলী, তাকদীর সম্পর্কীয় বিষয়সমূহ, বেহেশ্‌ত ও দোযখ সংক্রান্ত অবস্থাদি, কিয়ামত সম্পর্কীয় ঘটনাবলী, ফেরেশতাকুল, সমস্ত আসমানী কিতাব এবং পূর্ববর্তী নবী ও রাসূলগণের বিস্তারিত বিষয় গয়ব-এর অন্তর্ভূক্ত।

এ থেকে বুঝা গেল যে, ঈমান বিল-গায়ব বা অদৃশ্যে বিশ্বাসের অর্থ হল - রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হেদায়েত ও শিক্ষার বিষয়গুলোকে আন্তরিক বিশ্বাসের সাথে মেনে নেয়া। তবে সে বিষয়গুলো রাসূলের শিক্ষা হিসেবে অকাট্যভাবে প্রমানিত হওয়া শর্ত। মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল ঈমানের এ সংজ্ঞাই দিয়েছেন। এতে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, শুধু জানার নামই ঈমান নয়। কেননা, খোদ ইবলীস এবং অনেক কাফের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নবুওয়াতকে আন্তরিকভাবে সত্য বলে জানত, কিন্তু না-মানার দরুন তারা ঈমানদারদের অন্তর্ভূক্ত হতে পারেনি।

ঈমানের নূর অন্তরে প্রবেশ করার লক্ষন ঃ হাদীস শরীফে আছে - ঈমানের নূর মানুষের অন্তরে প্রবেশ করলে অন্তর প্রশস্ত হয়ে যায়। ফলে, আল্লাহর বিধি-বিধান হৃদয়ঙ্গম করা এবং সে অনুযায়ী আমল করা সহজ হয়ে যায়। এর লক্ষন কি? এ-প্রশ্নের জবাবে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ চিরস্থায়ী বাসস্থানের প্রতি অনুরাগী হওয়া, ধোকার বাসস্থান (অর্থাৎ দুনিয়ার আনন্দ-কোলাহল) থেকে দূরে সরে থাকা এবং মৃত্যু আসার পুর্বে মৃত্যুর প্রস্তুতি গ্রহণ করা।

ইসলাম কাকে বলে? ঃ এর আভিধানিক অর্থ, আত্মসমর্পন করা এবং অনুগত হওয়া। এ অর্থে, প্রত্যেক নবীর প্রতি বিশ্বাসী ও অনুগতরা-সকলেই মুসলমান এবং তাদের ধর্ম ছিল ইসলাম। যা একের পর এক রহিত হয়ে গিয়েছে এবং পরিশেষে দ্বীনে মুহাম্মাদীই ইসলাম নামে অভিহিত রয়েছে, যা কিয়ামত পর্যন্ত কায়েম থাকবে। পারিভাষিক অর্থে, নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আনীত ধর্মই হল ইসলাম। কুরআনও হাদীসের যেখানে যেখানে ঈমান ও ইসলামের অর্থের মাঝে ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়, সেখানে ইহাদের আভিধানিক অর্থই উদ্দেশ্য। কিন্তু শরীঅতের পরিভাষায় ঈমান ও ইসলাম অভিন্ন।

ঈমান ও ইসলামের মাঝে সম্পর্ক ঃ যদিও অভিধানে ঈমান অর্থ, কোন বস্তুতে আন্তরিক বিশ্বাস স্থাপন করা এবং ইসলাম অর্থ কারো অনুগত ও তাবেদার হওয়া অর্থাৎ ঈমানের স্থান অন্তর এবং ইসলামের স্থান অন্তর সহ সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, কিন্তু শরীঅতে ঈমানবিহীন ইসলাম এবং ইসলামবিহীন ঈমান গ্রহণযোগ্য নয়, অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস ততক্ষন পর্যন্ত গ্রহন যোগ্য নয়, যতক্ষন পর্যন্ত এ বিশ্বাসের মৌখিক স্বীকৃতির সাথে সাথে কর্মের দ্বারা আনুগত্য প্রকাশ করা না হয়।

প্রকাশ্য আনুগত্যের সাথে যদি অন্তরের বিশ্বাস না থাকে, কুরআনের ভাষায় একে নিফাক বলে। নিফাককে কুফর হতেও বড় অন্যায় সাব্যস্ত করা হয়েছে। কুরআনে বলা হয়েছে - "মুনাফিকদের স্থান হল জাহান্নামের সর্বনিম্নস্তরে।"

অনুরূপভাবে, আন্তরিক বিশ্বাসের সাথে যদি মৌখিক স্বীকৃতি এবং প্রকাশ্য আনুগত্য না থাকে, কুরআনের ভাষায় একে কুফর বলা হয়। কুরআনে বলা হয়েছে - "কাফের সম্প্রদায় রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর নবুওয়াতের যথার্থতা সম্পর্কে এমন সুস্পষ্টভাবে জানে, যেমন জানে তাদের নিজ নিজ সন্তানদের।" অন্য আয়াতে আছে - "তারা আমার নিদর্শন বা আয়াত সমূহকে অস্বীকার করে অথচ তাদের অন্তরে এর পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে। তাদের এ আচরণ কেবল অন্যায় ও অহংকার প্রসূত।"

শরীঅতের দৃষ্টিতে ঈমান ও ইসলামের ক্ষেত্র এক, কিন্তু সূচনা ও সমাপ্তির মধ্যে কিছুটা পার্থক্য বিদ্যমান। অর্থাৎ ঈমানের সূচনা হয় অন্তর থেকে এবং সমাপ্তি ও পূর্ণতা লাভ করে আমল তথা অংগ প্রত্যঙ্গের ব্যবহারে, কিন্তু ইসলামের সূচনা হয় প্রকাশ্য আমল থেকে এবং সমাপ্তি ও পূর্ণতা লাভ করে অন্তরে পৌঁছে। অন্তরের বিশ্বাস প্রকাশ্য আমল পর্যন্ত না পৌঁছালে যেমন গ্রহণযোগ্য হয় না, তেমনি প্রকাশ্য আমল বা তাবেদারীও আন্তরিক বিশ্বাসে না পৌঁছালে গ্রহণযোগ্য হয় না।

দ্বীন কাকে বলে? ঃ আরবী অভিধানে 'দ্বীন' এর একাধিক অর্থ রয়েছে। তম্মধ্যে এক অর্থ, রীতি ও পদ্ধতি। কুরআনের পরিভাষায়, সে সব মূলনীতি ও বিধি -বিধানকে দ্বীন বলা হয়, যা হযরত আদম আলাইহিস্‌সালাম থেকে শুরু করে শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত সব পয়গম্বরের মধ্যে সমভাবে বিদ্যমান ছিল। 'শরীঅত' শব্দটি পরবর্তী পরিভাষা। 'মাযহাব' শব্দটি দ্বীনের বিভিন্ন শাখাগত বিধি-বিধান অর্থে ব্যবহৃত হয়, যা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উম্মতের জন্যে বিভিন্নরূপ ধারণ করেছে। কুরআনে বলা হয়েছে, "আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্যে সে দ্বীনই নির্ধারিত করেছেন যার নির্দেশ ইতিপূর্বে নূহ এবং অন্যান্য পয়গম্বরকে দেয়া হয়েছিল।"

এতে বুঝা গেল, সব পয়গম্বরের দ্বীন এক ও অভিন্ন। অর্থাৎ, আল্লাহর সত্তা যাবতীয় গুনাবলীর অধিকারী হওয়া, সমূদয় দোষক্রুটি থেকে পবিত্র হওয়া এবং তাঁকে ছাড়া কেউ ইবাদতের যোগ্য না হওয়ার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ও মুখে স্বীকার করা এবং আল্লাহর প্রেরিত নবী-রাসূল ও তাঁদের আনীত বিধানের প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস ও মৌখিক স্বীকৃতি প্রদান করা। এক কথায়, ঈমান ও আমলের সমষ্টিকেই দ্বীন বলা হয়।

দ্বীনে ইসলামই আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য, অন্য কোন দ্বীন নয় ঃ "ইসলামই একমাত্র দ্বীন" কুরআনের এ-বানীর সারমর্ম হল, নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আবির্ভাবের পর কুরআন ও তাঁর শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ দ্বীনই ইসলাম নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য এবং এ দ্বীনে ইসলাম-ই আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য, অন্য কোন দ্বীন নয়।

আল্লাহর মনোনীত এ-দ্বীনের উপর স্বয়ং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমল করেছেন। তাঁরই তত্ত্বাবধানে সাহাবায়ে কিরাম (রাযিঃ) আমল করেছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত এ-দ্বীনের হিফাযতের দায়িত্ব স্বয়ং রাব্বুল-আলামীন গ্রহণ করেছেন।

হক ও বাতিলের মাঝে যাচাই করার মানদন্ড ঃ বস্তুত ঃ কুরআন মজীদ, হাদীস শরীফ, সাহাবায়ে কিরামের আমল এবং ইজতিহাদকারী ইমামগণের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষনের আকারে এ-দ্বীনে হক-কে যথাযথভাবে আল্লাহ তাআলা সুসংরক্ষিত করে দিয়েছেন। যার মানদন্ডে যাচাই করে হক ও বাতিলের মাঝে পার্থক্য করা সম্ভব।

৩ নং হাদীস ঃ

مَنْ اَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْاَرْضِ يُطَوَّقُهُ اِلَى سَبْعِ اَرْضِيْنَ

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি বিঘত পরিমাণ জমি অন্যায়ভাবে দখল করবে, সাত স্তর জমির তৃওক বা শিকল তাকে পরানো হবে।" (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ তুহ্ফাতুল আখ্ইয়ার গ্রন্থে আছে---ইমাম ত্বাবরানী ও আহ্মাদ (রহঃ) হযরত ইয়া'লা (রাযিঃ) সূত্রে নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইরশাদ বর্ণনা করেছেন ঃ যে ব্যক্তি কারো বিঘত পরিমাণ জমি অন্যায়ভাবে কেড়ে নিবে, আল্লাহ তাআলা তাকে বাধ্য করবেন যেন সে জমিটি সপ্ত স্তর পর্যন্ত খনন করে। অতঃপর কিয়ামত দিবসের হিসাব শেষ হওয়া পর্যন্ত তার গলায় উহার তৃত্তক বা শিকল ঝুলিয়ে রাখা হবে।

এতে বুঝা গেল যে, খননকৃত জমির বিশাল খন্ডটি তার গলায় শিকলরূপে ঝুলবে। যেন সেই যালিম সকল মানুষের সামনে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয় এবং সীমাহীন কষ্ট পেতে থাকে।

আমাদের সাবধান হওয়া উচিত, যেন আমরা নিজেকে সর্ব প্রকার যুলুম ও খিয়ানত থেকে বাঁচিয়ে রাখি। নইলে, কিয়ামত দিবসে তা অসহনীয় দুর্ভোগের কারণ হবে এবং অসংখ্য লোকের সামনে লাঞ্ছিত হতে হবে।

সংযোজন ঃ যুলুম সম্পর্কে কতিপয় হাদীস ঃ ❑ সাবধান! তোমরা যুলুম করো না। জেনে রেখ! কারো মাল তার সন্তুষ্টি ব্যতিরেকে হালাল নয়।

❑ এক মুসলমানের জান, মাল, ইজ্জত আরেক মুসলমানের জন্য হারাম। (মুসলিম)

❑ আল্লাহ পাক যালিমকে সুযোগ দিতে থাকেন। অতঃপর যখন পাকড়াও করেন তখন আর রেহাই দেন না। (বুখারী ও মুসলিম)

❑ নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিন সমস্ত হক তার মালিক কে পরিশোধ করা হবে। এমন কি শিং বিশিষ্ট বকরী থেকেও প্রতিশোধ নেয়া হবে শিং বিহীন বকরীর জন্য। (অর্থাৎ শিংদার বকরীকে শিংবিহীন ও শিংবিহীন বকরীকে শিংদার করে দেয়া হবে এবং প্রতিশোধ নিতে বলা হবে।) (মুসলিম)

❑ তোমরা একথা বলে পর-মতের অনুসারী হয়ো না যে, অন্যরা সদ্ব্যবহার করলে আমরাও সদ্ব্যবহার করব আর অন্যরা যুলুম করলে আমরাও যুলুম করব। বরং সদ্ব্যবহারের ব্যাপারে স্বীয়মতকে স্থীর করে নাও যে, মানুষ সদ্ব্যবহার করলে তোমরা সদ্ব্যবহার করবে, আর মানুষ দুর্ব্যবহার করলেও তোমরা যুলুম করবে না। (তিরঃ)

❑ হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) কাউকে বলতে শুনলেন যে, "যালিম, সে তার নিজেরই ক্ষতি করে-অন্য কারো নয়।" তখন তিনি বললেন ঃ হাঁ, আল্লাহর শপথ! হুবারা পাখীও আহারের অভাবে ক্ষীনকায় হয়ে তার বাসায় মারা যায়, যালিমের যুলুমের কারণে। (বায়হাকী)

❑ কিয়ামতে নিঃকৃষ্টদের মধ্যে এক প্রকার লোক হলো, যারা অন্যের পার্থিব স্বার্থে স্বীয় আখিরাত বিনষ্ট করে। (যেমন, অধীনস্থরা উর্ধতন ব্যক্তিবর্গের খাতিরে অন্যায়-অবিচার করে থাকে।) (ইবনে মাজা)

❑ যে ব্যক্তি যালিমের শক্তি যোগাবার জন্য তার সংগে উঠা-বসা করে অথচ সে জানে যে-সে যালিম, এমন ব্যক্তি ইসলামের গন্ডি থেকে খারিজ হয়ে যায়। (বায়হাকী)

❑ যে ব্যক্তি মানুষকে নারাজ করে হলেও আল্লাহ্র সন্তুষ্টি তালাশ করে, আল্লাহ্ই তাকে মানুষের অনিষ্ট থেকে বাঁচান আর যে আল্লাহকে নারাজ করে হলেও মানুষের সন্তুষ্টি চায়, আল্লাহ তাকে মানুষের হাতে সোপর্দ করে দেন (অর্থাৎ তার থেকে স্বীয় হিফাযতের দায়িত্ব উঠিয়ে নেন।) (তিরমিযী)

❑ হাদীসে কুদ্সীতে আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ হে আমার বান্দারা ! নিঃসন্দেহে আমি যুলুমকে নিজের উপর হারাম করেছি এবং তোমাদের পরস্পরের মাঝেও সেটাকে হারাম করেছি। অতএব তোমরা একে অন্যের উপর যুলুম করো না। (মুসলিম)

❑ হাদীসে কুদ্সীতে আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ আমি সেই ব্যক্তির উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হই, যে এমন ব্যক্তির উপর অত্যাচার করে, যার আমি ছাড়া কোন সাহায্যকারী নেই। (কিতাবুল কাবাইর)

❑ মুসনাদে আহমাদে বর্নিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহর বান্দারা খালি পায়ে নগ্ন দেহে হাশরের ময়দানে সমবেত হবে। এ সময়ে গুরুগম্ভীর স্বরে একটি আওয়াজ ধ্বনিত হবে, যা দূরের ও নিকটের সবাই শুনতে পাবে। বলা হবে ঃ আমি সকলের অভাব পূরনকারী রাজাধিরাজ। কোন জান্নাতবাসীর পক্ষে জান্নাতে যাওয়া এবং জাহান্নামবাসীর পক্ষে জাহান্নামে যাওয়া সম্ভব নয় যতক্ষন পর্যন্ত আমি তার কৃত যুলুমের প্রতিশোধ না নেই, এমনকি তা যদি একটি চড় থাপ্পর বা লাথির পর্যায়ে হয়ে থাকে। তোমার প্রভু কারো উপর যুলুম করেন না। (কিঃ কাঃ)

❑ এমন অনেক শাসকের আবির্ভাব ঘটবে, যাদের বহু অনুসারী থাকবে এবং সেই অনুসারীরাও মানুষের উপর যুলুম এবং মিথ্যাচার চালাবে। যে ব্যক্তি তাদের সাথে উঠাবসা করবে, তাদের মিথ্যাচারকে সমর্থন দেবে এবং তাদের যুলুমের সহযোগীতা করবে আমি তার কেউ নই এবং সে আমার কেউ নয়। আর যে ব্যক্তি তাদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখবে এবং তাদের যুলুমের সহযোগীতা করবে না, সে আমার আপনজন এবং আমিও তার আপনজন। (কিঃ কাঃ)

❑ যে স্থানে কোন মানুষকে অন্যায়ভাবে নির্যাতন বা হত্যা করা হয়, তোমরা কেউ সেখানে থেকো না। কেননা, যারা ঐ জায়গায় অবস্থান করে এবং যুলুম প্রতিহত করে না, তাদের উপর আল্লাহর লা'নত নাযিল হয়ে থাকে । (তাবরানী)

- রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমার ভাই যালিম হলেও তাকে সাহায্য করো. মযলুম হলেও তাকে সাহায্য করো। সাহাবীগণ বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ! সে যদি মযলুম হয় তবে তাকে সাহায্য করতে হবে, এ কথা তো বুঝলাম. কিন্তু যালিম হলে কিভাবে সাহায্য করবো ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তাকে যুলুম থেকে ফিরাও। এটাই তাকে সাহায্য করা। (বুঃ ও মুঃ)
- হযরত ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে আছে যে, কিয়ামতের দিন পালাক্রমে পত্যেক নারী পুরুষকে হাত ধরে কিয়ামতের ময়দানে সমবেত সমগ্র মানবমন্ডলীর সামনে উপস্থিত করা হবে এবং বলা হবে, এই যে অমুকের ছেলে বা মেয়ে অমুক। এর কাছে যদি কারো কিছু পাওনা থাকে তবে সে যেন এসে তার কাছ থেকে আদায় করে নেয়। এ সময় অধিকার বঞ্চিত মহিলারা খুশী হবে এবং তাদের অধিকার হরনকারী পিতা, ভাই বা স্বামীর কাছ থেকে অধিকার আদায় করে নেবে। অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করেন ঃ অর্থাৎ "সেদিন কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক গ্রহণযোগ্য হবে না এবং কেউ কাউকে জিজ্ঞাসা করবে না।" সেদিন আল্লাহ নিজের পাওনা সম্পর্কে যাকে ইচ্ছা মাফ করবেন, কিন্তু মানুষের হক তিনি মাফ করবেন না। (কিঃ কাঃ)
- তাবরানী বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যে বিবাদ বিচারের জন্য উঠবে তা হবে এক স্বামী ও তার স্ত্রী সংক্রান্ত। স্ত্রী কথা বলবে না তবে তার হাত ও পা সাক্ষ্য দেবে তার স্বামীর প্রতি সে যে আচরণ করতো সে সম্পর্কে এবং স্বামীর হাত ও পা সাক্ষ্য দেবে স্ত্রীর প্রতি সে ভালো বা মন্দ যে আচরণ করতো সে সম্পর্কে। এরপর মামলা উঠবে মনিব ও চাকর-চাকরানীদের সম্পর্কে। সেখানে কোন অর্থ-কড়ি দিয়ে বিবাদ মেটানো হবে না। কেবল মযলুমকে যালিমের নেক আমল দিয়ে দেয়া হবে। অতঃপর সকল প্রতাপশালী যালিম শাসককে লোহার শিকলে বেঁধে হাজির করা হবে এবং তাদেরকে জাহান্নামে পাঠানো হবে। (কিঃ কাঃ)
- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মযলুমের দোআ মেঘের উপরে উঠে যায় এবং আল্লাহ তখন বলেন আমার মর্যাদা ও প্রতাপের কছম, আমি তোমাকে সাহায্য করবোই, চাই তা কিছু পরেই হোক ! আল্লাহ যখন সর্বপ্রথম তাঁর সৃষ্টিকে সৃষ্টি করেন, তখন তারা আল্লাহ তাআলাকে জিজ্ঞাসা করে বলে যে, হে আমাদের প্রতিপালক ! আপনি কার সাথে থাকেন ? আল্লাহ জবাব দিলেন ঃ মযলুমের সাথে, যতক্ষন তার প্রাপ্য তাকে ফিরিয়ে দেয়া না হয়। (আহঃ, তিরঃ)
- হযরত ওহাব বিন মুনাবিবহ (রহঃ) বলেন ঃ একজন পরাক্রমশালী রাজা একটি প্রাসাদ নির্মান করেছিলেন। একদিন এক বৃদ্ধা ভিখারিনী এসে সেই প্রাসাদের পাশে

একটা ঝুপড়ি বানিয়ে বাস করতে লাগলো। পরে একদিন রাজা প্রাসাদের ছাদে উঠে চারপাশ ঘুরে দেখার সময় ঐ ঝুপড়িটি দেখে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ ঝুপড়িটি কার? লোকেরা বললো ঃ এক দরিদ্র বৃদ্ধার। সে ওখানে বাস করে। রাজা তৎক্ষনাত ঝুপড়িটি ভেংগে ফেলার নির্দেশ দিলেন। বৃদ্ধা তখন বাইরে ভিক্ষা করতে গিয়েছিল। একটু পরে এসে দেখলো, তার ঝুপড়িটি বিধ্বস্ত। সে আশপাশের লোকদের কাছে জিজ্ঞাসা করলো, আমার ঝুপড়িটা কে ভেংগেছে? লোকেরা তাকে জানালো যে, রাজা ভেংগেছে। বৃদ্ধা আকাশের দিকে মাথা তুলে বললোঃ হে আল্লাহ! আমি যখন আমার ঝুপড়িতে ছিলাম না, তখন তুমি কোথায় ছিলে? তুমি কি ওটা রক্ষা করতে পারনি? এরপর আল্লাহ তাআলা জিব্‌রাইল (আঃ) কে ঐ প্রাসাদটি ধ্বংস করার নির্দেশ দিলেন এবং তা সংগে সংগে ধ্বংস করা হলো। (কিঃ কাঃ)

- জনৈক মনীষী বলেছেন ঃ "দুর্বলদের উপর যুলুম করো না। তাহলে তারা একদিন চরম ক্ষতিকর শক্তিশালী গোষ্ঠিতে পরিনত হবে।"
- জনৈক আরব কবি বলেন ঃ "ক্ষমতা থাকলেই যুলুম করোনা, যুলুমের পরিণাম অনুশোচনা ছাড়া আর কিছু নয়। যুলুম করার পর তুমি তো সুখে নিদ্রা যাও, কিন্তু মযলুমের চোখে ঘুম আসে না। সে রাতভর তোমার উপর বদ দোয়া করে থাকে এবং আল্লাহ্ তায়ালা তা শুনতে থাকেন। কেননা, তিনিও ঘুমান না।"

যুলুমের সংজ্ঞা ঃ যে বস্তু যে স্থানে রাখা উচিত এবং যে কাজ যেভাবে করা উচিত, তার বিপরীত করাই যুলুম। সাধারনতঃ যুলুম বলতে, মানুষের হক তথা জান, মাল ও ইজ্জতের বেলায় সীমালংঘন করাকে বুঝায়।

যে কোন বান্দার হক বা অধিকার নষ্ট করাই যুলুম। এ প্রসংগে উল্লেখ্য যে, ধনী বা সক্ষম লোক কর্তৃক দরিদ্র পাওনাদারের প্রাপ্য মজুরী বা অন্য কোন জিনিস দিতে অহেতুক বিলম্ব করা এবং তালবাহানা করাও যুলুমের শামিল। তাই হাদীসে মজুরের মজুরী তার গায়ের ঘাম শুকানোর আগেই দিতে বলা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ধনীর তালবাহানাও যুলুমের অন্তর্ভুক্ত।

স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর প্রাপ্য মোহরানা এবং খোর-পোশ না দেয়াও যুলুমের অন্তর্ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ দুর্বলের সাথে সবলের বক্র আচরণ - যা দ্বারা সে তার সহায়-সম্পদ ও মর্যাদার ক্ষতি সাধন করে এবং তাকে কষ্ট দেয়- যুলুমের অন্তর্গত। কোন অমুসলিমের প্রতি যুলুম করলেও ইহ-পরকালে তার একই পরিনতি ভোগ করতে হবে। কোন মুসলমানকে তার প্রাপ্য না দেয়া, কম দেয়া, ঠকানো, ধোকা দেয়া, তার উপর তার ক্ষমতার অতিরিক্ত কাজ চাপানো, স্বেচ্ছায় ও সানন্দে না দেয়া পর্যন্ত তার কোন জিনিস গ্রহণ করা যেমন যুলুম, কোন অমুসলিমের ক্ষেত্রেও এই সব কাজ সমান যুলুম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

বলেছেন : কোন অমুসলিমের অধিকার যে হরন করবে তথা তার জান-মালের কোন ক্ষতি সাধন করবে, কিয়ামতের দিন আমি স্বয়ং আল্লাহর আদালতে তার বিরুদ্ধে বিচার চাইবো।

জোর পূর্বক চাঁদা আদায় করা ও একপ্রকার যুলুম : যারা জোর পূর্বক চাঁদা আদায় করে তারা নিজেরাও যুলুমবাজ এবং তারা যুলুমবাজদের বড় সাহায্যকারীও বটে। চাঁদাবাজরা যে চাঁদা আদায় করে, তা যেমন তাদের প্রাপ্য নয়, তেমনি যে পথে তা ব্যয় করে তাও বৈধ পথ নয়। এ জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : অবৈধ চাঁদা আদাকারী জান্নাতে যাবে না।

বস্তুত : মানুষের উপর যুলুম এমন এক ভয়ংকর গুনাহ, যার শাস্তি কোন না কোন উপায়ে দুনিয়ার জীবনেই পাওয়া শুরু হয়ে যায়। যদিও অনেকেই তা উপলব্ধি করে না। আর এ থেকে বাঁচার কার্যকর উপায় হলো, পরোপকার ও জনসেবামূলক কাজে আত্মনিয়োগ করা এবং হালালভাবে প্রাপ্ত নিজের যা কিছু আছে তাতে সন্তুষ্ট থাকা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি তকদীরের উপর সন্তুষ্ট থাকে এবং অন্যের কাছে যা আছে তার থেকে নিরাশ হয় সে-ই প্রকৃত ঈমানের স্বাদ পায়।

হাশরের আদালতে মযলূমের হক আদায় করা হবে কিরূপে ? : কিয়ামতের দিন মুমিন, কাফির, যালিম ও মযলূম -সবাই নিজ নিজ মোকাদ্দমা আল্লাহ তাআলার আদালতে দায়ের করবে এবং আল্লাহ তাআলা যালিমকে বাধ্য করবেন মযলূমের হক আদায় করে দিতে। বুখারী শরীফে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) সূত্রে বর্ণিত হাদীসে আছে : রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন সাহাবায়ে কেরামকে প্রশ্ন করলেন, “তোমরা কি জান, মিসকিন বা নিঃস্ব কে ? তাঁরা আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা তো তাকেই মিসকীন বা নিঃস্ব মনে করি, যার কাছে নগদ অর্থ কড়ি এবং প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র নেই। তিনি বললেন : আমার উম্মতের মধ্যে সত্যিকার মিস্‌কীন বা নিঃস্ব সে ব্যক্তি, যে কিয়ামতের দিন অনেক নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত ইত্যাদি নিয়ে উপস্থিত হবে, কিন্তু দুনিয়াতে সে কাউকে গালি দিয়েছিল, কারো বিরুদ্ধে অপবাদ রটনা করেছিল কারো অর্থ-কড়ি অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করেছিল, কাউকে হত্যা করেছিল এবং কাউকে প্রহার করেছিল - যার ফলে, মযলুমরা সবাই আল্লাহর সামনে তাদের যুলুমের বদলা বা প্রতিকার দাবী করবে। অতঃপর তার সৎকর্মসমূহ তাদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হবে। যদি তার সৎকর্ম নিঃশেষ হয়ে যায় এবং মযলুমের হক অবশিষ্ট থেকে যায়, তবে মযলুমের গুনাহ তার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। অতএব,

এ ব্যক্তি সবকিছু থাকা সত্বেও কিয়ামতের দিন নিঃস্ব হয়ে যাবে। সে-ই প্রকৃত মিস্‌কীন বা নিঃস্ব।

হকের বিনিময়ে ঈমান দিয়ে দেয়া হবে না ঃ যুলুম ও হকের বিনিময়ে সব রকম আমল দেয়া হবে কিন্তু ঈমান দেয়া হবে না। তাফসীরে মাযহারীতে আছে, মযলুমের হকের বিনিময়ে যালিমের আমল দিয়ে দেয়ার অর্থ এই যে, ঈমান ব্যতীত অন্যান্য আমল দেয়া হবে। কেননা, সব যুলুমই কর্মগত গুনাহ, কুফুর নয়। কর্মগত গুনাহসমূহের শাস্তি হবে সীমিত। কিন্তু ঈমান একটি অসীম আমল, এর পুরস্কারও অসীম। অর্থাৎ চিরকাল জান্নাতে বসবাস করা; যদিও তা গুনাহের শাস্তি ভোগ এবং কিছুকাল জাহান্নামে অবস্থান করার পরে হয়। এ কথার সারমর্ম এই যে, যালিমের সমস্ত সৎকর্মই যখন নিঃশেষ হয়ে যাবে-কেবল ঈমান বাকী থাকবে, তখন তার কাছ থেকে তা ছিনিয়ে নেয়া হবে না; বরং মযলুমদের গুনাহ তার উপর চাপিয়ে দিয়ে হক আদায় করা হবে। ফলে, সে গুনাহের শাস্তি ভোগ করার পর অবশেষে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং অনন্তকাল সেখানে থাকবে। ইমাম বায়হাকীও তাই বলেছেন।

৪ নং হাদীস ঃ

مَنْ رَأى مِنْكُمْ مُنْكرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَانْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ و ذلِكَ اَضْعَفُ الاْ يْمان

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "তোমাদের মধ্যে কেউ শরীঅত পরিপন্থী কোন কার্যকলাপ দেখলে স্বহস্তে তা প্রতিহত করবে। হাত দ্বারা সক্ষম না হলে, জনসমক্ষে মুখে তার নিন্দাবাদ করবে। মুখেও সক্ষম না হলে অন্তরে তা মন্দ জানবে আর এটা দুর্বলতর ঈমান।" (মুসলিম)

সংযোজন ঃ দুর্বলতর ঈমানের অর্থ, সর্বনিম্ন ফলদায়ক ঈমান। অন্য বর্ননায় আছে - وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَالِكَ مِنَ الْاِيْمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ অর্থাৎ এর পরে সরিষা বরাবর ঈমান বাকী থাকে না।

সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে বাধা প্রদান কল্যানকামিতারই অংশ ঃ আমর বিল-মারূফ ও নাহি আনিল-মুন্‌কার অর্থাৎ সৎকাজের আদেশ দান ও অসৎকাজে বাধা প্রদান কল্যানকামিতারই অংশ, যে কল্যানকামিতা সম্পর্কে হাদীসে এসেছে - "কল্যানকামিতাই দ্বীন (অর্থাৎ যে খুঁটি বা প্রধান বিষয়টির উপর দ্বীন নির্ভরশীল, তা হল কল্যানকামিতা।) সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, কার কল্যান কামিতা ? নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন-আল্লাহ, তাঁর রাসূল, তাঁর কিতাব, মুসলমানদের ইমামগণ এবং সাধারণ মুসলমানদের।"

আমর বিল-মারূফ ও নাহি আনিল-মুন্‌কার সম্পর্কে কতিপয় মাস্‌আলা ঃ

❑ সৎকাজের আদেশ কিংবা অসৎকাজে নিষেধ করার ব্যাপারে যদি কেউ নিহত বা প্রহৃত হওয়ার আশংকা করে, সে এ-কাজের দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যায়।

❑ আমর বিল-মারূফ ও নাহি আনিল-মুন্‌কার ফরযে কিফায়া। সকলেই ছেড়ে দিলে, মা'যূর ব্যক্তি ছাড়া প্রত্যেকেই গুনাহগার হবে।

❑ আবার কখনো কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য ফরযে আইন হয়ে যায়। যেমন, কেউ এরূপ আছে যে, তাকে ছাড়া ব্যাপারটি আর কেউ অবগত নয় কিংবা অন্য কেউ তা প্রতিহত করতে অক্ষম অথবা ব্যাপারটি তার স্ত্রী, সন্তান বা দাস-দাসীর।

❑ যে ক্ষেত্রে কথা শোনা ও মান্য করার সম্ভাবনা বেশী, সেখানে অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে সাধ্যানুযায়ী পাপ কাজে বাধা প্রদান করা; হাতে হোক কিংবা মুখে অথবা কমপক্ষে অন্তর দ্বারা ঘৃনা করে মুখ ফিরিয়ে নেয়া। পক্ষান্তরে, যে ক্ষেত্রে প্রবল বিশ্বাস জন্মে যে, নিষেধাজ্ঞা শোনা হবে না অথবা নিষেধকারীর বিরুদ্ধে শত্রুতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে, সেখানে নিষেধ করা ও বাধা দান করা ফরয নয়, তবে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ অবশ্যই। ❑ আমর-নাহির দায়িত্ব পালনকারী সম্পূর্ণ নির্দোষ হওয়া শর্ত নয়; বরং যার মধ্যে আদেশ-নিষেধের সংশ্লিষ্ট ব্যাপারটি বিদ্যমান থাকবে সেও এ ব্যাপারে আদেশ -নিষেধ করে যেতে পারবে। যদিও তার জন্য তা অশোভনীয় হয়। কেননা, তার উপর দুটি ওয়াজিব রয়েছে। একটি নিজে সৎ কাজ পালন করা এবং মন্দকাজ বর্জন করা, অপরটি-অন্যকে সৎকাজের আদেশ এবং মন্দকাজে নিষেধ করা। এমন নয় যে, একটি আদায় করল না বিধায় অপরটি মাফ হয়ে যাবে; বরং একটি আদায় করলে একটির দায়িত্ব পালন হল। আর যেটি আদায় করল না সেটির পাপ তার ঘাড়ে রয়ে গেল।

❑ আমর-নাহি করা কেবল কর্মকর্তাদেরই দায়িত্ব নয়; বরং সাধারণ মুসলমানদেরও।

❑ আমর-নাহির ব্যাপারে যাদের অবগতি আছে কেবল তারাই আমর-নাহি করবে। শরীঅতের প্রকাশ্য বিষয় হলে, (যেমন নামায, রোযা, যিনা ও মদ্যপান ইত্যাদি) যেহেতু সকলেই এব্যাপারে অবগতি রাখে তাই সকলেই এ-দায়িত্ব পালন করতে পারবে। আর যদি সূক্ষ্ম এবং ইজ্‌তিহাদী বিষয় হয়, যা সাধারণের বোধগম্য নয়, তাহলে এ ব্যাপারে আমর-নাহি করবেন একমাত্র আলেমগণ। আবার আলেমগণ ও আমর-নাহি করবেন সেসব ব্যাপারেই যা ইমামদের সর্বসম্মত বিষয়, মতভেদ সম্পন্ন বিষয়ে নয়। কারণ, মতভেদ সম্পন্ন বিষয়ে কেউ স্বীয় মায্‌হাবের অনুসরণে আমল করলে, তাতে অন্য মায্‌হাবপন্থীর আপত্তি থাকতে পারে না, যদিও তা আমর-নাহির দায়িত্ব পালনকারীর মতের উল্টা হয়। কেননা, প্রত্যেক মায্‌হাবই সঠিক বলে বিবেচিত।

❑ শুধু ধারনার ভিত্তিতে কারো বাড়ি-ঘর তদন্ত করা আমর-নাহির দায়িত্ব পালনকারীর পক্ষে বৈধ নয়, বরং কোন অপরাধের ব্যাপারে ভালভাবে অবগত হলেই আমর-নাহির দায়িত্ব পালন করবে। তবে যদি কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তি কোন জঘন্য বিষয়ের খবর দেয় - যেমন বলল যে, একজন আরেকজনকে হত্যা কিংবা ব্যাভিচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে গোপন জায়গায় চলে গিয়েছে, তখন এর জন্য তদন্ত করবে।

সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করার গুরুত্ব ঃ আমর বিল-মারুফ ও নাহি আনিল মুনকার দ্বীন কায়েম থাকার জন্যে বিরাট গুরত্বপূর্ণ বিষয়। পাপকাজ অতিমাত্রায় হতে থাকলে আল্লাহর শাস্তি সৎ-অসৎ সকলকেই ঘিরে ফেলে। তাই আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখিরাতের মুক্তিকামী প্রতিটি মানুষের উচিত, আমর-নাহির কাজে যত্নবান হওয়া। কারন, এর উপকারিতা বিরাট। কারো উচ্চমর্যাদার কারনে, তাকে আমর-নাহি করতে আদৌ ভীত হবে না। কারণ,আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন - "নিশ্চয় আল্লাহ সাহায্য করবেন তাকে, যে আল্লাহর (দ্বীনের) সাহায্য করবে।" অধিকন্তু ,প্রতিদান হয়ে থাকে কষ্টের হারেই। আবার কারো সাথে বন্ধুত্ব এবং ভালবাসার কারণেও এ-মহান কাজে সিথিলতা দেখাবে না। কেননা, মানুষের প্রকৃত বন্ধু সে-ই হতে পারে,যে তার চিরস্থায়ী আখিরাত গড়ার কাজে চেষ্টাবান থাকে,যদিও এ-চেষ্টা তার পার্থিব উন্নতির গতি কমিয়ে দেয়। পক্ষান্তরে,কারো প্রকৃত শত্রু সে-ই হবে, যে তাকে আখিরাত বিধ্বংসী কিংবা আখিরাতের বিষয়ে ক্ষতিকারক উপদেশ দেয়, যদিও তাতে তার পার্থিব উন্নতি সাধিত হয়। আমর -নাহির এ-গুরুদায়িত্ব কোমলতার সাথে পালন করা উচিত। এতে সহজে সফলকাম হওয়া যায়। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেছেন ঃ যে তার মুসলমান ভাইকে গোপনে উপদেশ দিল , সে তার কল্যাণকামিতা করল এবং তাকে অলংকৃত করল। আর যে তাকে প্রকাশ্যে উপদেশ দিল,সে তাকে লজ্জিত এবং কুৎসিত করল।

আমর-নাহির কাজে লোকেরা শিথিলতা করে থাকে। যেমন,কাউকে দেখল যে, সে দোষী পন্য বা দোষী পশু দোষ বর্ণনা না করে বিক্রি করছে, তবু প্রতিবাদ করল না কিংবা ক্রেতাকে দোষের কথা জানিয়েও দিলনা । এ-ক্ষেত্রে তারা পরকালে জিজ্ঞাসিত হবে। কেননা, দ্বীন তো কল্যাণকামিতারই নাম । বস্তুত ঃ যে কল্যাণ কামিতা করল না সে প্রতারনা করল।

উম্মতের সংশোধনের পন্থা ঃ নিজে সৎকর্ম করা ও অসৎকর্ম থেকে বিরত থাকার সাথে সাথে অপরকেও আদেশ-নিষেধ করার দায়িত্বভার সাধারণ মুসলমান এবং বিশেষ করে মাশায়েখ ও আলেমদের উপর ন্যস্ত করে ইসলামী শরীঅত জগতে শান্তি ও শৃংখলা প্রতিষ্ঠার যেই একটি মূলনীতি স্থাপন করেছে, তা স্বর্নাক্ষরে লিখে রাখার যোগ্য। এটি যথাযথ বাস্তবায়িত হলে সমগ্রজাতি অনায়াসেই যাবতীয় দুর্নীতি থেকে মুক্ত হতে পারে।

ইসলামের প্রথম ও পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে যতদিন এ-মূলনীতি বাস্তবায়িত হয়েছে, ততদিন মুসলিম জাতি জ্ঞান-গরিমা, কর্ম ও চরিত্রের দিক দিয়ে সারা বিশ্বে সমুন্নত ও স্বতন্ত্র রয়েছে। পক্ষান্তরে, যেদিন থেকে মুসলমানরা এ-কর্তব্য পালনে বিমুখ হয়ে পড়েছে এবং অপরাধ দমনকে শুধু সরকার ও পুলিশ বাহিনীর দায়িত্ব মনে করে নিজেরা হাত গুটিয়ে বসেছে, সেদিন থেকেই মুসলমানদের অবস্থা সোচনীয় আকার ধারণ করেছে। আজ পিতা-মাতা ধার্মিক এবং শরীঅতের অনুসারী; কিন্তু সন্তান-সন্ততি ও আত্মীয়-স্বজনের অবস্থা এর বিপরীত। এ-কারনেই জাতির সামগ্রিক সংশোধনের জন্য পবিত্র কুরআন ও হাদীসে 'সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ' - এর প্রতি জোর দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ কোন জাতির মধ্যে যখন পাপ কাজ করা হয় অথচ কোন লোক তা নিষেধ করে না, তখন তাদের প্রতি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আযাব প্রেরণের সম্ভাবনা প্রবল হয়ে যায়।

পাপ কাজে ঘৃনা প্রকাশ না করার কারণে সতর্কবানী ঃ মালেক ইবনে দীনার (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা একবার ফেরেশ্‌তাদের নির্দেশ দিলেন যে, অমুক বস্তি ধ্বংস করে দাও। ফেরেশ্‌তারা আরয করলেন ঃ এ বস্তিতে আপনার অমুক ইবাদতকারী বান্দাও রয়েছে। নির্দেশ এলঃ তাকেও আযাবের স্বাধ গ্রহণ করাও -- আমার অবাধ্যতা ও পাপাচার দেখে তার চেহারা কখনো ক্রোধে বিবর্ণ হয়নি।

হযরত ইউশা' ইবনে নূন আলাইহিস্‌সালাম - এর প্রতি ওহী আসল যে, আপনার জাতির এক লক্ষ লোককে আযাবের মাধ্যমে ধ্বংস করা হবে। এদের মধ্যে চল্লিশ হাজার সৎলোক এবং ষাট হাজার অসৎলোক। তিনি নিবেদন করলেন, হে রাব্বুল আলামীন ! অসৎলোকদেরকে ধ্বংস করার কারণ তো জানাই আছে, কিন্তু সৎলোকদেরকে কেন ধ্বংস করা হবে? উত্তর এল ঃ এ সৎলোকগুলোও অসৎলোকদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখে। তাদের সাথে পানাহার ও হাসি-তামাশায় যোগদান করে। আমার অবাধ্যতা ও পাপাচার দেখে কখনো তাদের চেহারায় বিতৃষ্ণার চিহ্নও ফুটে উঠেনি। (তাঃ মাঃ কুরআন)

৫ নং হাদীস ঃ

اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهٖ وَيَدِهٖ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نُهِيَ عَنْهُ

রাসুলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "পরিপূর্ণ মুসলমান সে-ই, যার জবান ও হাত থেকে মুসলমানরা নিরাপদ থাকে। (অর্থাৎ জবান দ্বারা কারো সম্বন্ধে কটুক্তি কিংবা গীবত করে না এবং হাতের প্রহার বা লিখা দ্বারা নিরপরাধ কাউকে কষ্ট দেয় না।) এবং প্রকৃত মুহাজির ঐ ব্যক্তি, যে আল্লাহর নিষিদ্ধ বিষয়গুলো বর্জন করতে পেরেছে। (বুখারী)

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীস শরীফের বিষয় বস্তু ও বর্ণনাভংগী উভয়টি বিশেষভাবে লক্ষনীয়। বিষয় বস্তুর মধ্যে মুসলমানকে কষ্ট না দেয়ার প্রতি গুরুত্বারোপ করে বান্দার হকের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে আর আল্লাহ্‌র নিষিদ্ধ বিষয়গুলো বর্জন করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করে আল্লাহ্‌র হকের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। একজন মানুষ খাঁটি ও পূর্ণাঙ্গ মুসলমান হওয়ার জন্য এ-দুটি বিষয়ের বাস্তবায়ন শর্ত। বর্ণনা ভংগীর মধ্যে জবানের উল্লেখ হাতের পূর্বে করা হয়েছে - এর কারণ হলো, মুখ দ্বারা কাউকে কষ্ট দেয়া খুব সহজ ও বেশী হয়ে থাকে এবং এর প্রতিক্রিয়াও হয় খুব মারাত্মক। অর্থাৎ হাত অপেক্ষা মুখের উৎপীড়ন কঠিন ব্যথাদায়ক হয়। কবির ভাষায়ঃ

جِراحاتُ السِّنانِ لَهَا الْتِيَامٌ --وَلاَ يَلْتَامُ مَاجَرَحَ اللِّسانُ

অর্থাৎ বর্শা তথা অস্ত্রের ঘা শুকিয়ে যায়; কিন্তু কথার ঘা শুকায় না।

সংযোজন ঃ লক্ষ লক্ষ হাদীসের সার -নির্যাস চার খানা হাদীস ঃ ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন ঃ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম - এর হাদীস ভান্ডার থেকে আমি পাঁচ লক্ষ হাদীস লিপিবদ্ধ করেছি এবং এর থেকে বাছাই করে চার হাজার আট শত হাদীস স্বীয় সুনান গ্রন্থে (আবু দাউদ শরীফে) উল্লেখ করেছি। আবার এই চার হাজার আট শত হাদীস হতে এমন চারখানা হাদীস নির্বাচন করেছি, যে গুলো (লক্ষ লক্ষ হাদীসের সার-নির্যাস এবং) একজন মানুষ দ্বীনদার-মুত্তাকী হওয়ার জন্য যথেষ্ট। সেই চারখানা হাদীস এই ঃ

১। إِنَّمَاالْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَالِامْرِيءٍ مَّانَوٰى "আমলের মূল্যায়ন হয় নিয়তের দ্বারা। যে-যা নিয়ত করবে সে তা-ই পাবে।" ২। مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَالَايَعْنِيْهِ "অনর্থক বিষয় বর্জন করা মুসলমানের ইসলামের সৌন্দর্য।" ৩। لَايَكُوْنُ الْمُؤْمِنُ مُؤْمِنًا حَتّٰى يَرْضٰى لِاَخِيْهِ مَايَرْضٰى لِنَفْسِهٖ "মুমিন ব্যক্তি নিজের জন্য যা পছন্দ করে, অন্য ভাইয়ের জন্য তা পছন্দ না করা পর্যন্ত মুমিন হতে পারে না।" ৪। اَلْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ فَمَنْ اِتَّقَى الشُّبُهَاتِ اِسْتَبْرَأَ لِدِيْنِهٖ وَعِرْضِهٖ "হালাল সুস্পষ্ট এবং হারামও সুস্পষ্ট। এতদুভয়ের মাঝে রয়েছে সংশয়যুক্ত বিষয় সমূহ। সংশয়যুক্ত বিষয় থেকে যে বেঁচে থাকল, সে তার দ্বীন ও ইযযত কে পবিত্র রাখল।"

এ-চারখানা হাদীস একজন মানুষ দ্বীনদার-মুত্তাকী হওয়ার জন্য যথেষ্ট এবং লক্ষ লক্ষ হাদীসের সার-নির্যাস-এ ব্যাপারে শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহঃ) বলেছেন ঃ প্রথম হাদীসটি ইবাদাতকে বিশুদ্ধ করার জন্য যথেষ্ট। দ্বিতীয়

— ৬

হাদীসটি জীবনের মূল্যবান সময়কে অপচয় থেকে রক্ষা করার জন্য যথেষ্ট। তৃতীয় হাদীসটি বান্দার হক আদায়ের জন্য যথেষ্ট। চতুর্থ হাদীসটি সন্দেহ যুক্ত বিষয় থেকে বেঁচে থাকার জন্য যথেষ্ট।

ইমাম আযম হযরত আবু হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) -এর পূর্বে এই চারখানা হাদীস সহ মোট পাঁচখানা হাদীস নির্বাচন করেছিলেন। তম্মধ্যে পঞ্চম হাদীসটি হল, এই কিতাবের ৫নং হাদীসখানা । অর্থাৎ "প্রকৃত মুসলিম সে - ই, যার জবান ও হাতের অনিষ্ট থেকে মুসলমানরা নিরাপদ থাকে।"
শায়খুল হাদীস হযরত যাকারিয়া মুহাজিরে মাদানী (রহঃ) বলেনঃ ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) চারটির উল্লেখ হয়ত এ-কারণে করেছেন যে, এই পঞ্চম হাদীসটির বিষয়বস্তু তৃতীয় হাদীসটির মধ্যে এসে গেছে।

মুসলমানদেরকে উত্যক্ত করা, গালি দেয়া ও পরস্পরের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার পরিণাম সম্পর্কে কতিপয় হাদীস ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ✪ কিয়ামতের দিন আল্লাহর দৃষ্টিতে সবচেয়ে ধিকৃত হবে সেই ব্যক্তি যার অশালীন ও অশ্রাব্য কথাবার্তা শোনার ভয়ে জনগণ তার সংগ ত্যাগ করে। (বুঃ ও মুঃ)

✪ মুসলমান মুসলমানের ভাই। কেউ যেন কারো উপর যুলুম না করে, কেউ কাউকে অপমান না করে, কেউ কারো সাথে মিথ্যা না বলে এবং কেউ কাউকে ঘৃনা না করে। কোন মুসলমানের পক্ষে এর চেয়ে খারাপ কাজ আর কিছু হতে পারে না যে, সে তার মুসলমান ভাইকে ঘৃনা করবে। (মুসলিম)

✪ মুসলমানকে গালি দেয়া ফাসেকী এবং তার সাথে যুদ্ধ বাঁধানো কুফ্‌রী। (বুঃ মুঃ)

✪ একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলা হলো যে, অমুক মহিলা রাত জেগে নামায পড়ে এবং দিনের পর দিন রোযা রাখে; কিন্তু তার পার্শ্ববর্তী লোকজনকে কটু কথা দ্বারা কষ্ট দেয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তার কোন মঙ্গল হবে না। সে জাহান্নামে যাবে। (ইঃ হাঃ, আঃ ও বাঃ)

✪ তোমরা তোমাদের মৃত ব্যক্তিদের শুধু গুনাবলী বর্ণনা কর এবং দোষ বর্ণনা থেকে বিরত থাক। কেননা, সে তো তার কর্মফলের জায়গায় পৌঁছে গেছে। (হাকেম)

✪ যে ব্যক্তি কাউকে 'কাফের' অথবা আল্লাহর 'দুশমন' বলে আখ্যায়িত করে অথচ আসলে সে তা নয়, তার আরোপিত উক্ত আখাতার কাছেই ফিরে আসবে। (বুঃ মুঃ)

✪ মি'রাজের রাত্রে আমি একদল লোক দেখেছি, যাদের হাতে তামার নখ ছিল এবং তা দ্বারা তারা নিজেদের মুখমন্ডল খামচাচ্ছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ হে জিব্‌রীল ! এরা কারা ? তিনি বললেন ঃ এরা মানুষের নিন্দা ও কুৎসা রটিয়ে বেড়াতো এবং তাদের মান-সম্ভ্রম নিয়ে ছিনিমিনি খেলতো। (আবু দাউদ)

✪ শয়তান এখন আর এ আশা করে না যে, আরব উপদ্বীপের মুসলমানরা তাকে পূজা করবে। তবে তাদের মধ্যে বিভেদ, অনৈক্য ও কোন্দল সৃষ্টির আশা সে এখনও পোষন করে। (কিঃ কাঃ)

✪ সে ব্যক্তি অভিশপ্ত, যে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এবং চাকর-মনিবের মধ্যে বিভেদ ও কোন্দল বাধায়। (আবু দাউদ)

✪ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু আইয়ূব আনসারীকে বলেছিলেন ঃ তোমাকে লাল উটের পাল অপেক্ষা ভালো-এমন সদকার সন্ধান দেব কি ? তিনি বল্লেন ঃ হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ। নবীজী বললেনঃ মানুষের মধ্যে যখন পারস্পরিক সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায় তখন তা শুধরে দেবে এবং তারা যখন পরস্পর থেকে দূরে সরে যায়, তখন তাদেরকে পরস্পরের ঘনিষ্টতর করে দেবে। (কিঃ কাঃ)

✪ সেই ব্যক্তি মিথ্যুক নয়, যে মানুষের সম্পর্ক ভালো করার চেষ্টা করে, ফলে সে যা বলে তার ফলাফল ভালো হয়ে থাকে। (বুখারী) ✪ হযরত উম্মে কুলসুম (রাযিঃ) বলেছেন ঃ যুদ্ধ, পারস্পরিক সম্পর্ক শুধরানো এবং স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে ও স্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে কিছু বলা এই তিনটি ক্ষেত্রেই শুধু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিথ্যার অনুমতি দিয়েছেন। (মুসলিম)

✪ যে ব্যক্তি দুজনের গোলমাল মিটিয়ে দেয়, আল্লাহ তাআলা তার সকল কাজ বিশুদ্ধ করে দিবেন, তার প্রতিটি কথার বিনিময়ে একটি গোলাম আযাদ করার সওয়াব দিবেন এবং তার অতীতের সকল গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। (কিঃ কাঃ)

প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়ার পরিণাম ঃ কতিপয় হাদীস ঃ ✪ একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ সে মুমিন নয়, সে মুমিন নয়। সবাই জিজ্ঞাসা করলোঃ ইয়া রাসলূলাল্লাহ! কে? তিনি বললেনঃ যার প্রতিবেশী তার অনিষ্টকর কাজ থেকে নিরাপদ নয়। (বুঃ ও মুঃ)

✪ দরিদ্র প্রতিবেশী কিয়ামতের দিন ধনী প্রতিবেশীকে ঝাপটে ধরে বলবে ঃ হে প্রভু ! আমার এই ভাইকে তুমি সচ্ছল বানিয়েছিলে এবং সে আমার নিকটেই থাকতো, কিন্তু আমি ভুখা থাকতাম আর সে পেট পুরে খেত। ওকে জিজ্ঞাসা কর, কেন আমার উপর দরজা বন্ধ করে রাখতো এবং আমাকে বঞ্চিত করতো। (কিঃ কাঃ)

✪ তিনটি গুনাহ সবচেয়ে ভয়াবহ ঃ আল্লাহর সাথে শরীক করা, সন্তানকে অভাবের ভয়ে হত্যা করা এবং প্রতিবেশীর স্ত্রীর শ্লীলতাহানী করা। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী)

✪ প্রতিবেশী একজন নারীর শ্লীলতাহানি করা অন্য দশজন নারীর শ্লীলতাহানী করার সমান। অনুরূপ, একজন প্রতিবেশীর বাড়িতে চুরি করা অন্য জায়গায় দশজনের বাড়িতে চুরি করার সমান। (কিঃ কাঃ)

✪ অপর এক হাদীসে আছে ঃ প্রতিবেশীর অধিকার এই যে, সে যখন সাহায্য চাইবে তাকে সাহায্য করতে হবে, ঋন চাইলে ঋন দিতে হবে, কোন কিছুর মুখাপেক্ষী হলে

তাকে তা দিতে হবে. রুগ্ন হলে তাকে দেখতে যেতে হবে. কল্যান লাভ করলে তাকে অভিনন্দন জানাতে হবে. বিপদে পড়লে তাকে সমবেদনা জানাতে হবে. মারা গেলে তার জানাযা পড়তে ও তাকে কবরস্থ করতে যেতে হবে. তার অনুমতি ছাড়া উঁচু বাড়ি বানিয়ে বাতাস বন্ধ করা যাবে না। ডেগচিতে যে খাদ্য সামগ্রী রাখা হয়. তার ঘ্রান যদি সে পায়, তবে তা থেকে তাকে কিছু দিতে হবে. ফল কিনলে তাকে হাদিয়া পাঠাতে হবে. নচেৎ তার খোসা বাইরে ফেলা যাবে না. যেন সে দেখতে না পায়। (কিঃ কাঃ)

প্রতিবেশী তিন রকম ঃ (১) মুসলিম আত্মীয় প্রতিবেশী। এ ধরনের প্রতিবেশী তিনটি অধিকার পায় ঃ একটি আত্মীয় হিসাবে একটি মুসলমান হিসাবে এবং একটি প্রতিবেশী হিসাবে। (২) মুসলিম অনাত্মীয় প্রতিবেশী। এই প্রতিবেশী দুইটি অধিকার পাবে ঃ একটি প্রতিবেশী হিসাবে এবং একটি মুসলমান হিসাবে। (৩) অমুসলিম প্রতিবেশী এ ধরনের প্রতিবেশী স্রেফ প্রতিবেশীত্বের অধিকার পায়।

৬ নং হাদীস ঃ

مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا
صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি এশার নামায জামাআতে পড়ল. সে যেন রাতের অর্ধেক পর্যন্ত তাহাজ্জুদের নামাযে কাটালো। আর যে ফজরের নামাযটিও জামাআতে পড়ল. সে যেন পুরা রাত তাহাজ্জুদের নামাযে কাটালো।" (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ বর্ণিত আছে. একবার নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাত্রি জাগরণ এবং তাহাজ্জুদের নামাযের মর্তবা ও ফযীলত বর্ণনা করছিলেন। তখন সাহাবীগণ আরয করলেন. ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা মেহনতী মানুষ। সারাদিন খাটুনি খাটি। রাত জাগতে পারি না। তখন এদের সম্পর্কে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উক্ত হাদীসটি ইরশাদ করেন।

লক্ষ্য করা উচিত. এটা কত বড় লাভের কথা যে. এশা ও ফজর জামাআতে পড়লে সারা রাত ইবাদতে মগ্ন থাকার সওয়াব পাওয়া যাবে।

সংযোজন ঃ তাহাজজুদের নামায কাকে বলে? ঃ অভিধানে 'তাহাজ্জুদ' শব্দটি নিদ্রা যাওয়া ও জাগ্রত থাকা-এই পরস্পর বিরোধী দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। শরীঅতের পরিভাষায় রাত্রিকালীন নামাযকে "নামাযে তাহাজ্জুদ" বলা হয়। সাধারনত ঃ কিছুক্ষন নিদ্রা যাওয়ার পর যে নামায পড়া হয় তাকেই 'তাহাজ্জুদের নামায' বলা হয়। কিন্তু, তাফসীরে মাযহারীর ভাষ্যমতে. কিছুক্ষন নিদ্রা যাওয়ার পর আদায়কৃত নামাযকে যেমন 'তাহাজ্জুদের নামায বলা যায়. তেমনি প্রথমেই নিদ্রাকে পিছিয়ে নিয়ে নামায পড়া হলে

তাকেও 'তাহাজ্জুদের নামায' বলা যায়। তাহাজ্জুদের এই সাধারণ অর্থ কোন কোন হাদীস দ্বারাও প্রমানিত হয়।

ইবনে কাছীর (রহঃ) হযরত হাসান বসরী (রহঃ) থেকে তাহাজ্জুদের যে সংজ্ঞা উদ্ধৃত করেছেন, তাও এই ব্যাপক অর্থের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। ইবনে কাছীর (রহঃ) লিখেন

قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ : هُوَمَا كَانَ بَعْدَالْعِشَاءِ وَيُحْمَلُ عَلَىٰ مَا كَانَ بَعْدَ النَّوْمِ ۔ অর্থাৎ, হযরত হাসান বসরী বলেন ঃ এশার পরে পড়া হয় এমন প্রত্যেক নামাযকে তাহাজ্জুদ বলা যায় এবং নিদ্রা যাওয়ার পর যে নামায পড়া হয়, উহাকেও তাহাজ্জুদ বলা হয়।

এর সারমর্ম এই যে, তাহাজ্জুদের আসল অর্থে নিদ্রার পরে হওয়ার শর্ত নেই এবং কুরআনের ভাষায়ও এরূপ শর্তের অস্তিত্ব নেই; কিন্তু সাধারনতঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরাম (রাযিঃ) শেষ রাত্রে জাগ্রত হয়ে তাহাজ্জুদের নামায পড়তেন। তাই এভাবে পড়াই উত্তম হবে।

তাহাজ্জুদের নামাযের ফযীলত ঃ কতিপয় হাদীস ঃ ✪ প্রত্যেক রাতে যখন শেষ তৃতীয়াংশ রাত বাকী থাকে তখন মহান পরোয়ারদেগার নিকটবর্তী আসমানে অবতরণ করেন এবং বলেন ঃ কে আছ, আমাকে ডাকবে ? আমি তার ডাকে সাড়া দেব। কে আছ, আমার কাছ চাইবে ? আমি তাকে দান করব। কে আছ, আমার কাছে ক্ষমা চাইবে? আমি তাকে ক্ষমা করব। (বুঃ ও মুঃ)

✪ রাত্রিবেলায় এমন একটি সময় রয়েছে, কোন মুসলমান বান্দা যদি সে সময়টি পায় এবং তখন আল্লাহর নিকট ইহ-পরকালীন যে কোন কল্যাণ চায়, নিশ্চয় তিনি তাকে তা দান করেন। ইহা প্রত্যেক রাত্রের জন্য। (মুসলিম)

✪ তোমরা অবশ্যই রাত্রিজাগরণ কর অর্থাৎ তাহাজ্জুদের নামায পড়। কেননা, ইহা তোমাদের পূর্ববর্তী নেককার বান্দাদের অভ্যাস ও তরীকা, তোমাদের জন্য আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম, মন্দকর্মসমূহের কাফ্ফারা ও পাপকাজ থেকে বারণকারী। (তিরমিযী, মিশকাত)

✪ আল্লাহ তাআলা (অর্থাৎ তাঁর সন্তুষ্টি) বান্দার সর্বাধিক নিকটবর্তী থাকে শেষ রাত্রের মধ্যে। অতএব, যদি তুমি সেই সময়ে আল্লাহর স্মরণকারীদের অন্তর্ভূক্ত হতে সক্ষম হও, তাহলে (তাদের অন্তরর্ভূক্ত) হও। (তিরমিযী)

✪ আল্লাহ তাআলা রহম করুন সেই পুরুষকে, যে রাত্রে জেগে নামায পড়ে এবং স্বীয় স্ত্রীকে জাগিয়ে দিলে সেও নামায পড়ে আর স্ত্রী জাগতে না চাইলে তার চেহারায় পানি ছিঁটিয়ে দেয়। আল্লাহ তাআলা রহম করুন সেই মহিলাকে, যে রাত্রে জেগে নামায পড়ে

এবং তার স্বামীকে জাগিয়ে দিলে সেও নামায পড়ে আর সে জাগতে না চাইলে তার চেহারায় পানি ছিটিয়ে দেয়। (আঃ দাঃ নাসায়ী)

✪ জান্নাতের মধ্যে এমন কিছু কক্ষ আছে যে গুলোর বাহির ভিতর থেকে দেখা যায় এবং ভিতর বাহির থেকে দেখা যায়। আল্লাহ তায়ালা এগুলো ঐ সকল বান্দার জন্য তৈরী করে রেখেছেন, যারা নরম ভাষায় কথা বলে, অন্যকে আহার দান করে, বেশী বেশী রোযা রাখে এবং রাত্রে যখন মানুষ ঘুমিয়ে থাকে তখন নামায পড়ে। (বায়হাকী) ✪ হযরত আবু উমামা (রাযিঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, কোন্ দোআ বেশী কবুল হওয়ার যোগ্য ? তিনি বললেন ঃ শেষ রাত্রের দোআ এবং ফরয নামায সমূহের পরের দোআ। (তিরমিযী)

তাহাজ্জুদের নামায ফরয, না নফল ? ঃ এ ব্যাপারে সুচিন্তিত বক্তব্য এই যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে যখন সুরা মুযযাম্মেল অবতীর্ন হয়, তখন পাঞ্জেগানা নামায ফরয ছিল না। শুধু তাহাজ্জুদের নামায সবার উপর ফরয ছিল। এরপর শবে মেরাজে যখন পাঞ্জেগানা নামায ফরয করা হয়, তখন তাহাজ্জুদের ফরয নামায- উম্মতের পক্ষে সর্বসম্মতিক্রমে রহিত হয়ে যায় এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম - এর পক্ষেও রহিত হয়েছে কি-না, সে ব্যাপারে মতভেদ থেকে যায়।

বিনা উযরে জামাআত ত্যাগ করা ও একাকী নামায পড়ার পরিণাম ঃ কতিপয় হাদীস ঃ ✪ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামাআত ত্যাগে অভ্যস্ত একদল লোক সম্পর্কে বলেছেন ঃ আমার ইচ্ছা হয়, অন্য কাউকে নামায পড়ানোর দায়িত্বে নিয়োজিত করে জামাআত ত্যাগকারীদের ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দিয়ে আসি। (মুঃ, ইঃ মাঃ)

✪ যারা জামাআত ত্যাগে অভ্যস্ত, তাদের এই অভ্যাস ত্যাগ করতেই হবে, নচেৎ আল্লাহ তাদের হৃদয়ে অবশ্যই মোহর মেরে দিবেন এবং তারা অবশ্যই শিথিল হয়ে যাবে। (মুসলিম)

✪ যে ব্যক্তি আযান শুনলো এবং কোন উযর ছাড়াই জামাআতে যাওয়া থেকে বিরত থাকলো, তার (ঘরের মধ্যে পড়া) নামায কবুল হবে না। (আবু দাউদ)

✪ যে ব্যক্তি অবহেলার মনোভাব নিয়ে তিনটি জুমুআ ত্যাগ করবে, আল্লাহ তার হৃদয়ে মোহর মেরে দিবেন। (আবু দাউদ, ইবনে মাজা)

✪ যে ব্যক্তি বিনা উযরে এবং কোন ক্ষতির আশংকা ছাড়াই জুমুআর নামায ত্যাগ করে, তাকে এমন কোন খাতায় মুনাফিক লেখা হয়, যে খাতা থেকে কিছুই মোছা হয়নি এবং কোন কিছুই রদবদল করা হয় না। (কিঃ কাঃ)

✪ প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের উপর জুমআর নামায পড়া অবশ্য কর্তব্য। (নাসায়ী)

৭ নং হাদীস ঃ

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি মুসলমানদের ধোকা দেয় সে মুসলমানদের দলভূক্ত নয়।" (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ একদা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাজারে গমণ করে একটি গমের স্তুপে হস্তমুবারক রাখলেন। দেখলেন, ভিতরের গমগুলো ভেজা। বিক্রেতাকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে উত্তরে সে বলল, পানিতে ভিজে গিয়েছে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তবে ভেজা গমগুলো উপরে রাখলে না কেন? তাহলে সকলেই দেখতে পেত। অতঃপর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উক্ত হাদীসটি ইরশাদ করেন।

বর্তমানে আমাদের সমাজ জীবনে, বিশেষ করে কেনা-বেচার ক্ষেত্রে দুধে পানি মেশানো, শস্যে মাটি ইত্যাদি মিশিয়ে ওজন বাড়ানো, বিক্রির জন্য পন্য-দ্রব্যের ভুয়া প্রশংসা করা কিংবা দোষী দ্রব্যের দোষ গোপন করা এবং মাপে ফাঁকি দেয়া- সবই ধোকাবাজির শামিল। মুসলমানদের এহেন জঘন্য কার্যকলাপ পরিহার করা একান্ত কর্তব্য। অন্যথায় হারাম খাওয়ার কারনে সকল আমল বিফল ও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।

সংযোজন ঃ ধোকাবাজী, ছলচাতুরী ও ষড়যন্ত্র করার শাস্তি ঃ আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ খারাপ ষড়যন্ত্র ষড়যন্ত্রকারীকেই চারদিক থেকে ঘেরাও করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

✪ ষড়যন্ত্রকারী এবং দোকাবাজের স্থান জাহান্নামে। (কিঃ কাঃ) ✪ কোন ধোকাবাজ, কৃপন ও খোটাদানকারী জান্নাতে যাবেনা (কিঃ কাঃ) ✪ যে ব্যক্তি কারো ধন-সম্পদ ও পরিবার পরিজনের ব্যাপারে ধোকা দেয় সে জাহান্নামী। (মুসলিম)

৮ নং হাদীস ঃ

تَفْتَرِقُ اُمَّتِيْ عَلٰى ثَلٰثٍ وَ سَبْعِيْنَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِيْ النَّارِ اِلاَّ مِلَّةً وَاحِدَةً

قَالُوْا مَنْ هِىَ يَارَسُوْلَ اللهِ قَالَ مَااَنَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابِىْ

রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "আমার উম্মত তিহাত্তর দলে বিভক্ত হবে। একটি দল ব্যতীত সব কয়টি দলই জাহান্নামে যাবে। সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! সেই একটি দল কোন্‌টি ? তিনি বললেন ঃ আমি ও আমার সাহাবীরা যে পথে আছি, সে পথের অনুসারী দলটিই হল সে দল।" (তিরমিযী)

ڈھونڈو ڈھونڈو صحابہ کا طریق – جائیگا جنت میں بس وہ ہی فریق

انکے کیا اخلاق تھے کیا رنگ تھا - کیا تمدن انکا تھا کیا ڈھنگ تھا

کس قدر شیر وشکر آپس میں تھے - کیسے عاشق تھے رسول اللہ کے

মুমিনগণ ! সন্ধান কর সাহাবীদের পথটি-যাবে তো জান্নাতে তাঁদেরই অনুসারী দলটি।
কি-ছিল তাঁদের চরিত্র, কি-ছিল তাঁদের রং - কি-ছিল তাঁদের সভ্যতা, কি-ছিল তাঁদের ঢং।
পরস্পরে ছিলেন তাঁরা যেমন দুগ্ধ -চিনি - কতইনা ছিলেন তারা আল্লাহ- রাসূল প্রেমী।

ব্যাখ্যা ঃচারমাযহাবের অনুসারীরাই আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল-জামাআতঃ-আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল-জামাআত-ই ফির্‌কায়ে নাজিয়া বা নাজাত প্রাপ্ত দল। পরবর্তীতে যারা চার মাঁযহাবের কোন একটির অনুসারী, তাঁরাই আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাআত। এ-সিদ্ধান্তের উপর সকল হক্কানী আলেম একমত। এই চারটি মাযহাব মূলত ঃ এক ও অভিন্ন এবং এঁরাই হক্কের উপর প্রতিষ্ঠিত।

আলোচ্য হাদীসে "উম্মাতী" তথা আমার উম্মত বলে কিবলা পন্থীদের বুঝানো হয়েছে। সে মতে তিহাত্তর দলের সব ক'টিই ইসলামের গন্ডিভূক্ত। তাহলে, আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআত ছাড়া বাকী দলগুলো জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হল, তাদের পাপ এবং আকীদাগত ভ্রান্তি। তাই যার আকীদা কুফরের সীমায় পৌঁছাবে না, সে আল্লাহ তাআলার রহমত এবং প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুপারিশে শেষ পর্যন্ত নাজাত পেয়ে যাবে।

তিহাত্তর ফিরকার বিশ্লেষণ ঃ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত ব্যতীত অন্যান্যদের মূল দল সাতটি। যথা ঃ মু'তাযিলা, শীআ, খাওয়ারেজ, মুরজিয়া, নাজ্জারিয়া, জব্‌রিয়া ও মুশাববিহা। অতঃপর আকীদাগত খুঁটি-নাটি বিষয়ে অনৈক্যের কারণে বিভিন্ন উপদলের সৃষ্টি হতে থাকে। যেমন, মু'তাযিলাদের বিশ দল, শীআদের বাইশ, খাওয়ারেজদের বিশ, মুরজিয়ার পাঁচ, নাজ্জারিয়ার তিন এবং জব্‌রিয়া ও মুশাববিহার একটি করে দল। মোট বাহাত্তর দল। আর ফিরকায়ে নাজিয়া বা আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের একদল। সর্ব মোট তিহাত্তর দল।

সুতরাং সকল মুসলমানের উচিত, নাজিয়া দলে তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতে থাকার চেষ্টা করা, এদিক-সেদিক ছুটাছুটি না করা এবং নতুন নতুন সৃষ্ট দলসমূহ থেকে দূরে থাকা। বর্তমানে বাহ্যত ঃ তিহাত্তরাধিক যে সব দল পাওয়া যায় বা কিয়ামত পর্যন্ত সৃষ্টি হতে থাকবে, মূলত ঃ তা তিহাত্তর দলের মধ্যেই গণ্য হবে।

সংযোজন ঃ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত এর পরিচিতি ঃ তারাই আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআত, যারা জামাআতে সাহাবার অনুসৃত সুন্নতের পথকে আঁকড়ে ধরে রেখেছে। আকায়েদ শাস্ত্রে আহলে সুন্নাত-এর প্রধান ইমাম দুই জন। একজন হানাফী। তিনি হলেন ইমামুল হুদা আবূ মনসূর মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মাহমুদ আল-মাতুরীদী (রহঃ)। তিনি ৩৩৩হিঃ সনে ইহজগত ত্যাগ করেন।

অপরজন শাফেয়ী. তিনি হলেন ইমামুল মুতাকাল্লিমীন আবুল হাসান আলী বিন ইসমাঈল আল-আশ্'আরী (রহঃ)। তিনি প্রথমতঃ চল্লিশ বছর যাবত মুতাযিলা ফিরকার অনুসারী ছিলেন। অতঃপর এর বাতুলতা ও ভ্রষ্টতা বুঝতে পেরে তা পরিত্যাগ করেন এবং মুতাযিলা মতবাদকে বাতিল প্রমানিত করেন। তৎসংগে সুন্নাহ ও জামাআতে সাহাবার পথকে সঠিক প্রমান করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তখন থেকে সে পথের অনুসারীদের নামকরণ হয়ে যায় 'আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাআত'। তাঁর জন্ম ২৬২ হিজরীতে এবং ইন্তেকাল ৩৩০ হিজরীতে।

আহলে সুন্নাত ওয়াল-জমাআতের আক্বীদা-বিশ্বাস ঃ ❑ আল্লাহ তায়ালা চির অস্তিত্বশীল এবং নিজস্বভাবে বিদ্যমান। ❑ তিনি তাঁর ইল্ম, কুদ্‌রত ইত্যাদি গুনে চির গুনান্বিত। ❑ তিনি সকল প্রকার সাদৃশ্য মুক্ত ও তুলনাবিহীন, কেবল মাত্র তাঁর সৃষ্টি ও গুনাবলীর নিশানা দেখে তাঁকে চিনতে হয়। ❑ তিনি কোন স্থান বা দিক বেষ্টিত নন এবং স্থানান্তরের কল্পনাও তাঁর শানে করা যায় না। কারণ, তিনি সদা সর্বত্র বিরাজমান। ❑ অজ্ঞতা, মিথ্যা ও দোষ-ত্রুটি থেকে তিনি চির পবিত্র। ❑ তাঁর কোন গুন অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিযুক্ত নয়। ❑ মুমিন বান্দারা আখিরাতে তাঁকে স্বচক্ষে দেখতে পাবে। ❑ তিনি যা চান, তা হয়ে যায়। যা চান না, তা হতে পারে না ! ❑ তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ-কোন ব্যাপারে কারো মুখাপেক্ষী নন। ❑ সর্ব ব্যাপারে তিনি শরীক থেকে পবিত্র। ❑ তিনি কিছু করতে বাধ্য নন-সম্পূর্ণ সেচ্ছাধীন। ❑ বান্দার ইবাদতের পুরস্কার দান করা তাঁর মেহেরবাণী,বদলা নয় এবং গুনাহের শাস্তি প্রদান করা তাঁর ইনসাফ। ❑ তিনি যা কিছু করেন সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে করেন। ❑ তাঁকে ছাড়া আর কোন হুকুমদাতা নেই। ❑ তাঁকে কোনকাজে বা হুকুমে বে-ইন্‌সাফ বলা যেতে পারে না। যুলুম থেকে তিনি পূত পবিত্র। ❑ তাঁর সত্বা অংশ ও আংশিকতামুক্ত -- বিভিন্ন অংশে ও খন্ডে বিভক্ত বা বিভাজ্য হয় না। ❑ তাঁর সত্বা অনন্ত অসীম। ❑ হাযির, নাযির এবং ইল্‌মে গায়বের মালিক একমাত্র আল্লাহ্ তাআলা, অন্য কেউ নয়।

❑ মৃত্যুর পর আবার সশরীরে পুনরুজ্জীবন সত্য। ❑ আখিরাতে ভাল-মন্দ আমলের হিসাব-নিকাশ; প্রতিদান, পুলসিরাত, মীযান, জান্নাত, জাহান্নাম ও শাফাআত সত্য। ❑ কবীরা গুনাহকারী ব্যক্তি ঈমানহারা হয় না, বিনা তওবায় মারা গেলে গুনাহের শাস্তি ভোগ করার পর একদিন চিরস্থায়ী জান্নাত লাভ করবে। ❑ ভাল ও মন্দ সর্বপ্রকার কর্মের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ, বান্দা উহার উপার্জনকারী মাত্র।

❑ মু'জিযা সহ নবী-রাসূলগণের প্রেরণ সত্য। ❑ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পরে বরহক ইমাম ও খলীফা হযরত আবু বকর (রাযিঃ), তারপর হযরত উমর (রাযিঃ), তারপর হযরত উসমান (রাযিঃ), তারপর হযরত আলী (রাযিঃ)। ❑ কিব্‌লাপন্থী কোন মুসলিমকে কাফের বলা যায় না।

❑ নবী রাসূলগন সকলেই মাসুম-নিষ্পাপ। ছগীরা, কবীরা যে কোন গুনাহই তাঁদের থেকে হওয়া অসম্ভব। ❑ কোন নবীই তাঁর দায়িত্ব পালনে অবহেলা বা ত্রুটি করেননি; বরং প্রত্যেক নবীই তাঁর পূর্ণ সামর্থ্য ব্যয় করে নবুওয়াত ও রিসালাতের দায়িত্ব

পালনে আন্তরিকভাবে যত্নবান ছিলেন। তাঁরা দ্বীনের এমন কোন কাজ অসম্পূর্ন রেখে যাননি, যা পূর্ণতায় পৌঁছানোর জন্য পরবর্তী যুগে নবীগনের ন্যায় মাসুম ইমামের প্রয়োজন হতে পারে।

❑ কুরআন শরীফ আল্লাহর কালাম। এর মর্ম ও শব্দ আল্লাহ্ কর্তৃক অবতীর্ণ। ❑ কুরআন - শ্বাশ্বত, চিরন্তন ও সন্দেহের উর্ধ্বে। ❑ কুরআন মাখলূক বা সৃষ্ট বস্তু নয়। ❑ অগ্র-পশ্চাত কোন দিক থেকেই একে বাতিল স্পর্শ করতে পারে না। ❑ সকল প্রকার তাহ্‌রীফ - মানুষের পবির্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন থেকে মুক্ত এবং সংরক্ষিত। ❑ এর তাহ্‌রীফে বিশ্বাসী ব্যক্তি ঈমানের গন্ডি ভূক্ত নয়।

❑ আমাদের প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বশর তথা আল্লাহর সৃষ্টি মানব, তবে সাধারণ মানুষ নন; বরং তিনি ছিলেন আল্লাহ কর্তৃক ওহী প্রাপ্ত। তাঁর মর্যাদার আসন এত উচ্চে যে, সে আসন লাভ করা সৃষ্টির আর কারো পক্ষে সম্ভব নয়-আল্লাহর পর তাঁরই মর্যাদা। তবে আল্লাহ্‌র মর্যাদা অসীম-কোন মখলুকের সংগে তাঁর তুলনা বা কল্পনা করা শুধু অসম্ভবই নয়, চরম বে-আদবীও বটে।

❑ তিনি নবীকুল শ্রেষ্ঠ এবং সর্বশেষ নবী ও রাসূল। নবুওয়াতী সিল্‌সিলার পরিসমাপ্তি তাঁর দ্বারাই হয়েছে। তাঁর নবুওয়াত প্রাপ্তির পর থেকে যে কোনরূপ নবুওয়াতের দাবীদার প্রতিটি ব্যক্তি মুরতাদ ও কাফের - ইসলামের গন্ডী বহির্ভূত।

❑ তিনি সহায়াতে রওযা মোবারকে আছেন, ইত্যাদি।

আলোচ্য হাদীসের ব্যাখ্যায় মুসলমানদের যেই আটটি প্রধান দলের কথা বলা হয়েছে তম্মধ্যে 'নাজী ফিরকা' বলতে আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআতকেই বুঝায়।

বাকী সাতটি বাতিল ফিরকার সংক্ষিপ্ত পরিচয়ঃ

১। **মুতাযিলা ফির্কা** ঃ এ ফিরকা জন্ম নেয় হযরত হাসান বসরী (রহঃ) এর যুগে। ওয়াছেল বিন আতা হযরত হাসান বসরীর সংগে কতিপয় আকীদার ব্যাপারে সংঘাতে লিপ্ত হয়। কোনক্রমেই সে তার ভ্রান্ত আকীদা ত্যাগে সম্মত হলো না। উপরন্তু আমর বিন উবায়দ বিন বাব তার সংগে ঐক্যমত পোষন করল। তখন হযরত হাসান বসরী (রহঃ) তাদের দুজনকেই নিজ মজলিস থেকে বিতাড়িত করে দেন। তারা নিজেদের পরিচয় দিয়ে থাকে ইনসাফ ও তাওহীদ বাদী বলে। তাদের মোটামুটি ভ্রান্ত আকীদা গুলো এইঃ

❑ কবীরা গুনাহকারী ব্যক্তি মুমিন থাকে না, আবার কাফের ও হয়ে যায় না; বরং একটি মধ্যবর্তী স্তরে উপনীত হয়। বিনা তওবায় মারা গেলে চির জাহান্নামী হবে। ❑ মন্দ কর্মের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ নন-স্বয়ং বান্দা। ❑ কালামুল্লাহ শরীফ অনাদি নয়; বরং সকল সৃষ্টির ন্যায় একটি সৃষ্ট বস্তু। ❑ আখিরাতে আল্লাহকে কেউ দেখতে পারবে না। ❑ ইবাদতের পুরস্কার দেয়া এবং কবীরা গুনাহের শাস্তি দেয়া আল্লাহর আবশ্যকীয় কাজ, ইত্যাদি।

২। **শীআ ফির্কা ঃ** তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান (রাযিঃ) এর খেলাফত কালের শেষের দিকে শীআ ফিরকার উদ্ভব হয়। প্রথম পর্যায়ের বুনিয়াদি কথা ছিল খুবই সাদা-সিধে ও সরল প্রকৃতির নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিজরত কালে হযরত আলী (রাযিঃ) কে আমানত পৌঁছানোর দায়িত্ব অর্পন করেছেন, মদীনাতে নিজগৃহ রক্ষার দায়িত্ব দিয়েছেন, আদরের কন্যা হযরত ফাতিমা (রাযিঃ) কে তাঁর কাছে বিবাহ দিয়েছেন এবং খায়বর যুদ্ধে তাঁকে নিশান বরদার নিযুক্ত করেছেন। তাই নবীর পর খলীফা হওয়ার তিনিই একমাত্র যোগ্য ব্যক্তি। নিজেদেরকে তারা শীআনে আলী বা আলী সমর্থক বলে পরিচয় দিত।

কথাগুলো বাহ্যতঃ সুন্দর হলেও মূলতঃ নবীজীর আদর্শ পরিপন্থী এবং ষড়যন্ত্রমূলক। কারণ, নবীজীর আদর্শানুযায়ী বুযর্গী ও খেলাফতের মানদন্ড হলো তাকওয়া-পরহেযগারী, ত্যাগ ও কুরবানী। এদিক থেকে সিদ্দীকে আকবরের কোন জুড়ি নেই নিঃসন্দেহে।

মূলতঃ উক্ত ষড়যন্ত্রের নায়ক ছিল ইয়াহুদী মুনাফিক আবদুল্লাহ বিন সাবা। সে এবং তার হাতে গড়া কুচক্রী মহলের অপতৎপরতায়ই হযরত উস্‌মান (রাযিঃ) শহীদ হন এবং জঙ্গে জামাল ও জঙ্গে সিফ্‌ফীনের মত হৃদয় বিদারক যুদ্ধের ঘটনা ঘটে।

পরবর্তীকালে শীআরা বহু দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এদের প্রধান দলটিকে শীআ ইমামিয়া বা শীআ ইছনা আশারিয়া (বারো ইমাম পন্থী শীআ) বলা হয়। সাধারণতঃ এ-ফির্কাই বর্তমানে বিভিন্ন জায়গায় বিদ্যমান। নিম্নে এদের কয়েকটি মৌলিক আকিদা তুলে ধরা হল ঃ

(১) আকীদায়ে ইমামত ঃ এটা শীআ মতবাদের মূল ভিত্তি। তাদের ধারণা, নবীগণের মত তাদের ইমামগণও আল্লাহ প্রেরিত, ওহীপ্রাপ্ত এবং নিষ্পাপ-মাসুম। প্রয়োজনে কুরআনের যে কোন বিধানকে রহিত বা মওকুফ করার অধিকার তাঁরা রাখেন (২) সাহাবা বিদ্বেষ ঃ অর্থাৎ সাহাবায়ে কিরামের প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষন করা। তাদের ধারণা মতে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর তিরোধানের পর হযরত আবু বকর (রাযিঃ) এর হাতে বায়আত গ্রহণকারী সকল সাহাবী মুরতাদ তথা কাফির হয়ে গিয়েছেন। (নাউযুবিল্লাহ) কেননা, তারা ইমামে মাসুম হযরত আলীর হাতে বায়আত নেননি। অধিকন্তু, হযরত আলীও যেহেতু পূর্ববর্তী তিন খলীফার আমলে নিজের হাতে বায়আতের আহবান মুসলমানদের না জানিয়ে নিজেই তাঁদের হাতে বায়আত নিয়েছেন, তাই তিনিও তাদের অসন্তোষ মুক্ত নন।

(৩) তাহরীফে কুরআন ঃ অর্থাৎ কুরআন বিকৃত করণ। আর এ-আকীদাটি হল তাদের জঘন্যতর আকীদা। তাদের ধারণা, বর্তমান কুরআন নবীজীর উপর অবতীর্ণ কুরআন

নয়। সাহাবীগণ তা বিকৃত করে ফেলেছেন। আসল এবং বড় কুরআন তো অন্তর্হিত দ্বাদশ ইমামের সহিত কোন এক অজানা গুহায় প্রোথিত আছে।

৩। **খাওয়ারেজ ফির্কা** ঃ মুনাফিকদের চক্রান্তে ভুল বুঝাবুঝির দরুন হযরত আলী ও মুআবিয়া- দুই পক্ষের মাঝে সিফ্ফীনের যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং মীমাংসার জন্য হযরত আলীর (রাযিঃ) পক্ষে আবু মূসা আশ্আরী (রাযিঃ) কে এবং হযরত মুআবিয়ার (রাযিঃ) পক্ষে আমর ইবনুল আস (রাযিঃ) কে ফয়সালার ভার দেয়া হয়। তখন কুফার নিকটবর্তী এলাকা - 'হারুরা'র একটি দল বলে উঠল, গায়রুল্লাহ্র ফয়সালায় সম্মত হওয়ার কারণে হযরত আলী এবং মুআবিয়ার পক্ষ দুইটিই কাফের। (নাউযুবিল্লাহ) কারণ, আল্লাহ তাআলা বলেছেন - اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ "ফয়সালার অধিকার একমাত্র আল্লাহ্র।" চক্রান্তমূলক এ-অজুহাত দেখিয়ে তারা হযরত আলী ও হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ) উভয়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে।

একথা শুনে হযরত আলী (রাযিঃ) বললেন ঃ كَلِمَةُ حَقٍّ اُرِيْدَ بِهَا الْبَاطِلُ অর্থাৎ "কথা সত্য, মতলব খারাপ।" এরপর তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) কে পাঠিয়ে তাদের ভুল সংশোধনের চেষ্টা করেন। কিন্তু চেষ্টা ব্যর্থ হল। ফলে তাদের সাথে যুদ্ধ হয়। সে যুদ্ধে তাদের অধিকাংশ নিহত হয়। এ-ফির্কাটি কবীরা গুনাহকারীকেও কাফের মনে করে।

৪। **মুরজিয়া ফির্কা** ঃ এরা আমলকে জরুরী মনে করে না; বরং এরা বলে যে, ঈমান থাকলে গুনাহ কোন ক্ষতি করতে পারে না।

৫। **নাজ্জারিয়া ফির্কা** ঃ এরা মুহাম্মদ বিন হুসাইন নাজ্জারের অনুসারী। মু'তাযিলা ফিরকার ন্যায় এরাও কালামুল্লাহকে মাখলূক বা সৃষ্ট বস্তু মনে করে এবং আখিরাতে আল্লাহ্র দর্শন লাভ করাকে অস্বীকার করে।

৬। **জবরিয়া ফির্কা** ঃ এদের আরেক নাম জাহ্মিয়া। এরা জাহ্ম বিন সাফ্ওয়ান তিরমিযীর অনুসারী। এরা বান্দার কর্মশক্তি ও উপকরণ অবলম্বনের শক্তি আছে বলে স্বীকার করে না। আরও বলে যে, কোন বস্তুর অস্তিত্ব লাভের পূর্বে আল্লাহ তাআলা তার সম্পর্কে অবগত থাকেন না। জান্নাত, জাহান্নাম চিরস্থায়ী নয়-মানুষ তাতে প্রবেশ করার পর এক সময় তা ধ্বংস হয়ে যাবে, ইত্যাদি।

৭। **মুশাব্বিহা ফির্কা** ঃ এরা আল্লাহকে সৃষ্টির সংগে তুলনা করে বলে যে, আল্লাহ্র জন্যও রক্ত, মাংশ সম্পন্ন দেহ আছে অর্থাৎ আল্লাহ নিরাকার নন। (নাউযুবিল্লাহ)

কোন সাহাবীকে গালি দেয়া কবীরা গুনাহ ও উহার ভয়াবহ পরিণতি ঃ

✪ হাদীসে কুদ্সীতে আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ যে ব্যক্তি আমার কোন বন্ধুর সাথে শত্রুতা সুলভ আচরণ করবে, আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা করে রেখেছি। (বুঃ ও মুঃ)

✪ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা আমার সাহাবীদেরকে গালি দিওনা। যেই আল্লাহর হাতে আমার প্রান তার শপথ করে বলছি, তোমাদের কেউ যদি উহুদ পাহাড়ের সমান স্বর্ণ আল্লাহর পথে ব্যয় করে, তবুও সে (সওয়াবের দিক থেকে) কোন সাহাবীর একসের বরং অর্ধসেরের সমপর্যায়ে পৌছতে পারে না। (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী)

✪ তিনি আরো বলেছেন ঃ আমার সাহাবীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। আমার ওফাতের পর তাদেরকে গালি দেয়ার লক্ষ্যবস্তু বানিওনা। তাদেরকে যে ভালবাসবে, সে আমার ভালোবাসায় উদ্বুদ্ধ হয়েই ভালোবাসবে। আর যে তাদের প্রতি বিদ্বেষ রাখবে, সে আমার প্রতি বিদ্বেষবশতঃই তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষন করবে। তাদেরকে যে কষ্ট দিবে, সে আমাকে কষ্ট দিবে। আর আমাকে যে কষ্ট দিবে, সে আল্লাহকে কষ্ট দিবে। আর যে আল্লাহকে কষ্ট দিবে, তাকে তিনি অচিরেই পাকড়াও করবেন। (তিরমিযী)

সাহাবায়ে কিরামের গুরুত্ব ও মর্যাদার মূল কারণ ঃ এই যে, তাঁরা নবীজির কাছে সরাসরি ঈমান এনেছেন, তাঁর কাছ থেকে দ্বীন শিখেছেন এবং তাঁর সাথেই দাওয়াত, তাবলীগ ও জিহাদ করেছেন। তাঁরাই এ উম্মতের শ্রেষ্ঠ ও প্রথম প্রজন্ম। তাঁরা ত্যাগ ও কুরবানী না করলে আমরা কুরআন, হাদীস ও শরীয়ত-কিছুই পেতাম না। কাজেই তাঁদেরকে গালি দেয়া ও তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ পোষন করা স্বয়ং আল্লাহ, রাসূল ও দ্বীনের প্রতি বিদ্বেষ রাখার এবং ইসলাম থেকে খারিজ হওয়ার নামান্তর। বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বলেন ঃ কেউ যদি কারো তরীকা অনুসরণ করতে চায় তাহলে বিগতদের তরীকাই তার অনুসরণ করা উচিত। কেননা, জীবিত ব্যক্তি ফিৎনার সম্ভাবনা মুক্ত নয়। সেই বিগতরা হলেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবীগণ। হৃদয়ের সততা ও পবিত্রতায়, ইল্‌মের গভীরতায় এবং আড়ম্বরহীনতায় তাঁরা ছিলেন এই উম্মতের শ্রেষ্ঠ জামাআত। আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে আপন নবীর সংগী হওয়া এবং দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্যে মনোনীত করেছিলেন। সুতরাং তোমরা তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নাও, তাঁদের পদাংক অনুসরণ কর এবং সাধ্যানুসারে তাঁদের আদর্শ ও তরীকাকে আঁকড়ে ধর। কেননা, তাঁরা ছিলেন সরল ও সঠিক পথের পথিক। (রাযীন-মিশকাত ৩২)

দশ জন শ্রেষ্ঠ সাহাবী ঃ সকল সাহাবীর মধ্যে দশজন শ্রেষ্ঠ। এরা আশারায়ে মুবাশ্শারা। অর্থাৎ জীবিতকালেই তাঁরা জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছেন। তাঁরা হলেন হযরত আবুবকর, উমর, উসমান, আলী, তাল্‌হা, যুবায়র, আব্দুর রহমান বিন আউফ, সা'দ বিন ওয়াক্কাস, সাঈদ বিন যায়দ ও আবু উবায়দা বিন জাররাহ (রাযিঃ)। তাঁদের মধ্যে আবার চার খলীফা শ্রেষ্ঠতম। তাঁদের সম্পর্কে নবীজি বলেছেন ঃ তোমরা

আঁকড়েধর আমার সুন্নতকে এবং আমার পর হেদায়াতপ্রাপ্ত খলীফাগণের সুন্নতকে। আর নতুন উদ্ভাবিত শরীঅত বহির্ভূত বিষয় প্রত্যাখ্যান কর।

সাহাবায়ে কিরামের পারস্পরিক মতভেদ ও উহার শরীঅত সম্মত ফয়সালা ঃ সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যেসব বিষয়ে মত পার্থক্য হয়েছে সে সব বিষয় নিয়ে কিছুটা সমস্যায় পড়তে হয় বটে। তবে এ ক্ষেত্রে নীরবতা অবলম্বন করাই নিরাপদ রাস্তা। একান্তই যদি মতামত ব্যক্ত করতে হয় তাহলে অধিকাংশ সাহাবীর মতের পক্ষে এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের নীতির পক্ষে রায় দিতে হবে। কিন্তু ভিন্ন মতাবলম্বী সাহাবীদের ব্যাপারে কোন বিরূপ মন্তব্য করা কখনো বৈধ হবে না। তাঁদের আন্তরিকতা, ইখ্‌লাস, সততা ও সত্যবাদিতা সম্পর্কে সন্দেহ পোষন করা যাবে না। তাঁদের সম্পর্কে সেই আকীদাই আমাদের পোষন করতে হবে যা কুরআনে ঘোষনা করা হয়েছে। তা হলো ঃ "আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট"। সুতরাং তাঁরা উম্মতের সকল সমালোচনার উর্ধ্বে। তাঁদের মধ্যে পারস্পরিক কিছু মতভেদ থাকা সত্ত্বেও, এমনকি তাঁদের মধ্যে জংগে জামাল ও জংগে সিফ্‌ফীন সংঘটিত হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা সকলেই সন্দেহাতীতভাবে জান্নাতী। আমাদের তাঁদের কার্যকলাপ নিয়ে মাথা ঘামানোর পরিবর্তে নিজেদের পরিণাম নিয়ে মাথা ঘামানো উচিত (কিঃ কাঃ)।

হাদীস নং - ৯ ঃ

اِتَّبِعُوا السَّوَادَ الْاَعْظَمَ فَاِنَّهُ مَنْ شَذَّ شُذَّ فِي النَّارِ

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "তোমরা বড় জমাআত তথা গরিষ্ঠ দলের অনুসারী হও। কেননা, যে ব্যক্তি (সংখ্যা গরিষ্ঠ) দল থেকে পৃথক হবে, সে একাকী জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।" (মিশকাত)

অনুসরনযোগ্য সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সেটিই যে দলে হক্কানী উলামায়ে কেরাম বেশী। অতএব, হক্কানী উলামায়ে কেরামের দল বাছাই করে সে দলের অনুসারী হও। ছোট-খাট এবং নতুন নতুন বাতিল ও পথভ্রষ্ট দলের প্রতি দৃষ্টিপাত করোনা।

সংযোজন ঃ মুহজতাহিদ ইমামগণের মতভেদ দোষনীয় নয় এবং আহলে সুন্নাতের মাপকাঠি ঃ ইবনে মাজা শরীফে 'সাওয়াদে আ'যম' অনুচ্ছেদে আনাস বিন মালিক (রাযিঃ) থেকে হাদীছটি নিম্নরূপে বর্ণিত আছে - قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ اُمَّتِيْ لَاتَجْتَمِعُ عَلٰى ضَلَالَةٍ فَاِذَا رَأَيْتُمْ اِخْتِلَافًا فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْاَعْظَمِ হযরত আনাস বিন মালিক (রাযিঃ) বলেন ঃ "আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ইরশাদ করতে শুনেছি যে, আমার

উম্মত কখনো গোমরাহীর উপর একমত হবে না। তাই তোমরা মতবিরোধ দেখলে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকে আঁকড়ে ধর।"

শাহ আব্দুল গনী মুজাদ্দেদী দেহলভী (রহঃ) 'ইনজাহুল হাজা' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে "এ হাদীসটি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মি'য়ার বা মাপকাঠি। অতএব আহলে সুন্নাত-ই যে একমাত্র 'সাওয়াদে আযম' বা অনুসরনযোগ্য বড় দল, তা প্রমানের অপেক্ষা রাখে না। কেননা, ভ্রান্ত বাহাত্তর দলের সব কয়টি মিলেও আহলে সুন্নাতের এক দশমাংশ হবে না। পক্ষান্তরে, মুজ্‌তাহিদীন, মুহাদ্দেসীন, সুফিয়ায়ে কিরাম ও ইল্‌মে কিরাতের ইমামগনের ইখ্‌তিলাফ বা মত পার্থক্য দোষনীয় নয়। তাঁরা একে অপরকে গোমরাহীর আখ্যা দেননি। ইমামুল মুহাদ্দেসীন আল্লামা সুয়ূতী (রহঃ) 'ইত্‌মামুদ্দেরায়া' গ্রন্থে বলেছেন যে, আমরা বিশ্বাস করি যে, আকীদা ও ফিকাহের ক্ষেত্রে চার ইমাম সহ সকল ইমামই ছিলেন আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রদর্শিত সঠিক পথের পথিক। তাঁদের মধ্যে ইমাম আবুল হাসান আশ্‌আরী (রহঃ) ছিলেন আকীদার ক্ষেত্রে অন্যতম। আর সুফীকুল শ্রেষ্ঠ আবুল কাসেম জুনায়েদ বাগদাদী (রহঃ) এর 'তরীকত' ছিল ইল্‌ম ও আমল উভয় ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ তরীকত। যা ছিল সম্পূর্ণ বিদআত মুক্ত, আস্‌বাব অবলম্বন ও আল্লাহর প্রতি সমর্পন - এতদুভয়ের মাঝে আবর্তিত এবং কুরআন - সুন্নাহর উপর পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত।" (সংক্ষিপ্ত)

চার মাজহাবের বাইরে যাওয়া নিরাপদ নয়; বরং বিপদসংকুল পথ ঃ বিশ্বনন্দিত মুহাদ্দিস ও দার্শনিক আল্লামা শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (রহঃ) তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'ইক্‌দুলজীদ' এ-লিখেন ঃ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِتَّبِعُوا السَّوَادَ الْاَعْظَمَ " وَلَمَّا انْدَرَسَتِ الْمَذَاهِبُ الْحَقَّةُ اِلَّا هٰذِهِ الْاَرْبَعَةُ كَانَ اِتِّبَاعُهَا اِتِّبَاعًا لِلسَّوَادِ الْاَعْظَمِ وَالْخُرُوْجَ عَنْهَا خُرُوْجًا عَنِ السَّوَادِ الْاَعْظَمِ " অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ 'তোমরা সাওয়াদে আ'যম তথা সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের অনুসারী হও।' এখন যেহেতু চার মায্‌হাব ছাড়া অন্য সমস্ত হক মাযহাব বিলুপ্ত হয়ে গেছে, তাই এই চার মায্‌হাবের অনুসরনই হল 'সাওয়াদে আ'যমের' অনুসরন আর এ-চারটির বাইরে যাওয়া হল সাওয়াদে আযমকে বর্জন করা।"

চার ইমামের মর্যাদা ঃ হযরত সাহাবায়ে কিরাম (রাযিঃ) এবং শীর্ষস্থানীয় তাবেঈনের পর আইম্‌মায়ে মুজতাহেদীন-ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেঈ ও ইমাম আহমাদ (রহঃ) ইলমে শরীঅত ও মারেফত এবং বুযর্গী, মর্যাদা ও উম্মতের উপর এহ্‌সানের ক্ষেত্রে সকলের উর্ধ্বে। আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে দ্বীনে মুহাম্মাদীর সুবিন্যস্তকরণ ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষরেন জন্য নির্বাচিত করেছেন। তাই পরবর্তী সকল

আইম্মায়ে ত্বরীকত-আউলিয়ায়ে কেরাম (যেমন হযরত জীলানী, চিশতী সোহরাওয়ার্দী, নক্‌শবন্দ ও মুজাদ্দিদে আল ফে সানী (রহঃ) প্রমুখ) তাঁদের মাযহাব কে স্বীয় নাজাতের পথ হিসাবে গ্রহণ করেছেন এবং তাঁদের অনুসরন ও অনুকরণ করেগেছেন।

১০ নং হাদীস ঃ

مَنْ فَرَّجَ عَنْ اَخِيْهِ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি তার (মুসলমান) ভাইয়ের একটি পার্থিব সমস্যার সমাধান করে দিবে, আল্লাহ তাআলা তার একটি পরকালীন সমস্যার সমাধান করে দিবেন।" (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীসে পরোপকারের মর্তবা ও প্রতিদান বর্ণনা করার মাধ্যমে বিপদের সময় মুসলমানদের সাহায্য-সহযোগীতায় এগিয়ে আসার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে এবং সাহায্যকারীকে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে যে, মহা বিপদে ঘেরা কিয়ামত দিবসের কঠিন বিপদ থেকে তাকে নাজাত দেয়া হবে, যেদিন আল্লাহ ব্যতীত আর কোন সাহায্যকারী থাকবে না। এ-প্রসংগে কবি খুব সুন্দর বলেছেন ঃ

ہمدرد کیا چاہو جو تم قوم کو اپنا - ہمدرد بنو قوم کا دکھ درد بٹاؤ

" যদি পেতে চাও জাতির সেবা বিপদে তোমার,

নিজেকে প্রথমে সেবক বানাও, খুলে সহানুভূতির দ্বার "।

১১ নং হাদীস ঃ

مَنْ قُتِلَ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ وَمَنْ مَاتَ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ وَمَنْ مَاتَ فِى الطَّاعُوْنِ فَهُوَ شَهِيْدٌ وَمَنْ مَاتَ فِى الْبَطْنِ فَهُوَ شَهِيْدٌ وَمَنْ غَرِقَ فَهُوَ شَهِيْدٌ

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "আল্লাহর পথে তথা জিহাদে নিহত ব্যক্তি শহীদ, আল্লাহর পথে (যেমন হজ্জ, ইল্‌মেদ্বীন শিক্ষা ইত্যাদি ধর্মীয় কাজের সফরে) স্বাভাবিকভাবে মৃত্যু বরনকারী শহীদ, প্লেগ ও মহামারিতে প্রান ত্যাগকারী শহীদ, পেটের রোগে (ডায়রিয়া) মৃত ব্যক্তি শহীদ এবং পানিতে ডুবে যে মারা যায় সে শহীদ। (মুসলিম শরীফ)

ব্যাখ্যা ঃ শাহাদত দুই প্রকার ঃ শাহাদতে কুব্‌রা ও শাহাদতে সুগ্‌রা। শাহাদতে কুব্‌রা বা বড় শাহদত হল, ই'লায়ে কালিমাতুল্লাহ তথা আল্লাহ্‌র দ্বীনকে বিজয়ী করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌র পথে জীবন দেয়া। শাহাদতে সুগ্‌রা বা ছোট শাহাদত সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়েতে সত্তর প্রকারের বিবরণ এসেছে। আলোচ্য হাদীসে বর্নিত শেষোক্ত চার প্রকার ছাড়াও প্রসিদ্ধ কয় প্রকার হল ঃ পরদেশে মারা যাওয়া, অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা

যাওয়া, ইল্‌মে দ্বীন অর্জনকালে মারা যাওয়া, সন্তান প্রশবকালে কিংবা গর্ভাবস্থায় মারা যাওয়া, স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহে স্ত্রী ধৈর্য্য ধারন করতঃ জীবন যাপন করে মারা যাওয়া, রোগাক্রান্ত হওয়ার শুরু লগ্ন থেকে "لَآاِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ" পড়তে পড়তে মারা যাওয়া (অবশ্য, এক হাদীসে চল্লিশ বারের উল্লেখ রয়েছে), বিষক্রিয়ায় মারা যাওয়া, হিংস্র জন্তুতে খেয়ে ফেলা, মাটির নীচে ধ্বসে মারা যাওয়া, নিজের মাল, আওলাদ ও আপনজন রক্ষার্থে মারা যাওয়া। এ সকল ক্ষেত্রেই শাহাদতের সওয়াব লাভ হয়। সুব্‌হানাল্লাহ্‌! মানুষ বিছানায় শুয়ে মারা যায়, অথচ তার নাম শুহাদায়ে কিরামের তালিকাভূক্ত হয়ে যায়। আল্লাহর রহমত তো কেবল বাহানা-ই তালাশ করে।

১২ নং হাদীস ঃ

مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِىْ عِنْدَ فَسَادِ اُمَّتِىْ فَلَهٗ اَجْرُ مِائَةِ شَهِيْدٍ

রাসুলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "আমার উম্মতের ফিৎনা-ফাসাদের সময় যে আমার সুন্নত-ত্বরীকাকে আঁকড়ে ধরবে, তার জন্য রয়েছে একশত শহীদের সওয়াব।" (বায়হাকী) এতবেশী সওয়াবের কারন হল, এমন নাজুক পরিস্থিতিতে সুন্নতগুলোর উপরে অটল থাকা সীমাহীন কষ্ট সাধ্য কাজ।

সংযোজন ঃ আলোচ্য হাদীসে ফাসাদের অর্থ হলো, ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞতা বিদআতের প্রভাব বিস্তার করা।

সুন্নাত ও বিদ্‌আত সম্পর্কে কতিপয় হাদীস ঃ ❑ যে আমার অবর্তমানে আমার কোন বিলুপ্ত সুন্নতকে পুনরুজ্জীবিত করবে, উহার উপর আমলকারীদের সমান সওয়াব সেও পাবে। আমলকারীদের সওয়াব মোটেও কমবেনা। পক্ষান্তরে, যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অসন্তোষ জনিত, পথভ্রষ্টকারী কোন বিদ্‌আত আবিষ্কার করবে, উহার উপর আমলকারীদের পাপের বোঝা তার ঘাড়েও বর্তাবে। অথচ এতে আমলকারীদের পাপের বোঝা একটুও কমবেনা। (তিরমিযী)

❑ যে সম্প্রদায় একটি বিদআত আবিষ্কার করবে তাদের থেকে সেই পর্যায়ের একটি সুন্নত উঠিয়ে নেয়া হবে। সুতরাং একটি নিম্নপর্যায়ের সুন্নত আঁকড়ে ধরা বহুগুনে উত্তম, একটি বড় বিদআতে হাসানার প্রচলন দেয়া অপেক্ষা। (মুস্‌নাদে আহমদ)

❑ আমি তোমাদের মাঝে দু'টি বস্তু রেখে গেলাম। যদি এ দু'টিকে আঁকড়ে ধরে রাখ, কখনো পথ হারা হবে না। একটি আল্লাহর কিতাব অপরটি তাঁর রাসূলের সুন্নত। (মিশ)

❑ "কোন বিদআতী ব্যক্তিকে যে সম্মান দেখালো ইসলামের ধ্বংস সাধনে সে সাহায্য করল।" (বাঃ) ❑ "যখন আমার উম্মতের মধ্যে বিদআত সৃষ্টি হবে এবং আমার সাহাবীদের মন্দ বলা হবে, তখনকার আলেমের উপর কর্তব্য হবে নিজের ইলম প্রকাশ

— ৫

করা। আর যে এটা করবে না তার উপর আল্লাহ্, ফেরেশ্তা ও সকল মানুষের লা'নত। (মিশঃ)

ওয়ালীদ বিন মুসলিম বলেন, এখানে ইলম প্রকাশ করার অর্থ সুন্নতের প্রচার করা। সাহাবী হযরত হুযায়ফা (রাযিঃ) বলেন, 'আল্লাহর কসম! ভবিষ্যতে বিদ্আত এমন ভাবে ছড়িয়ে পড়বে যে, কেউ বিদআত ত্যাগ করলে লোকেরা বলবে - তুমি সুন্নত ছেড়ে দিয়েছ।"

- ❑ সর্বোত্তম বানী আল্লাহ্র কিতাব। সর্বোত্তম আদর্শ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদর্শ। নিঃকৃষ্টতম বিষয় নব আবিষ্কৃত বিষয় এবং সমস্ত নব আবিষ্কৃত (দ্বীনী) বিষয় গোমরাহী। (মুসলিম)
- ❑ আমার সকল উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করবে, কিন্তু যে'অস্বীকার করে সে ছাড়া। জিজ্ঞাসা করা হল, কে অস্বিকার করে? তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যে আমার আনুগত্য করে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে আর যে আমার নাফরমানী করে সে আমাকে অস্বিকার করল। (বুখারী)

সুন্নতের সংজ্ঞা ঃ আকিদা, আমল, আখলাক, লেনদেন, চাল-চলন ও আচার-আচরনের ব্যাপারে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে নিয়ম -নীতি অবলম্বন করেছেন, তা-ই সুন্নত।

খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নতও সুন্নতে রাসুলের অন্তর্ভূক্ত। হাদীস শরীফে আছেঃ তোমরা আমার সাহাবীদের সম্মান কর। কেননা, তাঁরা তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম। তারপর তাদের পরবর্তীরা। তারপর তাদের পরবর্তীরা। এরপর মিথ্যার প্রবণতা দেখা দিবে। অন্য হাদীসে তাঁদেরকে আমানতদার, বিশ্বস্ত ও হেদায়েতের ক্ষেত্রে নক্ষত্রসদৃশ বলা হয়েছে। অতএব সাহাবায়ে কিরামের সুন্নত প্রকৃত পক্ষে সুন্নতে রাসুলের আয়েনা স্বরূপ। যে কাজ তাঁরা ঐক্যবদ্ধভাবে করেছেন বা ছেড়েছেন, তা অকাট্যভাবে করনীয় বা বর্জনীয়। তা থেকে সরে দাঁড়ানো কিংবা দ্বিমত পোষন করা কারো পক্ষেই জায়েয নয়। আর যে কাজ একজন সাহাবী করেছেন কিন্তু অন্য কোন সাহাবী তাতে অসম্মতি প্রকাশ করেন নি, নিঃসন্দেহে তাও হক এবং অনুসরনীয়। তাতে কোন প্রকার সন্দেহ কিংবা দ্বিমত পোষন করার অবকাশ নেই।

আবার যেহেতু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথম তিন যুগের লোকদেরকে খায়রুল কুরুন তথা সর্বোত্তম যুগের মানুষ বলে আখ্যায়িত করেছেন অর্থাৎ সাহাবা, তাবেঈন ও তাবে তাবেঈন, তাই এ-তিন যুগে যে কাজ বিনা প্রতিবাদে অনুসৃত হয়েছে তাও সুন্নতের আওতাভূক্ত।

বিদআতের সংজ্ঞা ঃ 'বিদআত' সুন্নতের বিপরীত বিষয়কে বুঝায়। অর্থাৎ এমন সব বিষয়, যা সওয়াবের উদ্দেশ্যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং

খোলাফায়ে রাশেদীনের পর অবলম্বন করা হয়েছে এবং নবী ও সাহাবা যুগে এর দাবী ও কারন বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তখন তা পালিত হওয়ার ব্যাপারে কোনরূপ প্রমান পাওয়া যায়নি, না কথায়, না-কাজে, না- স্পষ্টভাবে, না-ইংগিতে। (আল্লামা বরকুঈ, আল্লামা শাতেবী) এমনিভাবে নবী আলাইহিস্‌সালাম কর্তৃক সত্যায়িত তিন যুগের সর্বশেষ যুগ অর্থাৎ তাবে তাবেয়ীনের যুগ পর্যন্ত কারন বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও যে বিষয়টি দ্বীন হিসাবে গৃহিত হয়নি, পরবর্তীযুগে সেটিকে দ্বীনরূপে গ্রহন করার নামই হল বেদ্‌আত।

অতএব, নিছক অভ্যাসরূপে এবং পার্থিব প্রয়োজনের তাকীদে যে সব বিষয় পরবর্তীতে অবলম্বিত হয়েছে, এগুলো কিছুতেই শরীঅত ঘোষিত বিদ্‌আত নয়। কেননা, এগুলো ইবাদত ও সওয়াবের নিয়তে করা হয় না। শরীঅতের বিধানের পরিপন্থী না হলে নিঃসন্দেহে এসব বিষয় জায়েয এবং মোবাহ। যেমন, গাড়ী ও বিমানে আরোহন করা।

দ্বীনী মাদ্রাসা, আরবী সাহিত্য, জিহাদের আধুনিক অস্ত্র ও প্রশিক্ষন ইত্যাদি বিদ্‌আত নয় ঃ বিদ্‌আতের সংজ্ঞা থেকে বুঝা গেল যে, যেই সকল ইবাদত নবী অথবা সাহাবায়ে কিরামের কথা বা কাজ থেকে স্পষ্টরূপে কিংবা ইংগিতেও প্রমানিত হয়, তা বিদআত হতে পারে না। এমনিভাবে তাবেয়ীন ও তাবে তাবেয়ীনের যুগে বিনা প্রতিবাদে কোন দ্বীনী কাজ হয়ে থাকলে, সেটাকেও বিদ্‌আত বলা যাবে না। আবার একথাও বুঝা গেছে যে, সে যুগে অপরিহার্য কারনরূপে যে বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়নি; কিন্তু পরবর্তীতে কোন দ্বীনী উদ্দেশ্য বা মূল বিষয়কে কায়েম রাখার লক্ষ্যে ঠেকা বশতঃ তা উদ্ভাবিত হয়েছে, সেটাও বিদআতের অন্তরর্ভূক্ত নয়। যেমন, দ্বীনী মাদ্রাসাসমূহ, আরবী সাহিত্য এবং মান্‌তিক ও ফাল্‌সাফা বিষয়ের চর্চা, জিহাদের আধুনিক অস্ত্র ও প্রশিক্ষণ পদ্ধতি, ইত্যাদি। এগুলো যদিও নবী এবং সাহাবা যুগে ছিল না, কিন্তু মূল ইবাদত কায়েমের অনিবার্য কারণ হওয়ার ভিত্তিতে সহায়ক ইবাদতরূপে গন্য বলে বিদআত নামে আখ্যায়িত হবে না। পক্ষান্তরে, যদি কোন মূল ইবাদতের সহায়ক হিসাবে এমন কোন কাজ করা হয়, যা সেই ইবাদত কায়েমের জন্য অনিবার্য কারন নয় এবং উহা করতে গেলে আকীদা ও আমলের ক্ষেত্রে শরীঅতের সীমা লংঘিত হয়, তা সহায়ক ইবাদতরূপে গন্য হতে পারে না; বরং বিদআতরূপে আখ্যায়িত হওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। এক কথায়, দ্বীনের সহায়ক ও মাধ্যম হিসাবে যে বিষয়টি অবলম্বন করা হয়- যার উপর দ্বীনের হেফাযত নির্ভরশীল- তা বিদ্‌আত নয়। পক্ষান্তরে, দ্বীনের সহায়ক ও মাধ্যমরূপে নয়; বরং দ্বীনের অংশ হিসাবে যে কাজ করা হয় তা বিদ্‌আতরূপে গণ্য।

সুন্নত ও বিদআতের পার্থক্যের ব্যাপারে কতিপয় মূলনীতি ঃ যে বিষয়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আমল একাধিক পন্থায় পাওয়া যায়, সে বিষয়ে

সবগুলো পন্থাই সুন্নত। একটিকে গ্রহন করে অন্যটিকে বিদআত বলা যাবে না । তবে কোনটি মানসূখ বা রহিত হয়ে গেলে ভিন্ন কথা। যেমন, ইমামের সুরা ফাতিহা শেষে 'আমীন' বলার ব্যাপারে নবীজীর আমল দু'ভাবেই পাওয়া যায় -আস্তে এবং জোরে। অতএব, উভয়টিই সুন্নতরূপে গণ্য । তবে আমলের ক্ষেত্রে এক ইমাম একটির প্রাধান্য প্রমান করে সেটির উপর আমল করেছেন।

(২) কোনক্ষেত্রে অধিকাংশ সময় নবীজীর যেই আমল ছিল, তা-ই হবে আসল সুন্নত। পক্ষান্তরে, সে ক্ষেত্রে এর বিপরীত যে আমলটি ছিল দু'একবার, তা-হবে জায়েয; বিদ্আত বলা ঠিক হবে না। যেমন ওযুর অঙ্গ সমূহ ৩বার ধোয়া সুন্নত, ১-২ বারধোয়া জায়েজ।

(৩) শরীঅত কর্তৃক যেখানে যেই আমল নির্দিষ্ট হয়েছে, নিজের খেয়াল-খুশিমত অন্যত্র তা আঞ্জাম দেয়া সাব্যস্ত করে নিলে, বিদ্আদতরূপে গন্য হবে। যেমন, নামাযের শেষ বৈঠকে দরূদ পড়া সুন্নত । যদি কোন জ্ঞানপাপী বলে যে, দরূদ শরীফে মন্দের তো কিছু নেই, প্রথম বৈঠকে পড়লেই বা দোষ কি? তাহলে এটা হবে চরম ভুল ও স্পষ্ট বিদ্আত। এ-কারনেই তো প্রথম বৈঠকে ভুল বশতঃ দরূদ পাঠে সাজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয় এবং সেচ্ছায় পড়লে নামাযই দোহ্‌রাতে হয়। এমনিভাবে শয়তান দূর করনার্থে দাফনের পর কবরপার্শ্বে অথবা জানাযা ও ঈদের নামাযে আযান দেয়া বিদ্আত হবে। কেননা, আযান শুধু পাঁচ ওয়াক্তের ফরয নামাযের জন্যেই সুনির্দিষ্ট।

(৪) যে সকল ইবাদতের জন্য শরীঅত কর্তৃক সময় নির্ধারিত নেই, সে ক্ষেত্রে সময় নির্দিষ্ট করা বিদ্আত। যেমন, কবর যিয়ারত ও ঈসালে সওয়াবের জন্য মৃত্যু তারীখ কিংবা অন্য কোন তারীখ নির্দিষ্ট করে নেয়া। শাহ আব্দুল আযীয দেহলভী (রহঃ) এক প্রশ্নের জবাবে লিখেন - "কবর যিয়ারত জায়েয, কিন্তু সময় নির্ধারণ করা 'সালাফ' এর যুগ তথা প্রথম তিন যুগে ছিল না। তাই সময় নির্ধারনের ফলে কাজটি বিদ্আতে পরিনত হয়।" (ফাতাওয়া আযীযী ১ম খঃ ৯৩পৃঃ)

(৫) যে ইবাদত যে নিয়মে করা শরীঅতে বিধিত হয়েছে, তা-সে নিয়মেই আদায় করা আবশ্যক। তার নিয়মের পরিবর্তন ঘটানো হারাম ও বিদ্আত। যেমন, জুমুআ ও দুই ঈদ বাদে দিবাভাগের নামাযে সুরা গুলো পড়তে হয় চুপে চুপে এবং রাতের নামাযে পড়া হয় শব্দ করে। এখন কেউ যদি মনের তৃপ্তির জন্য এর বিপরীত করে তাহলে তা-হবে বিদ্আত এবং নাজায়েয।

(৬) যেই সকল ইবাদত ব্যক্তিগতভাবে আদায় করা শরীঅতে বিধিত হয়েছে, তা সম্মিলিতভাবে আদায় করা বিদ্আত। যেমন, নফল নামায ব্যক্তিগত ইবাদত-একাকী আদায় করাই শরীঅতের নিয়ম। তা সম্মিলিতভাবে আদায় করাকে হানাফী ফেকাহ্‌বিদ্‌গন মাকরূহ এবং বিদ্আত বলেছেন।

(৭) যে কাজ মূলতঃ মোবাহ বা জায়েয, তাতে যদি বিদ্‌আতের সংমিশ্রন ঘটে কিংবা উহাকে সুন্নত মনে করা হয়, তখন সেই জায়েয কাজটিও নাজায়েয হয়ে যায়। ফিকাহ গ্রন্থে এর উদাহরণ অনেক। যেমন, আলমগীরী ও শামী গ্রন্থে আছে, নামাযের পর সেজদায়ে শোকর আদায় করাকে হানাফী আলেমগন মাকরূহ লিখেছেন। অথচ স্বজাতগতভাবে উহা জায়েয। তা সত্বেও নামাযের পর মাক্‌রূহ হওয়ার কারণ হল, অজ্ঞ লোকেরা উহাকে সুন্নত বা ওয়াজিব মনে করা।

(৮) যে কাজ মূলতঃ মুস্তাহাব, কিন্তু সেটির উপর ধারাবাহিক আমল চালু থাকায় লোকেরা যদি সেটিকে আবশ্যকীয় মনে করে এবং কেউ সে কাজ না করলে তাকে নিন্দা ও তিরস্কার করে, তখন সেই কাজটি মুস্তাহাব হওয়ার পরিবর্তে বিদ্‌আত ও গুনাহে পরিণত হয়। এ ব্যাপারে সাহাবী হযরত ইবনে মাস্‌উদ (রাযিঃ) এর একটি সতর্কবানী উল্লেখযোগ্য। সতর্কবানিটির পটভূমি হল -- নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযের সালামের পর অধিকাংশ সময় ডানমোড়ে মুক্তাদীদের দিকে ফিরতেন। পরে হযরত ইব্‌নে মাসউদ (রাযিঃ) লোকদেরকে এব্যাপারে সতর্ক করে বলেন ঃ "তোমাদের মধ্যে কেউ যেন স্বীয় নামাযের অংশীদার শয়তানকে না বানায়। আর তা হল, নামায শেষে শুধু ডানদিকে ফেরাকে জরুরী মনে করা। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বহু সময় বাম দিক হয়ে ফিরতেও দেখেছি।"

(৯) কাফের, বদ্‌কার, গোমরাহ ও বিদআতপন্থীদের ধর্মীয়, দলীয় ও সামাজিক কোন কাজের সাদৃশ্য গ্রহণ করা না-জায়েয এবং তা বর্জন করা আবশ্যক। কেননা, অনেক হাদীসে তাদের সাদৃশ্য অবলম্বনের ব্যাপারে সতর্কবানী এসেছে। যেমন, একটি হাদীসে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ "যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য বা রূপধারণ করবে, সে তাদের মধ্যে গণ্য হবে।"

এ মূলনীতির ভিত্তিতেই উলামায়ে আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআত মুহাররম মাসে শহীদে কারবালা হযরত হুসাইন (রাযিঃ) - এর শাহাদত সম্পর্কে আলোচনা অনুষ্ঠান নিষেধ করেছেন। কেননা, তা শীআ ও রাফেযী সম্প্রদায়ের শেআর বা নিদর্শন।

যে কাজের মধ্যে সুন্নত ও বিদ্‌আত হওয়ার ব্যাপারে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দেখা যায়, তা বর্জন করাই শ্রেয় এবং যুক্তিযুক্ত। তাই এরূপ বিষয় নিয়ে বাড়া-বাড়ি না করাই উচিত।

১৩ নং হাদীস ঃ

مَنْ لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ

রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ"যে ব্যক্তি কারো প্রতি দয়া করবে না, আল্লাহও তার প্রতি দয়া করবেন না।" (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা : প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার হযরত হাসান (রাযিঃ)কে আদর করে চুম্বন করলেন। উপস্থিত এক ব্যক্তি বলল, আমার দশটি ছেলে রয়েছে, আমি কখনো কাউকে এরূপে আদর করিনি। তদুত্তরে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলোচ্য হাদীসটি ইরশাদ করেন।

সংযোজন : সৃষ্টির প্রতি দয়া-মায়া সম্পর্কে কতিপয় হাদীস : আলোচ্য হাদীসে বর্ণিত দয়া-মায়া কেবল মানুষের বেলায়ই নয়; বরং মানুষের সংগে সংগে অন্যান্য সৃষ্টির প্রতিও দয়া-মায়া দেখাতে হয়। এ-প্রসংগে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কয়েকখানা হাদীস নিম্নে উদ্ধৃত হল :

❑ তার সংগে আমার সম্পর্ক নেই, যে আমাদের ছোটকে মায়া করে না, বড়কে সম্মান করে না এবং সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে বাধা দেয় না। (তিরমিযী)

❑ যে ব্যক্তি তিন কন্যা অথবা বোনের লালন-পালন করবে এবং তাদেরকে আদব-আখলাক শিক্ষা দিবে ও তাদের প্রতি দয়া করবে তাদেরকে আল্লাহ স্বাবলম্বী করা পর্যন্ত, তার জন্য আল্লাহ তাআলা জান্নাত ওয়াজিব করে দিবেন। কেউ দু'জনের ব্যাপারে প্রশ্ন করলে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, দু'জনের ব্যাপারেও তাই। এমনকি যদি সাহাবীগণ একজনের কথা জিজ্ঞেস করতেন তাহলে বলতেন - একজনের ব্যাপারেও। আল্লাহ যার চক্ষুযুগল নিয়ে যান তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব। (মিশকাত)

❑ "সে (পূর্ণ) মুমিন নয়, যে খেয়ে-দেয়ে পরিতৃপ্ত অথচ তার পাশে তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত।" (বায়ঃ) ❑ সমস্ত মাখলূক আল্লাহর পরিবারস্থ। যে আল্লাহর পরিবারস্থদের প্রতি মেহেরবানী ও সদ্ব্যবহার করে , সে আল্লাহর কাছে প্রিয়তম মাখলূক। (বায়ঃ)

❑ আমি কি তোমাদেরকে উত্তম দানের কথা বলব না? তা-হল, তোমার ঐ মেয়েকে দান করা যাকে তোমার কাছে ফেরত দেয়া হয়েছে (অর্থাৎ বিধবা) এবং তোমাকে ছাড়া তার খরচ বহনকারী আর কেউ নেই। (ইবনে মাজা)

❑ আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক বস্তুর প্রতি সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব যদি তোমরা কোন প্রানীকে হত্যা করতে চাও তাহলে সুন্দর নিয়মে হত্যা কর এবং যদি যবেহ করতে চাও তাহলে সুন্দর নিয়মে যবেহ কর। প্রত্যেকে তার ছুরি ধার দিয়ে নিবে এবং তার যবেহ্র পশুকে আরাম পৌছাবে।

❑ একবার মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানবীয় প্রয়োজন সারার জন্য একজন আনসারী সাহাবীর বাগানে প্রবেশ করলেন। সেখানে একটি উট দেখতে পেলেন। উটটি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখে কাঁদতে লাগল। তার দু'নয়ন অশ্রুসিক্ত হয়ে গেল। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উটটির কাছে এসে তার ঘাড়ে হাত বুলালে কান্না থেমে গেল। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন ঃ উটটি কার? একজন আনসারী যুবক বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ! উটটি আমার। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ "তুমি কেন পশুটির ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর না? আল্লাহ-ই তো তোমাকে এর মালিক বানিয়েছেন। সে আমার কাছে অভিযোগ করেছে যে, তুমি তাকে ক্ষুধার্ত রাখ অথচ খাটাও বেশী।" (আবু দাউদ)

- ❑ এক ব্যক্তি পথ চলছিল। পথিমধ্যে পিপাসায় কাতর হয়ে পড়ল। একটি কূপ খুজে পেল। উহাতে নেমে পানি পান করে উঠে এল। হঠাৎ দেখতে পেল, একটি কুকুর পিপাসার কারনে জিহ্বা বের করে ভেজা মাটি চাটছে। লোকটি ভাবল, কুকুরটির তীব্র পিপাসা লেগেছে যেরূপ আমার লেগেছিল। সে-কূপে নেমে চামড়ার মোজায় পানি ভর্তি করল। মোজাটি মুখ দ্বারা কামড়ে ধরে উপরে উঠে আসল এবং কুকুরকে পান করাল। এর বিনিময়ে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিলেন। নবীজীর পবিত্র যবানে এ-ঘটনাটি শুনে সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, পশুর মধ্যেও কি আমাদের জন্য সওয়াব রয়েছে ? "তদুত্তরে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, প্রত্যেক প্রাণীর ব্যাপারেই সওয়াব রয়েছে।"

আল্লাহ তাআলার রহমত অসীম। এ-জগতে তিনি যত মেহেরবানী করছেন, নিয়ামত দিচ্ছেন এবং সমগ্র সৃষ্টির পরস্পরের মাঝে যে পরিমান মায়া-মমতা ও প্রীতি-ভালবাসা রয়েছে, তা সব মিলে পরকালে মুমিনদের জন্য আল্লাহর রহমতের তুলনায় এক শতাংশ মাত্র। অতএব পরকালে তাঁর অসীম রহমত পেতে হলে, তাঁর সংসারে যত মাখলূক রয়েছে সকলের প্রতি যথা নিয়মে দয়াবান ও সদ্ব্যবহারী হতে হবে।

১৪ নং হাদীস ঃ

مَنْ نِيْحَ عَلَيْهِ يُعَذَّبُ بِمَانِيْحَ عَلَيْهِ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "যেই মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করে কাঁদা হয়, বিলাপের কারণে তাকে আযাব দেয়া হয়।" (বুখারী)

ব্যাখ্যা ঃ যার খান্দানে মৃত্যুর পর বিলাপ করে কাঁদার প্রথা রয়েছে, তার মৃত্যুর পর কেউ যেন বিলাপ করে না কাঁদে- এ অছিয়ত করে যাওয়া তার উপর ওয়াজিব। অছিয়ত করে না গেলে, বিলাপের কারণে তার আযাব হবে। নিষেধ করে যাওয়ার পরও যদি আত্মীয়-স্বজনরা তার কথা অমান্য করে, তখন সে নিরপরাধ বলে গণ্য হবে। কেননা, আল্লাহ তাআলা ন্যায় বিচারক। তিনি নিজেই বলেছেন ঃ لَاتَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى

"কেউ কারো পাপের বোঝা বহন করবে না।"

Scanned by CamScanner

স্বজনের মৃত্যুতে সরবে চিৎকার করে কান্না-কাটি করা নিষেধ। তবে নিরবে অশ্রু বিসর্জন দেয়া ভাল। মৃত ব্যক্তির কাফন, দাফনে তাড়াতাড়ি করা কর্তব্য। স্বামীর জন্য তার স্ত্রীর জানাযা বহন করা নিঃসন্দেহে জায়েয। এর খেলাফ যে কথা প্রচলিত আছে, তা সম্পূর্ণ ভুল। কবরস্থানে সূরা ইয়াসীন পাঠে মৃতের আযাব হ্রাস পায়। কবরকে সেজদা করা হারাম ও কবীরা গুনাহ এবং চুম্বন করা নিষেধ। এতে অন্তরে অন্ধকারের সৃষ্টি হয়। কবরস্থানে গিয়ে নিজ মৃত্যুকে স্মরণ করে কাঁদলে মন নরম ও পরিষ্কার হয়।

সংযোজনঃ মৃত্যু ও মৃতের প্রসংগ ঃ কতিপয় হাদীসঃ ❑ মৃত্যু মুমিনের জন্য উপঢৌকন স্বরূপ। (বায়ঃ) ❑ তোমরা বেশী স্মরণ কর, স্বাধ-আনন্দ বিনাশকারী মৃত্যুকে। (তিরঃ) ❑ তোমাদের কেউ যেন দুঃখ-কষ্টের কারনে মৃত্যু কামনা না করে। যদি অগত্যা করতে হয় তবে যেন এরূপ বলে - হে আল্লাহ! যতদিন জীবিত থাকা আমার জন্য মঙ্গলজনক ততদিন আমাকে জীবিত রাখুন। আর যখন মৃত্যু আমার জন্য মঙ্গলজনক হয় তখন আমাকে তুলে নিন। (বুঃ ও মুঃ)

❑ যে আল্লাহর সাক্ষাতকে ভালবাসে, আল্লাহও তার সাক্ষাতকে ভালবাসেন। আর যে আল্লাহর সাক্ষাতকে অপছন্দ করে, আল্লাহও তার সাক্ষাতকে অপছন্দ করেন।" (বুঃ ও মুঃ)

এখানে আল্লাহর সাক্ষাতকে ভাল বাসার অর্থ, মৃত্যু কামনা করা নয়; বরং আল্লাহর দর্শন ও অন্যান্য নিয়ামত লাভের অধীর আগ্রহ রাখা এবং দুনিয়ায় বসবাসের প্রতি মন অশান্ত ও অনাগ্রহী থাকা। ❑ তুমি দুনিয়ায় থাক ভিনদেশী কিংবা পথিকের ন্যায়। (বুঃ তিঃ)

❑ হযরত ইবনে উমর (রাযিঃ) নিজেকে বা অন্যকে লক্ষ্য করে বলতেন - সন্ধা হলে তুমি সকালের অপেক্ষা করো না এবং সকাল হলে সন্ধাকালের অপেক্ষা করো না। আর তোমার সুস্থকালকে রুগ্নকালের জন্য এবং জীবিতকালকে মৃতকালের জন্য সম্বল বানিয়ে নাও। (বুখারী)

❑ মৃত্যুর মাধ্যমে মুমিন বান্দা দুনিয়ার কষ্ট-ক্লেশ থেকে নিষ্কৃতি লাভ করে আল্লাহর রহমতের দিকে গমন করে আর অবাধ্য বান্দার মৃত্যুতে নিষ্কৃতি লাভ করে সকল মানুষ, সকল শহর, বৃক্ষ রাজি ও জীব-জন্তু। (বুখারী) ❑ ঈমানদার কপাল ঘর্মাক্ত অবস্থায় মৃত্যুবরন করে থাকে। (তিরঃ নাঃ) ❑ আকস্মিক মৃত্যু কাফেরের জন্য আল্লাহর গযব আর মুমিনের জন্য রহমত।" (মিশঃ)

যেহেতু কাফেরকে তওবা এবং নেক আমল করে পরকালের জন্য প্রস্তুত হতে দেয়া হয়নি, তাই কাফের অবস্থায় মৃত্যুকে তার জন্য আল্লাহর গযব বা অসন্তুষ্টির লক্ষন বলা হয়েছে।

❑ মরনোন্মুখ এক যুবককে দেখতে গিয়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, নিজেকে তুমি কেমন পাচ্ছ? উত্তরে সে বলল, ইয়া

রাসূলাল্লাহ! আমি আল্লাহ্‌র রহমতের আশা করছি আবার নিজ গুনাহের ব্যাপারে ভয়ও করছি। তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, এহেন মূহুর্তে যে বান্দার অন্তরে ভয় এবং আশার সমাবেশ ঘটবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাকে তার আশার বস্তু দান করবেন এবং ভয়ের বস্তু থেকে নিরাপদে রাখবেন। (তিরঃ)

❑ যে ব্যক্তি (শোক-দুঃখ প্রকাশার্থে) মুখ ও কপাল চাপড়ায়, পোশাক ছিড়ে ফেলে এবং জাহেলী প্রথানুযায়ী দোআ করে, সে আমার উম্মতের অন্তর্ভূক্ত নয়। (বুখারী)

❑ হযরত উম্মে আতিয়া (রাযিঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছ থেকে অংগীকার নিয়েছেন যে, আমরা কখনো উচ্চস্বরে কেঁদে শোক প্রকাশ করবোনা। (বুখারী)

❑ দুটি কাজ কুফরীর পর্যায়ভুক্ত। কারো বংশ নিয়ে টিট্‌কারী দেয়া এবং মৃত ব্যক্তির জন্য উচ্চস্বরে কান্নাকাটি করা। (মুসলিম)

❑ দুটি নির্বুদ্ধিতাপূর্ণ ও পাপজনক শব্দ থেকে আমাকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। একটি গান-বাজনার শব্দ, অপরটি বিপদের সময় মুখ চাপড়ানো ও শয়তানের মত চিৎকার করার শব্দ। (কিঃ কাঃ)

❑ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাঁর মুমুর্ষ পুত্র ইবরাহীমের (রাযিঃ) কাছে গেলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল। তা দেখে আব্দুর রহমান বিন আওফ বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আপনিও কাঁদছেন ! রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ এটা স্নেহ-মমতার প্রকাশ মাত্র। অতঃপর বললেন ঃ চোখ অশ্রু বর্ষন করে ও হৃদয় মর্মাহত হয়। কিন্তু আল্লাহ যাতে সন্তুষ্ট তাছাড়া আমরা আর কিছু মুখ দিয়ে উচ্চারণ করতে পারিনা। হে ইবরাহীম ! তোমার বিচ্ছেদে আমরা ব্যাথিত । (বুঃ)

❑ মুমিন বান্দার উপর যে বিপদই আসুক না কেন, এমন কি যদি তার পায়ে একটা কাঁটা ফোটে, তবে তা দ্বারা আল্লাহ তার গুনাহ মুছে দেন। (মুসলিম)

❑ কোন বান্দার সন্তান মারা গেলে আল্লাহ ফেরেশ্‌তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তোমরা আমার বান্দার সন্তানের প্রান সংহার করার সময় সে কি বলেছে? ফেরেশতারা বলেনঃ সে আপনার প্রশংসা করেছে এবং আপনার কাছে তার ফিরে যাওয়ার কথা স্মরণ করেছে তখন আল্লাহ বলেনঃ আমার বান্দার জন্য জান্নাতে একটা বাড়ি তৈরী কর এবং তার নাম রাখ 'বায়তুল হাম্‌দ' (প্রশংসার বাড়ী)। (তিরঃ)

❑ হাদীসে কুদসীতে আছে, আল্লাহ বলেন ঃ যখন আমার বান্দার কোন প্রিয়জনের মৃত্যু হয় এবং সে তাতে ধৈর্য ও সংযম অবলম্বন করে, তখন জান্নাত ছাড়া তাকে দেয়ার মত আর কোন প্রতিদান আমার কাছে থাকে না। (বুখারী)

❑ আল্লাহর ফয়সালা অম্লান বদনে মেনে নেয়া আদম সন্তানের জন্য সৌভাগ্যজনক আর তাতে ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট হওয়া দুর্ভাগ্যজনক। (কিঃ কাঃ)

❑ ধৈর্যের চেয়ে উত্তম ও প্রশস্ত কোন জিনিস কাউকে দেয়া হয়নি। (কিঃ কাঃ)

❑ এক সাহাবীকে দরবারে অনুপস্থিত দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কথা জিজ্ঞাসা করলেন। এক ব্যক্তি বলল ঃ ইয়া রাসুলাল্লাহ ! তার ছেলে মারা গেছে। তিনি তার সাক্ষাত করে তার প্রতি সমবেদনা জানালেন। অতঃপর বললেন ঃ শোনো, তোমার ছেলে সারা জীবন তোমার কাছে থাকুক এটা তোমার বেশী পছন্দনীয়, না সে তোমার আগে গিয়ে জান্নাতের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকুক এবং তুমি মারা গেলে সে তোমার জন্য জান্নাতের দরজা খুলে দিক-এটা বেশী পছন্দনীয় ? সাহাবী বললেন ঃ সে আমার আগে জান্নাতে গিয়ে আমার জন্য দরজা খুলে দিক এটাই বেশী পছন্দনীয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তাহলে তোমার জন্য সেটিই নির্ধারিত রইল। সাহাবী জিজ্ঞাসা করলেন ঃ এটা কি শুধু আমার জন্য ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ না, সকল মুসলমানের জন্য। (আহমাদ, নাসায়ী)

❑ যার দুটো নাবালেগ সন্তান মারা যায়, সে জান্নাতে যাবে। (তিরমিযী)

❑ নাবালেগ মৃত সন্তানেরা জান্নাতের সর্বত্র ঘুরে বেড়াবে। কিয়ামতের মাঠে তারা তাদের পিতামাতাকে পেয়ে তাদেরকে ঝাপটে ধরবে এবং তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ না করিয়ে ছাড়বে না। (মুসলিম)

❑ কোন বান্দার উপর যখনই কোন বিপদ-মুসীবত আসে, তখন তা হয়তো তাকে এমন কোন গুনাহ থেকে পবিত্র করার জন্য আসে, যা ঐ বিপদ ছাড়া আর কোনভাবে ক্ষমা করবেন না বলে আল্লাহ তাআলা স্থীর করেছেন, নচেৎ তাকে এমন কোন উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করার জন্য আসে, যার জন্য আল্লাহ আর কোন বিকল্প রাখেননি। (কিঃ কাঃ)

❑ হযরত উম্মে সালামা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি বিপদ-মুসীবতে পড়ে "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন" বলবে এবং দোআ করবে যে, হে আল্লাহ ! আমাকে এই মুসীবতে আশ্রয় দাও এবং আমাকে এর চেয়ে উত্তম বদলা দান কর, আল্লাহ তাকে উপযুক্ত পুরস্কার ও উত্তম বদলা দিবেন। হযরত উম্মে সালামা বলেন ঃ এরপর আমার স্বামী আবু সালামা মারা গেলে আমি অনুরূপ দোআ করেছিলাম। ফলে, আল্লাহ আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ন্যায় স্বামী দান করলেন। (মুসলিম)

❑ কেহ কোন বিপন্নের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করলে ঐ বিপন্ন ব্যক্তি ধৈর্য্য ধারণ করে যে সওয়াব পাবে, সেও তদ্রূপ সওয়াব পাবে। (তিরমিযী)

❑ কেহ সন্তান হারা মাকে সমবেদনা জ্ঞাপন ও সান্তনা দান করলে, আল্লাহ তাকে জান্নাতের মূল্যবান পোষাক পরাবেন। (তিরমিযী)

উল্লেখ্য যে, শোক ও সমবেদনা প্রকাশ, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে সান্তনা দান, ধৈর্য ধারনের উপদেশ দান কারুর শোক-দুঃখ ও বিপদের অনুভূতিকে হাল্‌কা করার উদ্দেশ্যে

হয়ে থাকে। এটি মুস্তাহাব। সমবেদনা প্রকাশ ও সান্তনা দানের সর্বোত্তম ভাষা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিম্নোক্ত হাদীস থেকে জানা যায়। বুখারী ও মুসলিমে বর্নিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এক কন্যা তাঁর কাছে এই মর্মে খবর পাঠালো যে, তার এক ছেলে মৃত্যুর মুখোমুখি। তিনি দূতকে বললেন ঃ যাও, ওকে বল যে, আল্লাহ যা নেন, তা তাঁরই জিনিস, আর যা দেন, তাও তাঁরই জিনিস। সব কিছুই বান্দার কাছে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য রয়েছে। তাকে বল, সে যেন ধৈর্য ধারণ ও সংযম অবলম্বন করে।

কতিপয় মাসাইল ঃ

❑ যেহেতু নিরবে কাঁদা অন্যান্য হাদীস দ্বারা প্রমানিত, তাই এখানে নিষিদ্ধ কাঁদার অর্থ হলো, জোরে এবং চিৎকার করে কাঁদা অথবা মৃতব্যক্তির অতিরঞ্জিত গুন বর্ণনা করে কাঁদা অথবা তক্‌দীরের উপর অসন্তুষ্ট হয়ে কিংবা আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে অন্য কোন বিরূপ মন্তব্য করে কাঁদা। এক কথায় বিলাপ করে অধৈর্য্য প্রকাশ করে কাঁদা নিষেধ। পক্ষান্তরে, নিরবে (শরীঅতের সীমালংঘন না করে) কাঁদলে দোষ নেই।

❑ কবরের মাটি জমাইবার উদ্দেশ্যে পানি ছিঁটানো ভাল কাজ। একে জরুরী মনে করা কিংবা স্বয়ংসম্পূর্ণ সওয়াবের কাজ মনে করা গুনাহ।

❑ কবরের সৌন্দর্যের জন্য যেকোনরূপ দেয়াল ইত্যাদি নির্মান কার্য হারাম এবং মজবুতির উদ্দেশ্যে করা মাকরূহে তাহরীমী। তবে পুরা কবরস্থানের চারপাশে সীমা নির্ধারণ এবং হিফাযতের উদ্দেশ্যে দেয়াল নির্মান করা জায়েয। কবরের নিশানা বাকী রাখার জন্য মাথার দিকে পাথর বা ইট রেখে দেয়াই যথেষ্ট। মৃত ব্যক্তি কোন বিশিষ্ট মানব হলে প্রয়োজনের তাগিদে চিহ্ন স্বরূপ নাম এবং মৃত্যু তারিখ লিখা যেতে পারে। তবে লিখিত বস্তুটি মাথার সামান্য দূরে হওয়া ভাল। আয়াত, কবিতা কিংবা মৃতের প্রশংসা লিখা নাজায়েয। (আহসানুল ফাতাওয়া-৪ র্থ খন্ড)

❑ মৃত ব্যক্তিকে মুসলমানদের সাধারন কবরস্থানে দাফন করা সুন্নত। কোন বিশেষ স্থানে দাফন করা মাকরূহ। কারণ, ইহা নবীগনের জন্য খাছ বিষয়। (আঃ ফাঃ) ❑ মৃত ব্যক্তির তাযীমার্থে দাঁড়িয়ে যাওয়া জায়েয নেই। (আঃ ফাঃ ৪ র্থ খন্ড)

❑ মৃত ব্যক্তিকে কোন অপরাগতা ব্যতীত অন্য শহরে বা অন্য এলাকায় স্থানান্তর করা মাকরূহে তাহরীমী। যেখানে মারা যায় সেখানে দাফন করা উচিত। (আঃ ফাঃ)

❑ মানুষ বেশী হওয়ার আশায় নামাযে জানাযা দেরী করা মাকরূহ। এমনকি ওয়াক্তিয়া নামাযের জমাতের অপেক্ষা করাও মাকরূহ। কারণ, নামাযে জানাযায় জলদী করা এত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, যে সব ওয়াক্তে নামায পড়া মাকরূহ, সে সব ওয়াক্তে জানাযা প্রস্তুত হয়ে গেলে দেরী না করে নামাযে জানাযা আদায় করে নেয়ার হুকুম রয়েছে।

❑ নামাযে জানাযায় অংশগ্রহণের জন্য প্রচলিত নিয়মে প্রচার ও আহ্বান করা মাকরূহ।

❑ স্ত্রীর জন্য স্বামীর লাশকে দেখা, ছোঁয়া, গোসল দেয়া, বহন করা, কবরে নামানো ইত্যাদি জায়েয এবং স্বামীর জন্য স্ত্রীর লাশকে কোন আবরনী ছাড়া ছোঁয়া ও গোসল দেয়া নাজায়েয। আর বাকী কাজগুলো জায়েয।

❑ মৃত ব্যক্তির চেহারা দেখার মধ্যে সওয়াব মনে করা গুনাহ। তাছাড়া এতে দাফনকার্য বিলম্বিত হয় এবং ছবি তুলে নেয়ার সুযোগ হয়। এ গুলো শরীঅতে নাজায়েয।

❑ কুরআনের আয়াত এবং কালিমা শরীফ লিখিত চাদর দ্বারা লাশ অথবা খাট ঢাকা ভিত্তিহীন এবং বেয়াদবী। অতএব তা বর্জনীয়।

❑ মৃত ব্যক্তির মাথা থেকে পা পর্যন্ত গোটা দেহ কবরে ডান কাতে শোয়ানো সুন্নত। চিৎ করে শুইয়ে শুধু চেহারা কিব্‌লার দিকে করে দেয়ার প্রথা ঠিক নয়।

❑ দাফনের পর কবরপার্শ্বে দাঁড়িয়ে হাত তুলে দোআ করার অনুমতি শরীঅতে রয়েছে। এমনিভাবে যে কোন মৃত ব্যক্তিকে ঈছালে সওয়াবের জন্য তার কবরপার্শ্বে হাত তুলে দোআ করা জায়েয আছে। তবে কবরের দিকে মুখ করে নয়; বরং কিব্‌লার দিকে মুখ করে। যাতে কবরবাসীর কাছে কিছু চাওয়ার ধারনা কারো মনে সৃষ্টি না হয়। ❑ গোসল দেয়ার পূর্বে মৃত ব্যক্তির কাছে কুরআন তিলাওয়াত করা নিষেধ। গোসল দেয়ার পূর্বে মাইয়েতকে ঢেকে দিয়ে তার পার্শ্বে কুরআন তিলাওয়াত করাতে দোষ নেই। গোসল দেয়ার পর সর্বাবস্থায় মাইয়েতের কাছে কুরআন তিলাওয়াত করা জায়েয-মাকরূহ নয়।

১৫ নং হাদীস

اِذَا مَاتَ الْاِنْسَانُ اِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهٗ اِلاَّ مِنْ ثَلٰثَةٍ اِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ اَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهٖ اَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهٗ –

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ"মানুষ মরে গেলে তার সকল আমল বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তিনটি আমলের সওয়াব জারী থাকে। ছদকায়ে জারিয়া, দ্বীনী ইল্‌ম-যা মানুষের উপকারে আসে আর নেক সন্তান যে তার জন্য দোআ করে। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ জীবিত অবস্থায় মানুষ যে সব নেক আমল নিজে করতে পারত, মৃত্যুর পর অক্ষম হওয়ার কারণে তা করা আর সম্ভব হয় না। তবে সদকায়ে জারিয়া, ঐ ইল্‌ম-যা দ্বারা মানুষ উপকৃত হয় এবং নেক সন্তানের মাধ্যমে মৃত্যুর পরও সওয়াব জারী থাকে। মসজিদ, মাদ্রাসা, পুল, মুছাফিরখানা ও মেহমানখানা নির্মান এবং পুকুর খনন

ইত্যাদিকে সদকায়ে জারিয়া বলা হয়, যা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তৈরী করা হয় এবং আল্লাহর মখলুক তা থেকে উপকৃত হয়।

সংযোজন ঃ আলোচ্য হাদীসটি ঈছালে সওয়াব প্রসংগে বিবৃত হয়েছে। এতে তিনটি বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে। প্রথমোক্ত দুটি বিষয় মৃত ব্যক্তির জীবদ্দশায় নিজের করনীয় কাজ এবং তৃতীয়টি যদিও প্রত্যক্ষভাবে মৃত ব্যক্তির জীবনকালের কাজ নয়, কিন্তু পরোক্ষভাবে তা-মৃত ব্যক্তির জীবনকালেরই আমল বলা যায়। কেননা; ঈমানদার নেক্‌কার সন্তান-সন্ততি রেখে যাওয়ার বদৌলতেই মৃত্যুর পর সে তাদের দোআ লাভ করতে পারে। অতএব বুদ্ধিমানের কাজ হলো, নিজ সন্তান-সন্ততিকে দ্বীনদার মুত্তাকীদের সান্নিধ্যে লালন -পালন করা এবং দ্বীনি ইল্‌ম ও আমল শিক্ষা দিয়ে যাওয়া, যাতে তারা দ্বীনদার-নেক্‌কার হতে পারে।

আলোচ্য হাদীসটির মর্ম প্রসংগে কতিপয় হাদীস ঃ ⊙ মানুষের মৃত্যুর পর রেখে যাওয়া বস্তুর মধ্যে উত্তম বস্তু তিনটি। নেক সন্তান-যে তার জন্য দোআ করবে, সদকায়ে জারিয়া-যার সওয়াব সে পাবে, ইল্‌ম-যার উপর তার পরবর্তীকালে আমল করা হবে। (ইবনে মাজা)

⊙ মুমিন ব্যক্তি মৃত্যুর পর যেসব নেক আমলের সওয়াব লাভ করতে পারে, তম্মধ্যে কয়েকটি এইঃ ইল্‌ম-যা শিক্ষা দিয়ে ও প্রচার করে গেল, সন্তান-যাকে রেখে গেল, কুরআন শরীফ-যা মীরাছ বানিয়ে গেল, মসজিদ - যা তৈরী করে গেল, মুসাফির খানা - যা প্রতিষ্ঠা করে গেল, নদীখাল-যা খনন করে প্রবাহিত করে গেল, সদকা-যা সুস্থাবস্থায় স্বীয় মাল থেকে দান করে গেল। (ইঃ মাঃ)

⊙ মুসলমান ব্যক্তি কোন বিষয়ের ইল্‌ম শিক্ষা করে আরেক মুসলমান ভাইকে তা শিক্ষা দেয়া উত্তম সদ্‌কা বা দান। (ইঃ মাঃ)

⊙ কেউ কোন বিষয়ে ইল্‌ম শিক্ষা দিলে, তার উপর আমলকারীর সম পরিমান সওয়াব তাকে দেয়া হবে কিন্তু আমলকারীর সওয়াব কমানো হবে না।

উপকারী ইল্‌ম এবং অনুপকারী ইল্‌ম প্রসংগে কতিপয় হাদীস ঃ ⊙ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়াসাল্লাম বলেনঃ হে আল্লাহ! আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি অনুপকারী ইল্‌ম, অগ্রাহ্য দোআ, খোদাভীতি শুন্য অন্তর এবং অতৃপ্ত মন থেকে। (ইঃ মাঃ)

⊙ যে ইল্‌ম দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা হয় - এমন ইল্‌ম (অর্থাৎ দ্বীনি ইল্‌ম) যে ব্যক্তি জাগতিক স্বার্থে শিক্ষা করল, পরকালে সে বেহেশ্‌তের ঘ্রানও পাবে না। (ইঃ মাঃ)

⊙ যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে ইল্‌ম অর্জন করবে সে যেন তার থাকার জায়গা জাহান্নামের মধ্যে করে নেয়। (ইঃ মাঃ)

◉ মুর্খদের সংগে বিতর্ক, আলেমদের সংগে গর্ব অথবা নিজের দিকে মানুষকে আকৃষ্ট করার জন্য যে ব্যক্তি ইল্‌ম শিখবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

◉ আমার উম্মতের কিছু সংখ্যক লোক দ্বীনি ইল্‌ম শিখবে, কুরআন পড়বে এবং বলবে যে, আমরা আমীর-উমারার নিকট গিয়ে তাদের পার্থীব বিষয় সম্পদ থেকে ফায়দা হাসিল করব অথচ তাদের (দুনিয়াদারির প্রভাব) থেকে আমরা আমাদের দ্বীনকে বাঁচিয়ে রাখব। কিন্তু তা আদৌ সম্ভব নয়। যেমন কাঁটাদার বৃক্ষ হতে কাঁটা ছাড়া কিছু সংগ্রহ করা যায় না, তদ্রুপ তাদের নিকট থেকে (গুনাহ ছাড়া) কিছু সংগ্রহ করা যায় না। (ইঃ মাঃ)

◉ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বলেছেন ঃ যদি আলেমগন ইল্‌মের হিফাযত করত এবং উপযুক্ত লোকদের মাঝে তা বিতরণ করত তাহলে তাঁরা ইল্‌মের কারণে সমকালীন লোকদের উপর নেতৃত্ব করত। কিন্তু তারা তা ব্যয় করেছে দুনিয়াদারদের উদ্দেশ্যে, তাদের থেকে পার্থিব স্বার্থ হাসিলের জন্য। তাই তাঁরা তাদের নিকট হেয় প্রতিপন্ন হয়েছে। আমি নবীজি (সাঃ) কে বলতে শুনেছি যে, যেই ব্যক্তি তার সকল চিন্তাকে এক চিন্তা অর্থাৎ আখিরাতের চিন্তা বানাবে, আল্লাহ তার পার্থীব সকল চিন্তা সেরে দিবেন। পক্ষান্তরে, যে পার্থীব চিন্তা সমূহে জড়িয়ে যাবে, আল্লাহ তার ব্যাপারে কোন পরোয়া করবেন না যে, সে কোন প্রান্তরে হালাক হবে। (ইবনে মাজা)

ঈছালে সওয়াব প্রসংগ ঃ ঈছালে সওয়াবের হাকীকত, গুরুত্ব ও সুন্নত ত্বরীকা ঃ

ঈছালে সওয়াবের মর্মার্থ এই যে, কেহ কোন নেক আমল করল এবং তা - আল্লাহ্‌র দরবারে কবুল হয়ে গেলে সে-যেই সওয়াব পাবে সেই ব্যাপারে এই নিয়ত করা যে, আমার এই আমলের সওয়াবটুকু অমুক জীবিত কিংবা মৃতকে দান করা গেল। অথবা আল্লাহর কাছে এই দোআ করা যে, হে আল্লাহ আমার এই আমলটুকু কবুল করে ইহার সওয়াবটুকু অমুককে দান করুন।

এ থেকে প্রথমতঃ বুঝা গেল যে, এমন আমলের ঈছালে সওয়াব করা যেতে পারে, যার মধ্যে আমলকারী নিজে সওয়াব লাভের আশা করতে পারে। যদি নিজেই সওয়াব না পায়, অপরকে দান করবে কি ? তাই যেহেতু শরীয়ত ও সুন্নতের পরিপন্থী নেক আমলের সওয়াব থেকে আমলকারী নিজেই মাহরূম থাকে, তাই এরূপ আমলের দ্বারা ঈছালে সওয়াব করা মনের অভিলাষ মাত্র।

দ্বিতীয়তঃ বুঝা গেল যে, জীবিত এবং মৃত-উভয়ের জন্যেই ঈছালে সওয়াব হতে পারে। দু'রাক্‌আত নামায পড়ে এর সওয়াব স্বীয় মাতা-পিতা কিংবা পীর মুর্শিদ কে যেমন তাদের মৃত্যুর পর দান করা যেতে পারে, তেমনি তাদের জীবদ্দশায়ও দান করা যেতে পারে। তবে সাধারণভাবে মৃতের জন্য ঈছালে সওয়াবের প্রচলন হওয়ার কারণ এই যে, জীবিতদের সওয়াব লাভের জন্য তাদের স্বীয় আমলের ধারা চালু রয়েছে, কিন্তু মৃত্যুর পর মানুষের সওয়াব লাভের জন্য যেহেতু সদকায়ে জারিয়া ব্যতীত নিজস্ব সকল আমলের ধারা বন্ধ হয়ে যায়, তাই সাধারণ ভাবে মৃতদেরকেই ঈছালে সওয়াবের

মুহ্তাজ মনে করা হয়। এ - ছাড়া মৃতদের জন্য জীবিতদের পক্ষ থেকে যদি কোন উপহার হতে পারে, তা-হল একমাত্র ঈছালে সওয়াব। হাদীস শরীফে আছে ঃ কবরে মৃতদের দৃষ্টান্ত হল - যেমন কোন ব্যক্তি নদীতে ডুবছে আর লোকজনকে সাহায্যের জন্য আহবান করছে, তদ্রুপ মৃতব্যক্তি স্বীয় মাতা-পিতা, ভাই-বোন এবং দোস্ত-আহ্বাবের কাছ থেকে দোআ পাওয়ার অপেক্ষায় থাকছে। যখন কোন দোআ তার কাছে পৌঁছে তখন সে উহাকে দুনিয়া এবং দুনিয়ার সকল বস্তু অপেক্ষা অধিক প্রিয় মনে করে এবং আল্লাহ তাআলা জগতবাসীদের দোআর উসীলায় কবরবাসীদেরকে পর্বত সমান রহমত দান করেন। আর মৃতদের জন্য জীবিতদের উপহার হল ইস্তেগ্ফার (মিশকাত ২০৬) অন্য একটি হাদীসে আছেঃ আল্লাহ তাআলা জান্নাতের মধ্যে নেকবান্দার মর্যাদা বাড়িয়ে দিবেন। তখন সে আরজ করবে, ওগো আমার মা'বুদ! আমার এই মর্যাদা কিভাবে লাভ হল? তিনি বলবেন, তোমার জন্য তোমার সন্তানদের ইস্তিগফারের মাধ্যমে। (মিশঃ ২০৬)

ইমাম সুফিয়ান ছওরী (রহঃ) বলতেন ঃ জীবিতরা পানাহারের যতটা মুহ্তাজ মৃতরা দোআর ততোধিক মুহ্তাজ।

এককথায়, চিরবিদায়ী আপনজনদের সাহায্য করার একটি মাত্র পন্থাই বিদ্যমান - তা হল ঈছালে সওয়াব করা। ইহাই আমাদের পক্ষ থেকে তাদের জন্য তোহ্ফা-উপঢৌকন এবং ইহাই মহব্বত ও সুসম্পর্কের দাবী।

তৃতীয়ত ঃ বুঝা গেল যে, যেই আমলের সওয়াব কাউকে দান করতে ইচ্ছা হয়, হয়ত সেই আমলটি করার পূর্বে বা পরে নিয়ত করে নিবে অথবা আমলটি করার পর দোআ করে নিবে যে, হে আল্লাহ! আমার এই আমলটি কবুল করে এর সওয়াবটুকু অমুককে দান করুন। দোআ সরবে করার প্রয়োজন নেই - নিরবে হলেই চলবে।

ঈছালে সওয়াব প্রসংগে কতিপয় মাসআলা ঃ ১। ঈছালে সওয়াব নফল ইবাদাতের হবে। ফরয ইবাদাতের ঈছালে সওয়াবের ক্ষেত্রে মতভেদ রয়েছে।

২। সর্ব সম্মতিক্রমে যে কোন নফল ইবাদতের ঈছালে সওয়াব করা জায়েয। যেমন ঃ দোআ ও ইস্তিগফার, যিকির ও তাস্বীহ, দরুদ শরীফ, তিলাওয়াতে কুরআন মজীদ, নফল নামায, নফল রোযা, নফল সদকা, নফল হজ্ব ও নফল কুরবানী ইত্যাদি।

৩। সরাসরি আমল মৃত ব্যক্তির নিকট পৌঁছেনা। পৌঁছে আমলের সেই সওয়াব যা আমলকারী পায়। এতে আমলকারীর সওয়াব বিন্দুমাত্রও কমবে না; বরং তাঁর পূর্ণ সওয়াব ঠিক রেখে তার সমপরিমান সওয়াব মৃত ব্যক্তিকে দান করা হবে।

৪। যত বেশী পারা যায় - দরুদ শরীফ, কালেমা শরীফ, তাসবীহ ও কুরআন মজীদ পাঠ করে এবং নফল নামায, রোযা, হজ্ব, কুরবানী ও সদকা খায়রাতের মাধ্যমে ঈছালে সওয়াব করবে। দৈনিক তিনবার করে দরূদ শরীফ, সুরা ফাতিহা ও সুরা ইখ্লাস পড়ে ঈছালে সওয়াব করা হলে আমাদের উপর থেকে মৃতদের হক কিছুটা হলেও আদায় হতে

পারে। এর জন্য সময় বা দিন-তারিখ যা শরীয়ত নির্ধারণ করেনি - তা নির্ধারণ করা, খাবার পাকানোর গুরুত্বারোপ করা, কিংবা মোল্লা-মুন্শী ডেকে আনা জরুরী মনে করা ঠিক নয় ; বরং যে কোন সময় যা সহজে সম্ভব হয় রোযা, নামায ও সদকা - খয়রাত ইত্যাদি মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে আদায় করে নিজেই ঈছালে সওয়াব করতে পারে। ইহাই ঈছালে সওয়াবের ত্বরীকা যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বাতলিয়েছেন এবং যার উপর আমল করে গেছেন আহলে সুন্নতের উলামায়ে কিরাম এবং সলফে সালেহীন (রহঃ)।

কুরআন শিক্ষা দিয়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েয কিন্তু; ঈছালে সওয়াব উপলক্ষে খত্মে কুরআনের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা সর্বসম্মতভাবে না জায়েয ঃ

কুরআন শিখিয়ে বিনিময় বা পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েয কি-না এ সম্পর্কে ফকীহ আলেমগণের মতভেদ রয়েছে। ইমাম মালেক, শাফেঈ ও আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) জায়েয বলে মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু ইমাম আযম আবু হানীফা (রহঃ) প্রমুখ কয়েকজন ইমাম নাজায়েয বলেছেন। কেননা, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনকে জীবিকা উপার্জনের মাধ্যম বানাতে নিষেধ করেছেন।

অবশ্য পরবর্তী হানাফী ইমামগণ বিশেষভাবে পর্যবেক্ষন করে দেখলেন যে, পূর্বে কুরআনের শিক্ষক মন্ডলীর জীবন যাপনের ব্যয়ভার ইসলামী বায়তুলমাল বহন করত, কিন্তু এখন ইসলামী শাসন ব্যবস্থার অনুপস্থিতিতে তা হচ্ছে না। ফলে, যদি তারা জীবিকার অন্বেষনে চাকরী-বাকরী, ব্যবসা-বানিজ্য বা অন্য কোন পেশায় আত্ম নিয়োগ করেন, তবে কুরআন শিক্ষার ধারা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যাবে। এ জন্য কুরআন শিক্ষার বিনিময়ে, প্রয়োজনানুসারে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েয সাব্যস্ত করেছেন। অনুরূপভাবে ইমামত, আযান, হাদীস ও ফিকাহ শিক্ষা দান প্রভৃতি যে সব কাজের উপর দ্বীন ও শরীঅতের স্থায়িত্ব ও অস্তিত্ব নির্ভরশীল, সেগুলোকে কুরআন শিক্ষাদানের সাথে সংযুক্ত করে প্রয়োজন মত এগুলোর বিনিময়েও পারিশ্রমিক গ্রহণ করার অনুমতি দিয়েছেন।

আল্লামা শামী (রহঃ) রাদ্দুল মুহ্তার এবং শিফাউল আলীল নামক গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে এবং অকাট্য দলীলাদীসহ একথা প্রমান করেছেন যে, কুরআন শিক্ষাদান বা অনুরূপ অন্যান্য কাজের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণের যে অনুমতি পরবর্তী কালের ফকীহগণ দিয়েছেন, তা - এমন এক ধর্মীয় প্রয়োজনের ভিত্তিতে দিয়েছেন - যাতে বিচ্যুতি দেখা দিলে গোটা শরীঅতের বিধান ব্যবস্থার মূলে আঘাত আসবে। সুতরাং এ অনুমতি এ সব প্রয়োজনের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ রাখা একান্ত আবশ্যক। তাই পারিশ্রমিকের বিনিময়ে মৃতদের ঈছালে সওয়াবের উদ্দেশ্যে কুরআন খতম করানো বা অন্য কোন দোআ-কালাম ও অযীফা পড়ানো হারাম। কারণ, এর উপর কোন ধর্মীয়

মৌলিক প্রয়োজন নির্ভরশীল নয়। অতএব পারিশ্রমিকের বিনিময়ে ঈছালে সওয়াবের উদ্দেশ্যে কুরআন ও দোআ-কালাম যে পড়বে এবং যে পড়াবে - উভয়ই গুনাহ্গার হবে। বস্তুতঃ যে পড়েছে সে যখন কোন সওয়াব পাচ্ছে না, তখন মৃতের আত্মার প্রতি সে কি পৌঁছাবে ?

কবরের পাশে কুরআন পড়ানো বা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কুরআন খতম করানোর রীতি সাহাবা, তাবেঈন এবং প্রথম যুগের উম্মতগণের দ্বারা কোথাও বর্নিত বা প্রমানিত নেই। সুতরাং এ-গুলো নিঃসন্দেহে বিদ্আত। (তাঃ মাঃ কুঃ, মোছ লেম রত্ন হার)

আলেম ও তালেবে এলেমগনের খেদমত করা মুসলমানদের কর্তব্য ঃ

আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ "(দানসমূহ) ঐ সকল অভাবগ্রস্ত লোকদের প্রকৃত হক বা প্রাপ্য, যারা আল্লাহর পথে আটক হয়ে গেছে। (যদ্দরুন জীবিকার খোঁজে) তারা দেশে ঘুরে বেড়াতে সক্ষম হচ্ছে না। সওয়াল বা দান চাওয়া থেকে বিরত থাকার কারণে অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে অভাবমুক্ত মনে করে থাকে। তুমি তাদেরকে লক্ষন দেখে চিনতে পারবে। তারা মানুষের কাছে নাছোড় হয়ে সওয়াল করে না। (তাদের খেদমতের জন্য) যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় করবে নিশ্চয় আল্লাহ তা ভালভাবে জানেন। (বাকারা২৭৩) অর্থাৎ তারা ধর্মীয় কাজে নিয়োজিত থাকার কারণে জীবিকা অর্জনের উদ্দেশ্যে অন্য কোন কাজ করতে পারে না। তাদের লক্ষণ ও গতি-প্রকৃতির দ্বারা বুঝা যাবে তারা অভাবগ্রস্ত। কেননা, অভাব-অনটনের কারণে চেহারা ও দেহে এক প্রকার দুর্বলতা অবশ্যই বিরাজ করে থাকে। কিন্তু, তারা মোটেই সওয়াল করে না। যদ্দরুন লোকেরা অভাবমুক্ত মনে করে থাকে। অতএব, প্রকৃত পক্ষে তাদেরকে দান করার সওয়াব বেশী হবে।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সময়ে আসহাবে সুফ্ফা নামে (দ্বীনী শিক্ষা ও জিহাদে অংশ গ্রহণের উদ্দেশ্যে রুযী-রোজগার ছেড়ে) মসজিদে নব্বীর চবুতরায় অবস্থানরত সাহাবীগণ যেভাবে এ আয়াতের লক্ষ্যবস্তু ছিলেন, তেমনিভাবে বর্তমান সময়ে যারা ইলমেদ্বীনের চর্চা ইত্যাদি দ্বীনী কাজে সদা নিয়োজিত, তারাও এ-আয়াতের প্রয়োগক্ষেত্ররূপে গণ্য হবেন। তাই ইল্‌মচর্চাকারীদের জন্য ব্যয় করার সওয়াব ও বেশী হবে। কেননা, উক্ত আয়াতে আল্লাহ পাক ঘোষনা করেছেন যে, তাদের খেদমতে তোমরা যা ব্যয় করবে, সে ব্যাপারে আমি সবিশেষ অবহিত আছি।

মসজিদের ইমাম, মুয়ায্যিন ও খালেস দ্বীনী শিক্ষার কাজে নিয়োজিত আলেমগণ যেহেতু ইসলাম ও মুসলমানদের কাজেই আবদ্ধ থাকেন, তাই তাঁদের প্রয়োজন মেটানোর দায়িত্ব ও কর্তব্য কার হবে ? তা মুসলমানরা সহজেই অনুমান করতে পারেন। যদি আলেমগণ ইমামত, আযান ও দ্বীনী শিক্ষার কাজ বন্ধ করে জীবিকার অন্বেষনে লেগে যান, তাহলে ঈমান ও ইসলাম টিকে থাকবেনা। ফলে, মানব

— ৫

জাতি আল্লাহ্ তাআলার পরিচয় লাভ থেকে বঞ্চিত হয়ে ইহ-পরকালীন ধ্বংস গহবরে নিপতিত হবে। তাইতো ফকীহ্ আলেমগণ ইমামত, আযান ও দ্বীনী শিক্ষা দানের বিনিময় গ্রহণ করা জায়েয বলে মত ব্যক্ত করেছেন। যদি মুসলমানরা সকলে পূর্ণরূপে নিজ কর্তব্য পালনে এগিয়ে আসেন, তাহলে অতি সহজেই সমাজে দ্বীন প্রতিষ্ঠিত থাকার পাশাপাশি ঈছালে সওয়াবের উদ্দেশ্যে, দোআ-খতমের উপলক্ষে অর্থ লেন-দেন করার ক্ষেত্রে হীলা-বাহানা করা এবং দ্বারে দ্বারে ঘুরে চাঁদা আদায় করার নিন্দা থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। ইন্‌শাআল্লাহ্ !

১৬ নং হাদীস

إِنَّ أَقَلَّ سَاكِنِي الْجَنَّةِ النِّسَاءُ –

রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ"বেহেশ্‌তবাসীদের মধ্যে মহিলাদের সংখ্যা খুব কম হবে।" (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ বেহেশ্‌তবাসী হওয়ার ক্ষেত্রে নারী পুরুষের এই সংখ্যাগত ব্যবধানের কারণ হলো, স্বীয় কর্ম বা আমল। অর্থাৎ মহিলাদের মধ্যে দ্বীনদারী ও বিবেচনা শক্তি সাধারনতঃ কম হয়ে থাকে। ফলে তারা স্বামীর কথা খুব কমই মানতে পারে। আবার তারা নিয়ামতের না-শুকরীর রোগে থাকে আক্রান্ত, তদুপরি কথায় কথায় লা'নতএবং গাল-মন্দ করে থাকে।

সংযোজন ঃ ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর মর্যাদা, নারী ও পুরুষের মর্যাদার পার্থক্য এবং স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার ঃ লক্ষ্য করলে দেখা যায়, পৃথিবীতে এমন দুটি বস্তু রয়েছে যা গোটা বিশ্বের স্থায়িত্ব এবং উন্নয়নের স্তম্ভস্বরূপ। একটি নারী, অপরটি সম্পদ। আবার দেখা যায়, এ-দুটিই জগতে নানাবিধ বিশৃংখলা, অশান্তি ও অকল্যান সৃষ্টির কারন। কেননা, যখন এগুলোকে তাদের প্রকৃত মর্যাদা, স্থান ও উদ্দেশ্য থেকে সরিয়ে দেয়া হয়, তখন এ-গুলোই পৃথিবীর উন্নয়ন ও কল্যান সাধনের পরিবর্তে ভয়াবহ ধ্বংসাত্মক রূপ পরিগ্রহ করে। অতএব, ইসলামী শরীঅত উক্ত দুটি বস্তুর জন্য সংগতিপূর্ণ এমন অবস্থান নির্ধারন করেছে, যাতে তাদের দ্বারা যথাযথ ফল লাভ করা যেতে পারে এবং অকল্যান ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা থেকে জগতবাসী রেহাই পেতে পারে।

কুরআনে কারীম অধিকারের ক্ষেত্রে নারীকে পুরুষের সংগে তুলনা করেছে। হ্যাঁ, সংগত কারণে মর্যাদার ক্ষেত্রে কিছুটা পার্থক্যও দেখিয়েছে। বলা হয়েছে - নারীদের উপর যেমন পুরুষের অধিকার রয়েছে যা প্রদান করা একান্ত জরুরী, তেমনিভাবে পুরুষের উপরও নারীদের অধিকার রয়েছে, যা প্রদান করা অপরিহার্য। অন্যত্র বলা হয়েছে - পুরুষেরা হলো নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল। কেননা আল্লাহ একজনকে

অন্যজনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন আর এটাও একটা কারণ যে পুরুষেরা নারীদের জন্য নিজের সম্পদ ব্যয় করে থাকে।

বলা বাহুল্য যে, ইসলামপূর্ব যুগে সারা বিশ্বের সকল ধর্ম ও জাতিসমূহ নারী সমাজের সাথে যে অন্যায় আচরন করত, তা অত্যন্ত হৃদয়বিদারক ও লোমহর্ষক। তখন সৃষ্টির এই অংশটি ছিল অত্যন্ত অসহায় ও নিগৃহীত। তাদের ব্যাপারে ন্যায়সঙ্গত কোন ব্যবস্থা গ্রহণের কল্পনাও তৎকালীন বিশ্বে ছিল না। নবীয়ে রাহ্‌মাতুল্লিল্ আলামীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আনীত ধর্মই বিশ্ববাসীর চোখের পর্দা উন্মোচন করেছে। মানুষকে মানুষের মর্যাদা দান করতে শিখিয়েছে। ন্যায়নীতির প্রবর্তন করেছে এবং নারী সমাজের অধিকার সংরক্ষন করা পুরুষদের উপর ফরয করেছে। বিয়ে-শাদী ও ধন-সম্পদে তাদের নিজস্ব অধিকার দেয়া হয়েছে। কোন ব্যক্তি-তিনি পিতা হলেও - বালেগা মেয়েকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়েতে বাধ্য করতে পারেন না। এমনকি তার অনুমতি ব্যতীত বিয়ে দিলেও তা - তার অনুমতির উপর স্থগিত থাকে, সে অস্বীকৃতি জানালে তা বাতিল হয়ে যায়। তার সম্পদে কোন পুরুষই তার অনুমতি ছাড়া হস্তক্ষেপ করতে পারে না। স্বামী মারা গেলে বা তাকে তালাক দিলে সে স্বাধীন, কেউ তাকে বিবাহ কিংবা অবিবাহ কোন ব্যাপারেই বাধ্য করতে পারে না। সেও তার নিকটাত্মীয়ের ত্যাজ্য সম্পত্তিতে তেমনি অংশীদার হয়, যেমন হয় পুরুষেরা। তাদের সন্তুষ্টি বিধানকেও শরীয়ত ইবাদতের মর্যাদা দান করেছে। স্বামী তার ন্যায্য অধিকার না দিলে, সে আইনের সাহায্যে তা আদায় করতে পারে।

নারীদেরকে তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা জঘন্য অন্যায়। ইসলাম এ অন্যায়ের প্রতিরোধ করেছে। আবার যেহেতু তাদেরকে বলগাহীনভাবে ছেড়ে দেয়াও নিরাপদ নয়; বরং তাতে রয়েছে পৃথিবীর শান্তি শৃংখলা ভংগের ভয়াবহ পরিনতি, তাই পবিত্র কুরআন ঘোষনা করেছে, পুরুষের মর্যাদা নারী অপেক্ষা এক স্তর উর্ধ্বে। অর্থাৎ পুরুষ তাদের তত্ত্বাবধায়ক ও যিম্মাদার।

ইসলাম পূর্ব জাহেলীযুগের মানুষেরা নারীদেরকে শুধু ভোগের বস্তু এবং চতুষ্পদ জন্তুতুল্য বলে গন্য করত। এটা ছিল তাদের চরম ভুল। এ ভূলের সংশোধন করতে গিয়ে যেন আরেকটি মারাত্মক ভূলে পতিত না হয়, সে দিকেও সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখা মানব জাতির তথা নারী-পুরুষ সকলেরই কর্তব্য। আর সে মারাত্মক ভুলটা হলো নারীকে পুরুষের সাধারণ কর্তৃত্বাধীন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে দেয়া। এর ফলেই তো আজ পৃথিবীতে বেহায়াপনা, লজ্জাহীনতা, পাপাচার ও অরাজকতা ইসলামপূর্ব জাহেলী যুগকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে। আল্লাহ তাআলা আমাদের অন্তরকে ঈমানের আলোতে আলোকিত করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপদেশ যথাযথভাবে পালন করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

সামাজিক শান্তি-শৃংখলা ও প্রাকৃতিক নিয়ম রক্ষা, সর্বোপরি নারীদের সুবিধার্থেই তাদের উপর পুরুষের কিছুটা প্রাধান্য দেয়া হয়েছে এবং তা পালন করাও ফরয করে দেয়া হয়েছে। তাই বলে সকল পুরুষই সকল নারীর উপর মর্যাদার অধিকারী নয়। কেননা, আল্লাহর নিকট মর্যাদার নিরিখ হচ্ছে ঈমান ও নেক আমল। তাই পরকালের ব্যাপারে নারী-পুরুষের মাঝে দুনিয়ার মত পার্থক্য করা হয় না। হতে পারে যে, সেখানে কোন কোন স্ত্রীলোক অনেক পুরুষের চাইতেও অধিক মর্যাদাবান হবে।

আবার বলা হয়েছে - যেরূপ পুরুষের অধিকার রয়েছে স্ত্রীর উপর, সেরূপ স্ত্রীরও অধিকার রয়েছে পুরুষের উপর - এর অর্থ এই নয় যে, উভয়ের কর্মক্ষেত্রও এক হতে হবে। কেননা, প্রকৃতিগত ভাবেই তা পৃথকভাবে নির্ধারিত হয়েছে। বরং আয়াতের অর্থ এই যে, উভয়ের উপর উভয়ের অধিকার প্রদান ও কর্তব্য পালন করা সমভাবে ওয়াজিব। এতে অবহেলা করলে প্রত্যেকেই শাস্তি ভোগ করবে।

সৃষ্টির মাঝে ভেদাভেদ আল্লাহ তাআলার সৃষ্টিগত কৌশল ঃ আল্লাহ তাআলা যাকে নররূপে সৃষ্টি করেছেন তাতেই তার শোকর গুযারী করা কর্তব্য। যাকে নারীরূপে সৃষ্টি করেছেন তারও কর্তব্য এতে রাজী থাকা এবং এই চিন্তা করা যে, তাকে পুরুষরূপে সৃষ্টি করা হলে হয়তো সে পুরুষের দায়িত্ব পালনে সক্ষম হতো না, বরং উল্টা গুনাহগার সাব্যস্ত হতো। এ তো মহান স্রষ্টা-আল্লাহ তাআলার সৃষ্টিগত কৌশল। এতে অভিযোগ করার অধিকার কোন সৃষ্টির নেই। অভিযোগ বৈধ হলে শুধু নারী কেন ? যে কোন সৃষ্টিই তা করতে পারতো। যেমন গরু অভিযোগ করতে পারত যে, আমাকে মানুষ না বানিয়ে গরু বানানো হলো কেন ? তাহলে আমিও মানুষের মত অধিকার এবং সুযোগ-সুবিধা লাভ করতে পারতাম। এরূপ অভিযোগ করে মহান রাব্বুল আলামীনের বিধান পালনে অসন্তোষ প্রকাশ করা হলে নিজের ধ্বংসই কেবল টেনে আনা হবে। এমনিভাবে, সুন্দর-অসুন্দর ও লম্বা-খাট ইত্যাদি গুন-বৈশিষ্ট যা মানুষের সাধ্যায়ত্ব নয় - এরূপ ক্ষেত্রে যাকে যা দেয়া হয়েছে তাতেই শোকরিয়া আদায় করা কর্তব্য। এর বিপরীত আকাংখা করা নিষেধ। পক্ষান্তরে, যেসব গুন মানুষের সাধ্যায়ত্ব; চেষ্টা-সাধনার মাধ্যমে যা অর্জন করা সম্ভব, সেগুলো অর্জনের চেষ্টা করা প্রশংসনীয় কাজ। এই উভয়বিধ উদ্দেশ্যেই আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন ঃ "আর তোমরা আকাংখা করোনা সে বিষয়ের, যেটি দ্বারা আল্লাহ তাআলা তোমাদের একের উপর অপরের শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। পুরুষ যা অর্জন করে সেটা তার অংশ এবং নারী যা অর্জন করে সেটা তার অংশ। আর আল্লাহর কাছে তার অনুগ্রহ প্রার্থনা কর। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা সর্ব বিষয়ে জ্ঞাত। (নিসা - ৩২)

দ্বীনি শিক্ষা এবং পর্দার বিধান পালনের মাধ্যমেই নারীর ইহ-পরকলীন মুক্তি ও সফলতা লাভ করা সম্ভব। মাতৃজাতির দ্বীনি শিক্ষার গুরুত্ব ও সঠিক পদ্ধতি ঃ মানবজাতি মানবতার স্তরে উন্নীত থাকা এবং পরকালীন মুক্তি ও সফলতা লাভ করার জন্য দ্বীনি পরিবেশ ও দ্বীনি শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম এবং অনস্বীকার্য। তাইতো আল্লাহ তাআলা আসমানী কিতাব দিয়ে প্রেরণ করেছেন অসংখ্য নবী ও রাসূল। এ জন্যই সমস্ত

উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত যে, পুরুষদের জন্য যেমন শিক্ষা-দিক্ষা জরুরী নারীদের জন্যও শিক্ষা-দিক্ষা অনুরূপ জরুরী। অবশ্য লক্ষনীয় বিষয় এই যে, সাহাবা, তাবেঈন, তাবে তাবেঈন এবং পূর্বকালীন মুসলমানদের মধ্যে সরকারী-বেসরকারী উদ্যোগ ও তত্ত্বাবধানে পুরুষদের জন্য হাজার হাজার দ্বীনি শিক্ষাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু নারী শিক্ষার জন্য মহিলা শিক্ষিকা কিংবা পুরুষ শিক্ষক নিয়োগ করে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়নি। বরং এদের শিক্ষার প্রকৃত দায়িত্ব বর্তায় বিবাহপূর্বকালে পিতা-মাতা বা অন্যান্য অভিভাবকের উপর এবং বিবাহ পরবর্তীকালে স্বামীর উপর। কেননা, একান্ত অপারগতা না হলে ঘরে অবস্থান করাই তাদের জন্য পর্দা-বিধানের প্রকৃত দাবী।

হ্যাঁ, যদি সম্পূর্ণ শরীঅতসম্মত পর্দাধীনে দ্বীনদার মহিলা শিক্ষিকার মাধ্যমে তাদের জরুরী শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায় তবে তা খুবই জরুরী। যেমন কোন আলেম তার স্ত্রী, কন্যা বা বোনকে শিক্ষা দিল এবং এদের সাহায্যে মহল্লা বা পাড়ার মহিলাদের জন্য অনাবাসিক শিক্ষাগারের ব্যবস্থা করল, যার কাছে-ধারে কিংবা যাতায়াতের পথে বেগানা পুরুষ একেবারেই ঘেষতে না পারে। এরূপ সম্ভব না হলে আসলাফ তথা পূর্বসূরীদের ত্বরীকানুসারে ঘরোয়াভাবে তালীমের ব্যবস্থা করবে। আল্লাহর আদেশ - "তোমরা দোযখের আগুন থেকে নিজেদের বাঁচাও এবং অধীনস্থদেরও বাঁচাও" এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ঘোষনা - "তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই অধীনস্থের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।" আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এ নির্দেশাবলীর যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য উপরোক্ত পন্থার বিকল্প নেই। পক্ষান্তরে, নারীর হায়া বিনষ্টকারী কিংবা ফিৎনার সম্ভাবনাময় সকল শিক্ষা ব্যবস্থাই সম্পূর্ণরূপে কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী এবং হারাম।

স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির শিক্ষা দীক্ষার ব্যবস্থা করা অবশ্য কর্তব্য ঃ ফেকাহ্‌বিদগন বলেনঃ স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিকে আকীদা ও ফরয কর্ম সমূহ এবং হালাল ও হারামের বিধানাবলী শিক্ষা দেয়া এবং তা পালন করানোর চেষ্টা করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয। এক হাদীসে আছে - "আল্লাহ্ তাআলা সেই ব্যক্তির প্রতি রহম করুন, যে বলেঃ হে আমার স্ত্রী ও সন্তান - সন্ততি ! তোমাদের নামায, তোমাদের রোযা, তোমাদের যাকাত, তোমাদের এতীম, তোমাদের মিসকীন, তোমাদের প্রতিবেশী - আশা করা যায়, আল্লাহ তাআলা এ সকলকে তোমাদের সাথে জান্নাতে সমবেত করবেন। অর্থাৎ এ গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখ, এ গুলোর প্রাপ্য হক খুশী মনে আদায় কর। এতে শৈথিল্য প্রদর্শন করা মস্তবড় অন্যায়।

জনৈক বুযর্গ বলেন ঃ সেই ব্যক্তি কিয়ামতের দিন সর্বাধিক আযাবে থাকবে, যার পরিবার-পরিজন ধর্ম সম্পর্কে মূর্খ ও উদাসীন হবে।

পর্দার গুরুত্ব ও পদ্ধতি ঃ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পুন্যাত্মা পত্নীগনের অন্তরকে পাক-সাফ রাখার দায়িত্ব আল্লাহ তাআলা স্বয়ং গ্রহণ করেছেন। তা-সত্বেও তাঁদেরকে পর্দার বিধান দিয়ে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে - "হে নবী-পত্নীগন ! তোমরা অন্য নারীদের মত নও; যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় করে থাক পর পুরুষের সাথে কোমল ও আকর্ষনীয় ভংগিতে কথা বলো না, ফলে সেই ব্যক্তি কুবাসনা করে যার অন্তরে ব্যাধি (নিফাক বা ঈমানের দূর্বলতা) রয়েছে। তোমরা সঙ্গত কর্থাবার্তা বলবে। তোমরা গৃহাভ্যান্তরে অবস্থান করবে। মুর্খতা যুগের অনুরূপ নিজেদেরকে প্রদর্শন করবে না। নামায কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে। হে নবী পরিবারের সদস্যবর্গ ! আল্লাহ কেবল চায় তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দুর করতে এবং তোমাদেরকে পূর্নরূপে পূত-পবিত্র রাখতে। (৩২, ৩৩ - সূরা আহযাব)

অপরদিকে যেসব পুরুষকে সম্বোধন করে পর্দার এই বিধান দেয়া হয়েছে তাঁরা হলেন রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবায়ে কিরাম, যাঁদের মধ্যে অনেকের মর্যাদা ফেরেশ্‌তাগনের ও উর্ধ্বে। কিন্তু, এসব সত্ত্বেও তাঁদের আন্তরিক পবিত্রতা রক্ষা ও মনের কুমন্ত্রনা থেকে বেঁচে থাকার জন্যে পুরুষ ও নারীর মধ্যে পর্দার ব্যবস্থা করা জরুরী মনে করা হয়েছে। আজ এমন ব্যক্তি কে আছে যে তার মনকে সাহাবায়ে কিরামের মন অপেক্ষা এবং তার স্ত্রীর মনকে পুন্যাত্মা নবী-পত্নীগনের মন অপেক্ষা অধিক পবিত্র হওয়ার দাবী করতে পারে ! আর এটা মনে করতে পারে যে, নারী-পুরুষের একত্রে চলাফেরা-মেলামেশা কোন অনিষ্টের কারণ হবে না।

উপরোক্ত আয়াতে উল্লেখিত হেদায়েতগুলো কেবল নবী পত্নীগনের জন্যে নির্দিষ্ট নয়; বরং সমস্ত মুসলিম নারীর জন্যে সমভাবে প্রযোজ্য।

উক্ত আয়াতে পর্দা সম্পর্কিত তিনটি বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে ঃ এক ঃ "পরপুরুষের সাথে কোমল কণ্ঠে কথা বলবে না"। এর সারমর্ম এই যে, নারীদেরকে পরপুরুষ থেকে নিরাপদ দূরুত্বে অবস্থান করে পর্দার এমন উন্নত স্তর অর্জন করা উচিত, যার ফলে দূর্বল ঈমান বিশিষ্ট লোকের অন্তরে কামনা ও লালসার ভাব কল্পনাও যেন আসতে না পারে। দুই ঃ "নারীরা গৃহে অবস্থান করবে"। অর্থাৎ প্রকৃত প্রস্তাবে আল্লাহ পাকের নিকট নারীরা বাড়ী থেকে বের না হওয়াই কাম্য-গৃহকর্ম সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যেই তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে; এতেই তারা পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করবে। বস্তুতঃ শরীঅতের কাম্য আসল পর্দা হল গৃহের অভ্যন্তরে অনুসৃত পর্দা। তিন - "মুর্খতাযুগের অনুরূপ নিজেদেরকে প্রদর্শন করবে না।" অর্থাৎ শরীঅত অনুমোদিত প্রয়োজনের তাকিদে যদি নারীকে বাড়ী থেকে বের হতে হয়, তবে যেন সৌন্দর্য ও দেহ সৌষ্ঠব প্রদর্শন না করে বের হয়, বরং বোরকা বা গোটা শরীর আবৃত করে ফেলে - এমন চাদর গায়ে দিয়ে বের হয়। যেমন সূরা আহ্যাবেরই অন্য আয়াতে বলা হয়েছে - "তারা যেন তাদের

চাদরের কিয়দাংশ নিজেদের উপর টেনে নেয়।" অর্থাৎ মাথার উপরদিক থেকে মুখমন্ডলসহ সমস্ত শরীরে চাদর লটকিয়ে নেয়।

এই চাদরের আকার-আকৃতি সম্পর্কে হযরত ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বলেন ঃ এই চাদর ওড়নার উপরে পরিধান করা হয়। ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (রহঃ) বলেন ঃ আমি হযরত উবায়দা সালমানী (রহঃ)কে এই আয়াতের উদ্দেশ্য এবং এই চাদরের আকার-আকৃতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি মস্তকের উপর দিক থেকে চাদর মুখমন্ডলের উপর লটকিয়ে মুখমন্ডল ঢেকে ফেললেন এবং কেবল বামচক্ষু খোলা রাখলেন। এভাবে তিনি উক্ত আয়াতের তাফসীর কার্যতঃ দেখিয়ে দিলেন। এ আয়াত পরিষ্কারভাবে মুখমন্ডল আবৃত করার আদেশ ব্যক্ত করেছে।

মুখমন্ডল এবং হাতের তালু পরপুরুষের সামনে খোলা রাখা হযরত ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) এর মতে নাজায়েয আর হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) এর মতে জায়েয। এ কারণেই ফেকাহবিদ আলেমগনের মধ্যে এ ব্যাপারে দ্বিমত রয়েছে। কিন্তু এ প্রশ্নে সবাই একমত যে, মুখমন্ডল ও হাতের তালু খোলা রাখার দরুন যদি পুরুষেরা তা দেখার সুযোগ পায় এবং তাদের অন্তরে কুধারনা পয়দা হওয়ার আশংকা থাকে, তাহলে এগুলো খোলা রাখা বা প্রকাশ করা না জায়েয। এমনিভাবে এ-ব্যাপারেও সবাই একমত যে, নামায পড়া অবস্থায় এই দুই অঙ্গ খোলা রাখা জায়েয। একান্ত প্রয়োজনের তাকিদে যদিও এই দুই অঙ্গ খোলা রাখা নারীদের জন্য জায়েয, কিন্তু শরীঅত সম্মত উযর বা অনন্যোপায় অবস্থা ব্যতীত পুরুষের জন্য সেদিকে তাকানো সম্পূর্ণ না জায়েয -হারাম।

বলা বাহুল্য যে, মানুষের চেহারাই সৌন্দর্য ও শোভার আসল কেন্দ্র। বর্তমান যুগ ফেৎনা-ফাসাদ, কামাধিক্য ও গাফিলতির যুগ। তাই বিশেষ প্রয়োজন যেমন চিকিৎসা অথবা তীব্র বিপদাশঙ্কা ছাড়া বেগানা পুরুষের সামনে ইচ্ছাকৃতভাবে মুখমন্ডল খোলা রাখা নারীর জন্যে নিষিদ্ধ এবং তার দিকে বিনা প্রয়োজনে ইচ্ছাকৃতভাবে দৃষ্টিপাত করাও পুরুষের জন্য জায়েয নয়। বর্তমানে যেহেতু জালিবিশিষ্ট কাপড়ের ব্যবস্থা রয়েছে যা ব্যবহার করলে চক্ষু খোলা রাখার প্রয়োজন থেকে বাঁচা যায়, তাই এমতাবস্থায় চক্ষু খোলা রাখাও জায়েয হবে না। তবে জালি ব্যবহার না করলে শুধু বাম চক্ষুর সামনে কাপড় ছিদ্র করে নিবে। উভয় চোখ খোলা রাখা না জায়েয।

পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে বুঝা গেল যে, নারীর পক্ষে ঘর থেকে বের হওয়া স্বভাবতঃ নিষিদ্ধ ও হারাম। তবে বিশেষ প্রয়োজনের তাকিদে বোরকা বা অন্য কোন প্রকারের পর্দা করে ঘর থেকে বের হওয়ার অনুমতি রয়েছে। যেমনঃ হজ্ব, উমরা, মাহ্‌রাম আত্মীয়-স্বজনের সহিত সাক্ষাত ও রুগ্নাবস্থায় তাদের সেবা-শুশ্রুষা ও অন্যান্য প্রয়োজনাদি। এমনি ভাবে একান্ত অপারগ অবস্থায় চাকুরীর উদ্দেশ্যে বের হওয়াও জায়েয। তবে শর্ত হলো, সৌন্দর্য প্রদর্শন করে বের না হওয়া।

পুর্বোক্ত আয়াতে বর্নিত পরপুরুষের সাথে বাক্যালাপ সংশ্লিষ্ট হেদায়েত শ্রবন করার পর উম্মাহাতুল মু'মিনীনের কেউ যদি পর পুরুষের সাথে কথাবার্তা বলতেন, তবে মুখে হাত রেখে বলতেন - যাতে কণ্ঠস্বর পরিবর্তিত হয়ে যায়।

স্বামী-স্ত্রীর উপদেশ সম্পর্কে কতিপয় হাদীস ঃ ✪ কিয়ামতের দিন নারীকে সর্বপ্রথম যে, প্রশ্ন করা হবে, তা হবে তার নামায ও স্বামী সম্পর্কে। (কিঃ কাঃ)

✪ একবার এক মহিলা নবীজির কাছে স্বীয় স্বামীর কথা উল্লেখ করলে তিনি বললেন ঃ তুমি তার তুলনায় কতটুকু মর্যাদার অধিকারী ভেবে দেখ। সে তোমার বেহেশ্‌ত ও দোযখ। (নাসায়ী)

✪ স্ত্রী যখন স্বামীর অনুমতি ছাড়া তার গৃহ ত্যাগ করে, তখন সে ফিরে না আসা পর্যন্ত ফেরেশ্‌তারা তার উপর অভিসম্পাত করে। (তাবরানী)

✪ স্বামীকে সন্তুষ্ট রেখে যে স্ত্রী মারা যায়, সে জান্নাতে যাবে। (তিরমিযী) কেবল বৈধসীমার মধ্যে স্বামীর পূর্ণ আনুগত্য করা স্ত্রীর জন্য ওয়াজিব।

✪ চার রকমের নারী জান্নাতে এবং চার রকমের নারী জাহান্নামে যাবে। (১) আল্লাহর ও স্বামীর অনুগত সতী নারী। (২) অধিক সন্তান উৎপাদনে সক্ষম, ধৈর্যশীলা ও অল্পেতুষ্ট নারী। (৩) লজ্জাশীলা নারী, যে স্বামীর অনুপস্থিতিতে নিজের সতিত্ব ও স্বামীর সম্পদ সংরক্ষন করে এবং তার উপস্থিতিতে তার সাথে বাক সংযম করে। (৪) এবং-শিশুসন্তানসহ বিধবা হওয়ার পর যে নারী সন্তানদেরকে আঁকড়ে ধরে থাকে এবং তাদের ক্ষতির আশংকায় বিয়ে না করে, তাদের লালন-পালনে নিয়োজিত থাকে। আর যে চার রকমের নারী জাহান্নামে যাবে, তারা হচ্ছে ঃ (১) যে নারী স্বামীর অনুপস্থিতিতে নিজের সতিত্ব রক্ষা করে না, আর সে উপস্থিত থাকলে কটুবাক্য দ্বারা তাকে কষ্ট দেয়। (২) যে নারী স্বামীর উপর সাধ্যাতীত বোঝা চাপায় এবং যা তার ক্ষমতার বাইরে তা তাকে করতে বাধ্য করে। (৩) যে নারী পরপুরুষ থেকে নিজেকে ঢেকে রাখে না এবং সাজ সজ্জা করে ও রূপের প্রদর্শনী করে বাইরে বের হয়। (৪) যে নারীর পানাহার ও ঘুম ছাড়া আর কোন কিছুতেই আগ্রহ নেই এবং নামায, আল্লাহ, রাসূল ও স্বামীর আনুগত্য করতে চায়না। এসব নারী যখন স্বামীর অনুমতি ছাড়া বাইরে বের হয়, অভিশাপ কুড়ায় ও জাহান্নামের যোগ্য হয়। কেবল মাত্র তওবা দ্বারা সে এই পরিণাম থেকে রক্ষা পেতে পারে। (কিঃ কাঃ)

✪ নারী পর্দায় থাকার জন্যই সৃষ্ট। সে যখন ঘর থেকে বের হয়, তখন শয়তান তাকে অভিনন্দন জানায়। (তিরঃ) অর্থাৎ তাকে মুসলমানদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টির মাধ্যম বানায়।

✪ নারী আপন গৃহে অবস্থান, আল্লাহর ইবাদত ও স্বামীর আনুগত্যের মাধ্যমে যতটা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করে ততটা আর কোনভাবে করতে পারে না। (কিঃ কাঃ)

✪ একবার হযরত আলী (রাযিঃ) স্বীয় স্ত্রী হযরত ফাতিমা (রাযিঃ) কে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ নারীর মঙ্গল কিসে ? হযরত ফাতিমা বললেন ঃ বেগানা পুরুষের প্রতি দৃষ্টিপাত না করা এবং বেগানা পুরুষকে তার প্রতি দৃষ্টিপাত করার সুযোগ না দেয়ার মধ্যেই নারীর মঙ্গল নিহিত। (কিঃ কাঃ)

✪ তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই উত্তম, যে তার পরিবার-পরিজনের সাথে অধিকতর সদ্ব্যবহারী। (ইঃ হাঃ)

✪ যে ব্যক্তি নিজ স্ত্রীর দুর্ব্যবহারে ধৈর্য ধারন করবে, সে হযরত আইয়্যুব (আঃ) এর মত পুরষ্কৃত হবে। আর যে স্ত্রী তার স্বামীর দুর্ব্যবহারে ধৈর্য ধারন করবে, সে ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়া বিনতে মুযাহিমের ন্যায় পুরষ্কৃত হবে। (কিঃ কাঃ)

✪ হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ একবার আমি ও ফাতিমা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে উপস্থিত হয়ে দেখলাম, তিনি অত্যন্ত অধীরভাবে কাঁদছেন। আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল, আপনার জন্য আমার পিতামাতার প্রাণ উৎসর্গ হোক ! আপনি কি জন্য কাঁদছেন ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ "হে আলী ! মিরাজের রাত্রে আমি আমার উম্মাতের নারীদেরকে নানা রকমের আযাব ভোগ করতে দেখেছি। সেই কঠিন আযাবের কথা মনে করে কাঁদছি। আমি দেখেছি, এক মহিলাকে তার চুল দিয়ে জাহান্নামের আগুনের ওপর ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। ফলে তার মাথার ঘিলু টগবগ করে ফুটছে। আর এক মহিলাকে দেখলাম তার জিহবা টেনে লম্বা করে তা দিয়ে তাকে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে এবং তার গলায় পানি ঢালা হচ্ছে। আর এক মহিলাকে দেখলাম, তার দুই পা দুই স্তনের সাথে এবং দুই হাত কপালের চুলের সাথে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। আর এক মহিলাকে দেখলাম তার স্তনে রশি বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। আর এক মহিলাকে দেখলাম, তার মাথা শুকরের মাথার মত, তার দেহ গাধার দেহের মত এবং তাকে হাজার হাজার রকমের শাস্তি দেয়া হচ্ছে। আর এক মহিলাকে দেখলাম, সে কুকুরের আকৃতি পেয়েছে। আগুন তার মুখ দিয়ে ঢুকছে এবং মলদ্বার দিয়ে বেরুচ্ছে। আর ফেরেশতারা তার মাথায় লোহার হাতুড়ি দিয়ে পেটাচ্ছে।

হযরত ফাতিমা উঠে দাঁড়ালেন এবং এইসব মহিলার এইসব আযাবের কারণ কি তা জানতে চাইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ "হে ফাতিমা ! যে মহিলাকে চুল দিয়ে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে, সে পর পুরুষের দৃষ্টি থেকে নিজের মাথাকে ঢেকে রাখতোনা। যে মহিলাকে তার জিহবা দিয়ে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে সে প্রতিবেশীকে কটুবাক্য দ্বারা কষ্ট দিত। স্তনে রশি দিয়ে বেঁধে যাকে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে, সে স্বামীর অনুপস্থিতিতে নিজের সতিত্ব সংরক্ষন করতোনা, অর্থাৎ ব্যভিচারীনী ছিল। আর যার দুই পা স্তনের সাথে এবং দুই হাত কপালের চুলের সাথে বেঁধে ঝুলিয়ে

রাখা হয়েছে, সে সহবাস ও ঋতুজনিত অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতা অর্জন করতোনা এবং নামায নিয়ে তামাশা করতো। যার মাথা শুকরের মত ও দেহ গাধার মত হয়ে গেছে, সে ছিল চোগলখোর ও মিথ্যাবাদী। আর যে কুকুরের আকারে রূপান্তরিত হয়েছে, সে ছিল হিংসুটে এবং দান করে খোটা দিত। (কিঃ কাঃ)

✪ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন নারী নিজের স্বামীকে কষ্ট দিলে জান্নাতের হুর উক্ত নারীকে অভিসম্পাত দেয়। (কিঃ কাঃ)

✪ হযরত আলী (রাঃ) বলতেন ঃ 'তোমাদের কি লজ্জা নেই, তোমাদের কি আত্মসম্মানবোধ নেই যে,তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে বাইরে যেতে দাও আর তারা পরপুরুষদের দিকে তাকায় এবং পরপুরুষেরাও তাদের দিকে তাকায় ? (কিঃ কাঃ)

✪ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "মহিলা যখন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ঠিক ঠিক মত পড়বে, রমযান মাসের রোযা ঠিকমত রাখবে, নিজের সতীত্ব রক্ষা করবে এবং স্বামীর অনুগত থাকবে, তখন সে যে দরজা দিয়েই জান্নাতে প্রবেশ করতে চাইবে, করতে পারবে।" (আহমাদ, তাবরানী)

১৭ নং হাদীস

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ وَكُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ كَانَتِ النَّارُ أَوْلَى بِهِ

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ"হারাম খাদ্য থেকে সৃষ্ট গোশ্ত জান্নাতে যাবে না এবং হারাম খাদ্য থেকে সৃষ্ট যত গোশ্ত আছে তার জন্য জাহান্নামের আগুনই অধিক উপযুক্ত।" (আহমাদ, দারেমী ও বায়হাকী)

ব্যাখ্যা ঃ মুহাদ্দিসগনের মতে হাদীসটির বিশ্লেষন তিন ভাবে করা যেতে পারে। এক ঃ হারাম ভক্ষনকারী ব্যক্তি সর্বপ্রথম নাজাতপ্রাপ্তদের সংগে জান্নাতে প্রবেশ করবে না; বরং হারাম ভক্ষন পরিমান জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করার পর জান্নাতে যাবে। দুই ঃ সে ব্যক্তি জান্নাতের উঁচু স্তর সমূহে পৌঁছতে পারবে না। তিন ঃ যদি হারামকে হালাল জেনে ভক্ষন করে থাকে, তাহলে সে কখনো ও জান্নাতে প্রবেশ করবে না। কারণ, হালালকে হারাম কিংবা হারামকে হালাল মনে করা কুফ্রী।

"জাহান্নামের আগুনই অধিক উপযুক্ত" কথাটির অর্থ হলো, জান্নাতের স্থলে জাহান্নামই সেই দেহের জন্য অধিক উপযুক্ত ও প্রযোজ্য স্থান। যেন, আগুন সেই দেহকে পুড়িয়ে পবিত্র করে দেয়। অতঃপর সেই দেহ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে – لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ جَسَدٌ غُذِيَ بِالْحَرَامِ - "হারাম খাবারে লালিত দেহ (শাস্তিবিহীন-নিরাপদে ভাল লোকদের সংগে) জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"

সংযোজন ঃ হারাম থেকে বাঁচা এবং হালাল মাল অনুসন্ধানের গুরুত্ব ঃ হাদীস শরীফে আছে - ⊙ কেহ দশ দিরহাম দিয়ে একটি কাপড় কিনল আর সেই দশ

দিরহামের মধ্যে একটি দিরহাম ছিল হারাম। যতদিন সেই কাপড় তার শরীরে থাকবে আল্লাহ তাআলা তার নামায কবুল করবেন না। (আহমাদ) অর্থাৎ যদিও ফরয আদায় হয়ে যাবে কিন্তু পূর্ণ সওয়াব পাবে না। অন্যান্য আমলের অবস্থাও তাই।

◉ নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা পবিত্র, পবিত্র ব্যতীত অন্য কিছু তিনি কবুল করেন না। আল্লাহ তাআলা মুমিনগনকে সেই কাজের হুকুম করেছেন, যেই কাজের হুকুম করেছেন রাসূলগনকে এবং বলেছেন ঃ হে রাসূলগন! তোমরা পবিত্র বস্তু আহার কর এবং নেক আমল কর। এবং বলেছেন ঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু আহার কর, যা আমি তোমাদের দিয়েছি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উল্লেখ করেন যে, কোন ব্যক্তি দীর্ঘ সফর করে ধূলিধূসরিত এবং জীর্নশীর্ন অবস্থায় আসমানের দিকে হাত বাড়িয়ে বলে - হে আমার পালনকর্তা! হে আমার পালনকর্তা! অথচ তার খাদ্য হারাম, তার পানীয় হারাম, তার পোষাক হারাম এবং সে পালিত হয়েছে হারাম দ্বারা, এমতাবস্থায় তার দোআ কিভাবে কবুল হতে পারে? (মুসঃ) অর্থাৎ এত পরিশ্রম সত্ত্বেও হারাম মাল ব্যবহারের কারণে তার দোআ অগ্রাহ্য হবে। আর যদি কখনও মাকসুদ পূর্ন হয়ে যায় তবে তা দোআর কারণে নয় বরং তাকদীরের কারনে। যেমন, কাফেরদের মাকসুদ পূর্ণ হয়ে থাকে। হারাম মাল দ্বারা পালিত হওয়ার কারণে দোআ কবুল হয় না একথা সত্য, তবে নাবালেগ অবস্থায় পিতা-মাতা কর্তৃক যে হারাম মাল ভক্ষন করানো হয়, তার জন্য সন্তান দায়ী নয়, পিতা-মাতা দায়ী।

◉ হালাল স্পষ্ট এবং হারাম স্পষ্ট। এর মধ্যবর্তী রয়েছে সংশয়যুক্ত বিষয়। সুতরাং যে বেঁচে থাকল সংশয়ের বিষয় থেকে সে রক্ষা করল নিজের দ্বীনকে এবং নিজের ইজ্জতকে আর যে পতিত হল সংশয়ের বিষয়ে, সে অচিরেই পতিত হবে হারামে। ঐ রাখালের মত, যে পশু চরায় এমন চারনভূমির আশেপাশে যেই চারনভূমিটি বাদ্‌শাহ তাঁর পশুর জন্য নির্দিষ্ট করে নিয়েছে, অনতিবিলম্বে সে (একদিন) এই (নির্দিষ্ট) চারনভূমিতে চরাতে আরম্ভ করবে। (অর্থাৎ সংশয়ের বিষয় থেকে দূরে সরে না থাকার কারণে ক্রমে ক্রমে সে একদিন স্পষ্ট হারামে লিপ্ত হয়ে যাবে।) জেনে রাখ! প্রত্যেক বাদ্‌শাহ্‌র একটি চারনভূমি রয়েছে (যেখানে অন্যদের প্রবেশাধিকার নেই।) জেনে রাখ! আল্লাহর চারনভূমি হল তাঁর নিষিদ্ধ বিষয় সমূহ। জেনে রাখ! মানুষের শরীরে একটি গোশ্‌তের টুকরা আছে, যা শুদ্ধ থাকলে গোটা দেহ শুদ্ধ থাকবে আর তা বিনষ্ট হলে গোটা দেহ বিনষ্ট হয়ে যাবে। জেনে রাখ! সেই টুকরাটি হল দিল বা অন্তর। (বুখারী ও মুসলিম) এই হাদীসটি থেকে বুঝা গেল যে, হালাল ও হারামের সংগে অন্তরের শুদ্ধাশুদ্ধির বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে।

◉ এমন হতে পারে না যে, বন্দা হারাম মাল উপার্জন করে উহা হতে সদ্‌কা করবে আর তার থেকে তা কবুল করা হবে এবং উহা হতে সে ব্যয় করবে আর তার জন্য তাতে বরকত দেয়া হবে এবং সে উহা রেখে যাবে আর তার জন্য তা পাথেয় হবে; বরং উহা তাকে দোযখেই পৌঁছাবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মন্দকে মন্দ দ্বারা দূরীভূত করেন না

(অর্থাৎ হারাম মাল দান করা গুনাহের কাজ এবং একটি গুনাহের কাজ দ্বারা আরেকটি গুনাহের কাজ মাফ হতে পারেনা) কিন্তু ভালই পারে মন্দকে দুরীভূত করতে নিশ্চয় খবীছ (হারাম মাল) দূর করতে পারে না খবীছ কে (গুনাহ্ কে) । (আহমাদ)

⦿ নিশ্চয় আমার এমন কোন বিষয় জানা নেই যে, যা তোমাদেরকে জান্নাতের নিকটবর্তী করবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে সরাবে অথচ সে বিষয়ে আমি তোমাদের হুকুম করিনি। আর এমন কোন বিষয় আমার জানা নেই যে, যা তোমাদেরকে জান্নাত থেকে দূরে সরাবে এবং জাহান্নামের নিকটবর্তী করবে অথচ সে বিষয়ে আমি তোমাদের নিষেধ করিনি। (অর্থাৎ যেই আমল জান্নাতে পৌঁছায় এবং জাহান্নাম থেকে দূরে সরায়, তা সবই আমি তোমাদের বাত্‌লে দিয়েছি আর যে কাজ জান্নাত থেকে দূরে সরায় এবং জাহান্নামে পৌঁছায়, সেই সমস্ত কাজ থেকে আমি তোমাদের বারণ করেছি) এবং নিশ্চয় রুহুল আমীন (জিব্রাঈল আঃ) আমার অন্তরে একথা ঢেলে দিয়েছেন যে, অবশ্যই কোন প্রাণী কখনো মৃত্যুবরন করবে না, যতক্ষন সে তার রিযিক পুরা করে না নেয়, যদিও সেই রিযিক তার দেরীতে প্রাপ্ত হয়। (অর্থাৎ ভাগ্যে লিখিত রিযিক না খেয়ে কোন প্রাণী মরবে না এবং যেই সময় খাওয়ার কথা ভাগ্যে লিখিত রয়েছে সেই সময় অবশ্যই তা তার নিকট পৌঁছবে। নিয়ত খারাপ করে হারাম উপার্জনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের পূর্বে তা কখনো পাওয়া যাবে না।) অতএব, আল্লাহকে ভয় কর এবং রিযিকের অন্বেষনে ধীরস্থিরতা অবলম্বন কর আর রিযিক প্রাপ্তির বিলম্ব যেন তোমাদেরকে কখনো এ ব্যাপারে প্রস্তুত না করে যে, তোমরা আল্লাহ তাআলার নাফরমানির মাধ্যমে তা অন্বেষন করতে শুরু কর। কেননা, আল্লাহ তাআলার শান হলো এরূপ যে, তাঁর কাছে যা আছে (রিযিক ইত্যাদি) তাঁর নাফরমানির মাধ্যমে তা হাসিল করা যেতে পারে না। (ইবনে আবিদ্দুনিয়া, বায়হাকী) অর্থাৎ আল্লাহকে ভয় করে, তাঁর ওয়াদার প্রতি ইয়াকীন করে হারাম থেকে বাঁচ এবং অঢেল সম্পদ উপার্জনে লিপ্ত হয়ো না - লোভ থেকে বাঁচ। আর রিযিক প্রাপ্তিতে বিলম্ব দেখে গুনাহের মাধ্যমে তা হাসিল করার চেষ্টা করো না। কেননা, নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে তা কখনো পাওয়া যাবে না। যদি গুনাহের মাধ্যমে কেহ রিযিক পেয়ে যায় তবে বুঝতে হবে যে, গুনাহের কারণে নয়; বরং ভাগ্যে থাকার কারনেই সে তা পেয়েছে। যদি সে গুনাহের মাধ্যম ছাড়া অন্য উপায় অবলম্বন করত তাহলে সে ঠিক সেই মুহূর্তে সেই পরিমান রিযিকই পেত, যা সে গুনাহের কাজের মধ্য দিয়ে পেয়েছে।

⦿ হালাল মাল অন্বেষন করা ফরয অন্যান্য ফরযের পর। (বায়হাকী) অর্থাৎ যে সব ফরয ইসলামের স্তম্ভ, সে গুলোর পর হালাল মাল উপার্জন করাও একটি ফরয কাজ। এক কথায়, এই ফরযের মর্তবা অন্য সব ফরযের পরে। তাও আবার ঐ ব্যক্তির জন্য, যে প্রয়োজনীয় ব্যয়ের ক্ষেত্রে অভাবগ্রস্ত হয়। পক্ষান্তরে, যার কাছে প্রয়োজন পরিমান মাল মওজুদ রয়েছে - তার জন্য ফরয নয়। হারামের প্রতি মুসলমানদের ভ্রুক্ষেপ করাই উচিত নয়। কেননা, তা বরকতহীন হয় এবং হারামখোর উভয়জগতে অপমানিত হয়

এবং আল্লাহ তাআলার লা'নতের মধ্যে লিপ্ত থাকে। কারো কারো ধারনা হতে পারে যে, বর্তমানযুগে হালাল ভাবে উপার্জন করা অসম্ভব এবং এ ব্যাপারে নিরাশ হয়ে পড়ে তা একেবারেই ভুল এবং শয়তানের ধোকা মাত্র। একান্তভাবে স্মরণ রাখবে যে, শরীঅতের উপর আমলকারীর সাহায্য গায়ব বা অদৃশ্য জগত থেকে হয়ে থাকে। যে ব্যক্তি হালাল খাওয়ার এবং হারাম থেকে বাঁচার ইচ্ছা করে আল্লাহ তাআলা তার জন্য হালাল মালই যোগিয়ে দেন। একথা বাস্তবতার নিরীখে প্রমানিত এবং কুরআন ও হাদীস শরীফের বহু জায়গায় এর ওয়াদা রয়েছে।

✪ যে ব্যক্তি নিজের সম্পদ কোথা থেকে উপার্জন করবে তার পরোয়া করবেনা, আল্লাহ তাআলা তাকে কোন দরজা দিয়ে জাহান্নামে ঢুকাবেন তার পরোয়া করবেন না। (কিঃ কাঃ) ✪ হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন ঃ আমি বললাম, ইয়ারাসূলাল্লাহ! আল্লাহর কাছে দোআ করুন যেন আমার দোআ কবুল হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ হে আনাস! তোমার উপার্জনকে হালাল রাখ, তোমার দোআ কবুল হবে। মনে রেখ, যদি কেউ হারাম খাদ্যের এক লোকমাও মুখে নেয়, তাহলে চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার দোআ কবুল হবে না। (কিঃ কাঃ)

✪ দশভাগের নয়ভাগ রিযিক তিজারতের মধ্যে রয়েছে। (গরীবুল হাদীস-লিল্হারবী-বেঃ জেঃ ৫ম খঃ) অর্থাৎ তিজারত খুব বেশী আয়ের উৎস। তাই ইহা অবলম্বন কর।

✪ আল্লাহ তাআলা সেই মুমিন বান্দাকে ভালবাসেন যে পরিশ্রমী ও পেশাদার হয় এবং সে কি পরিধান করল তার কোন পরোয়া করে না। (বায়হাকী) অর্থাৎ কষ্ট ও পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে সাধারণ ও অপরিষ্কার কাপড়ই পরে নেয়। কাপড়কে খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার সুযোগ সে পায় না। তবে কারো সুযোগ থাকলে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা উচিত।

✪ আমার কাছে এ কথার ওহী করা হয়নি যে, আমি মাল সঞ্চয় করি এবং ব্যবসায়ীদের অন্তর্ভুক্ত হই; কিন্তু আমার কাছে একথার ওহী করা হয়েছে যে, তুমি তোমার রব-এর হাম্দ সহ তাসবীহ কর এবং সাজদাকারীদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাও এবং তোমার রব-এর ইবাদত করতে থাক তোমার মৃত্যু আসা পর্যন্ত। (হিল্ইয়া, ইব্নে মারদুবিয়া-বেঃ জেঃ ৫ম খঃ) অর্থাৎ সর্বদা নামায ও ইবাদতে মশগুল থাক। প্রয়োজনের অধিক দুনিয়ার কাজে মশগুল হয়ো না। কেননা, জরুরত পরিমাণ জীবিকার ব্যবস্থা করা সকলের উপর ওয়াজিব। তবে যার মধ্যে তাওয়াক্কুলের শক্তি ও শর্তাবলী বিদ্যমান রয়েছে এমন ব্যক্তি সকল কাজ-কারবার ছেড়ে দিয়ে কেবল ইলমী ও আমলী ইবদতে আত্মনিয়োগ করতে পারে।

✪ আল্লাহ তাআলা মেহেরবানী করুন এমন ব্যক্তির উপর যে উদার ও কোমল আচরণ করে বেচা- কেনা ও কর্জ ফেরত চাওয়ার সময়। (বুখারী)

✪ সত্যবাদী ও আমানতদার ব্যবসায়ী (কিয়ামতের দিন) নবী, সিদ্দীক ও শহীদগণের সঙ্গে থাকবে। (তিরমিযী)

✪ হে ব্যবসায়ীদের দল ! নিশ্চয় ব্যবসা এমন একটি বিষয় যাতে বেহুদা কথা হয়ে যায় এবং কসম খাওয়া হয়। তাই তোমরা তাতে সদ্‌কা-খয়রাতকে যোগ করে নাও। (তিরমিযী) অর্থাৎ তোমাদের দান-সদকা করা উচিত। যেন, তা অনিচ্ছাকৃতভাবে হয়ে যাওয়া বেহুদা কথাগুলির কাফ্‌ফারা হয়ে যায় এবং অন্তরের কালিমা দূর হয়ে যায়।

✪ কিয়ামতের দিন ব্যবসায়ীদেরকে পাপী ও গুনাহগার রূপে উঠানো হবে। তবে যে আল্লাহকে ভয় করেছে এবং সত্য কথা বলেছে তাকে ছাড়া। (তিরমিযী)

✪ আল্লাহ তাআলা যেমন তোমাদের মধ্যে তোমাদের জীবিকা বন্টন করেছেন, তোমাদের মধ্যে তোমাদের স্বভাব-চরিত্রও বন্টন করেছেন। দুনিয়ার সম্পদ তিনি যাকে ভালবাসেন তাকেও দেন, যাকে ভালবাসেন না তাকেও দেন। কিন্তু দ্বীন তথা আখিরাতের সম্পদ কেবল তাকেই দেন, যাকে তিনি ভালোবাসেন। আল্লাহ যাকে দ্বীন দান করেছেন, বুঝতে হবে যে, তিনি তাকে ভালোবেসেছেন। (বায়হাকী)

✪ হযরত উমর (রাযিঃ) বলেন ঃ আমরা হারামের মধ্যে পতিত হওয়ার ভয়ে হালাল সম্পদের দশ ভাগের নয় ভাগ বর্জন করতাম। (কিঃ কাঃ)

✪ হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বলেন ঃ কোন মুসলমানের হারাম জিনিস খাওয়ার চেয়ে মাটি খাওয়াও ভালো। (আহমাদ)

হারাম সম্পর্কে বুযর্গানে দ্বীনের বাণী ঃ ◉ হযরত ইমাম গাযালী (রহঃ) বিশিষ্ট বুযর্গ হযরত সুহায়ল (রহঃ) থেকে বর্ননা করেন যে, যে ব্যক্তি হারাম খায় তাঁর অঙ্গ-প্রতঙ্গ তার আনুগত্য ছেড়ে দেয়। অর্থাৎ তার আকল নেক কাজের হুকুম করে কিন্তু তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ উহার আনুগত্য করে না।

◉ বিখ্যাত আলেম হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহঃ) বলেনঃ "একটি সংশয়যুক্ত দিরহাম ফিরিয়ে দেয়া আমার নিকট অধিকপ্রিয় ছয় লাখ দিরহাম দান করা অপেক্ষা।"

এ থেকে আমাদের বুঝা উচিত যে, সন্দেহযুক্ত মালের যখন এই অবস্থা তখন স্পষ্ট হারাম মাল থেকে বেঁচে থাকার কি পরিমান গুরুত্ব রয়েছে।

✪ হযরত সুফিয়ান সওরী (রহঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি হারাম অর্থ দ্বারা কোন সৎকাজ করে, সে পেশাব দ্বারা কাপড় ধৌতকারীর মত। কাপড় পবিত্র পানি ছাড়া পাক হয় না। আর গুনাহ এর কাফ্‌ফারাও হালাল উপার্জন ছাড়া সম্ভব নয়।

✪ জনৈক নেক্‌কার ব্যক্তিকে কেউ স্বপ্নে দেখে তার অবস্থা জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন ঃ আমি কোন আযাব ভোগ করছি না। তবে দুনিয়ার জীবনে একটি সূঁচ ধার নিয়ে তা ফেরত দেইনি বলে আমার জান্নাতে যাওয়া স্থগিত রয়েছে।

✪ হযরত ইউসুফ বিন আস্‌বাত (রহঃ) বলেন ঃ কোন যুবক যখন ইবাদতে মনোনিবেশ করে, তখন শয়তান নিজের সহকর্মীদেরকে বলে ঃ খোঁজ নাও, লোকটি কি খায় ! সে যদি হারাম খায়, তাহলে সে যত ইচ্ছা ইবাদত করে ক্লান্ত হোক, বাধা দিওনা। কেননা,

সে নিজেই নিজের ইবাদত ধ্বংসের জন্য যথেষ্ট। হারাম খাওয়া অব্যাহত রেখে ইবাদত তার কোন কাজে লাগবে না।

১৮ নং হাদীস

لَعَنَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اٰكِلَ الرِّبٰوا وَمُوْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ –

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুদ গ্রহীতা, সুদ দাতা, সুদের হিসাব রক্ষক ও সাক্ষীদেরকে লা'নত করেছেন এবং বলেছেন তারা সকলেই অপরাধের ক্ষেত্রে সমান।" (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ মূল অপরাধে সবাই সমান। যদিও পাপের পরিমানে পার্থক্য রয়েছে। লেখক এবং সাক্ষীরা গুনাহগার হওয়ার কারণ, তারা অন্যায় ও পাপের কাজে সাহায্য করেছে। পাপের সহযোগীতা করাও পাপ।

বর্তমানে খুব কম লোকই সুদের প্রভাবমুক্ত আছে। অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছে, এটা যেন সেই যুগ, যেই যুগ সম্পর্কে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ لَيَاْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَايَبْقٰى اَحَدٌ اِلَّا اٰكِلَ الرِّبٰوا فَاِنْ لَمْ يَاْكُلْــــهُ اَصَابَهُ مِنْ بُخَارِهٖ – "নিশ্চয় মানুষের উপর এমন একটি সময় আসবে যখন সুদ খাওয়া থেকে কেহই বাকী থাকবে না। কেউ সুদ না খেলেও অন্তত ঃ সুদের তাপ অর্থাৎ প্রভাব থেকে রেহাই পাবে না।"

সংযোজন ঃ সুদের ভয়াবহতা সম্পর্কে কতিপয় হাদীস ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ✪ কোন সুদখোর যদি এক দিরহাম পরিমানও সুদ আদায় করে তবে তার গুনাহ ৩৬ বার ব্যভিচার করার সমান। (বায়হাকী)

✪ কোন জাতি যখন ব্যভিচার ও সুদে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তখন আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করার অনুমতি দেন। (আবু ইয়ালা, হাকেম)

✪ কোন জাতি যখন কৃপণতা করতে থাকে, সুদের ভিত্তিতে কায়কারবার চালাতে থাকে, ষাড়ের দৌড়ের প্রতিযোগীতা অনুষ্ঠিত করে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ পরিত্যাগ করে তখন আল্লাহ তাআলা তাদের উপর এমন দুর্যোগ নামান যে, তারা দীনের পথে ফিরে না আসা পর্যন্ত তা থেকে আর নিষ্কৃতি পায় না। (আবু দাউদ)

✪ কোন সমাজে সুদের প্রচলন হলে সেখানে পাগলের সংখ্যা বেড়ে যাবে, ব্যভিচারের প্রচলন হলে মৃত্যুর হার বেড়ে যাবে এবং মাপে কম দেয়ার প্রথা চালু হলে আল্লাহ তাআলা সেখানে বৃষ্টি বন্ধ করে দিবেন। এটা অবধারিত। (ইঃ মাঃ, বায়ঃ, হাঃ)

✪ সহীহ বুখারীতে এক দীর্ঘ হাদীসে বর্নিত আছে যে, সুদ খোর মৃত্যুর পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত রক্তে পরিপূর্ণ লাল নদীতে সাঁতার কেটে আযাব ভোগ করতে থাকবে এবং তাকে পাথর গেলানো হতে থাকবে। ঐ নদী হচ্ছে দুনিয়ায় তার উপার্জিত হারাম সম্পদ যার মধ্যে তাকে হাবুডুবু খেতে বাধ্য করা হবে। আর যে আগুনের পাথর তাকে গেলানো হবে তা হলো তার হারাম খাদ্য খাওয়ার শাস্তি। কিয়ামত পর্যন্ত তাকে এই শাস্তি দেয়া হবে এবং সেই সাথে তার উপর অভিশাপ বর্ষিত হতে থাকবে। (কিঃ কাঃ)

✪ চার ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করতে না দেয়া এবং জান্নাতের নিয়ামত ভোগ করতে না দেয়াকে আল্লাহ তাআলা নিজের দায়িত্ব বলে মনে করেন। তারা হলো ঃ মদখোর, সুদখোর, ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাতকারী এবং পিতামাতার প্রতি কর্তব্য পালনে অবহেলাকারী-যতক্ষন না তারা তওবা করে। (কিঃ কাঃ)

১৯ নং হাদীস

اَلرِّبٰوا سَبْعُوْنَ جُزْءً اَيْسَرُهَا اَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ اُمَّهٗ –

রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ"সুদের গুনাহের সত্তরটি শাখা আছে। তম্মধ্যে সর্বনিম্ন শাখাটি আপন মায়ের সংগে যিনা করার সমান।" (মিশকাত)

ব্যাখ্যা ঃ সুদের সর্বনিম্ন পাপের অংশটি আপন মায়ের সংগে যিনার সমতূল্য। বাকী উনসত্তর অংশের হাকীকত সম্পর্কে আল্লাহ তাআলাই ভাল জানেন। গভীর চিন্তার বিষয় যে, কুরআন ও হাদীস শরীফে অন্য কোন গুনাহের ব্যাপারে "মায়ের সংগে ব্যভিচার তূল্য" বলে ধমক আসেনি। একমাত্র সুদের ব্যাপারেই স্বয়ং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ বলেছেন। এর দ্বারাই সুদী লেন-দেনের ভয়াবহ পরিনতির কথা বুঝে নেয়া উচিত। দুঃখ ঐ সব লোকের জন্য, যারা দুনিয়ার তুচ্ছ পুঁজির সন্ধানে পরকাল বিনষ্ট করে চলছে। (আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে শুভ বুদ্ধি দান করুন।) হাদীস শরীফে এসেছে - قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَتَيْتُ لَيْلَةَ اُسْرِىَ بِىْ عَلٰى قَوْمٍ بُطُوْنُهُمْ كَالْبُيُوْتِ فِيْهَا الْحَيَّاتُ تُرٰى مِنْ خَارِجِ بُطُوْنِهِمْ فَقُلْتُ مَنْ هٰؤُلَاءِ يَاجِبْرَئِيْلُ قَالَ هٰؤُلَاءِ اَكَلَةُ الرِّبٰوا

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি মিরাজের রাত্রে একদল লোকের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম, যাদের পেটগুলি ছিল ঘরের মত বড়। বাহির থেকে উহার মধ্যে সর্প দেখা যাচ্ছিল। তখন আমি বললাম ঃ হে জিব্রাঈল ! এই লোক গুলো কারা ? তিনি বললেন, এরা সুদখোর।

সংযোজনঃ সুদ কাকে বলে? ঃ সুদকে আরবীতে 'রিবা' বলা হয়। রিবা শব্দের আভিধানিক অর্থ অতিরিক্ত। কুরআনের পরিভাষায় 'রিবা' শব্দ দ্বারা ঐ অতিরিক্তকে বুঝানো হয়েছে, যার বিপরীতে কোন সম্পদ নেই; বরং মেয়াদ আছে। অর্থাৎ যে ঋন কোন মুনাফা টানে, তা-ই 'রিবা'।

বিখ্যাত তাফসীরবিদ ইবনে জারীর (রহঃ) মুজাহিদ (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন ঃ "জাহেলিয়াত আমলে প্রচলিত এবং কুরাআনে নিষিদ্ধ রিবা হল - কাউকে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্যে ঋন দিয়ে মূলধনের অতিরিক্ত নির্দিষ্ট পরিমান অর্থ গ্রহন করা।"

আরবরা তাই করতো এবং নির্দিষ্ট মেয়াদে ঋন পরিশোধ করতে না পারলে সুদ বাড়িয়ে দেয়ার শর্তে মেয়াদ বাড়িয়ে দেয়া হতো। তবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েক রকম ক্রয়-বিক্রয়কেও রিবার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আরবরা এগুলোকে রিবা মনে করতো না। উদাহরণতঃ তিনি ছয়টি বস্তু সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছেন যে, এগুলো অদল-বদল করতে হলে সমান সমান এবং নগদে হওয়া দরকার। কম-বেশী কিংবা বাকী হলে তাও রিবা হবে। এ ছয়টি বস্তু হচ্ছে সোনা, রূপা, গম, যব, খেজুর ও আঙ্গুর। এই ছয়টি বস্তুর উপর কেয়াছ করে ইমামে আ'যম আবু হানীফা (রহঃ) বলেন ঃ যত জিনিস পরিমাপের ভিত্তিতে লেন-দেন করা হয়, তত জিনিসের বিনিময় হওয়া আবশ্যকীয়। বিনিময় ছাড়া অতিরিক্ত লেন-দেন করা হলে তা হবে সুদ।

ইমাম জাস্‌সাস (রহঃ) থেকে বর্নিত আছে রিবা দু'রকম। একটি ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে এবং অপরটি ক্রয়-বিক্রয় ছাড়া।

সুদ তো অবশ্যই বর্জন করতে হবে, তদুপরি যে সব ব্যাপারে সুদের সন্দেহ হয়, সেগুলোও পরিহার করা উচিত। হযরত ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বলেন ঃ কোন ব্যক্তির কাছে যদি তোমার কোন ঋন প্রাপ্য থেকে থাকে এবং সে কোন উপহার পাঠায় তবে তা গ্রহণ করোনা। কেননা, সেটা সুদ। (কিঃ কাঃ) হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন ঃ তোমার কাছে যে ঋনগ্রস্ত তার কাছ থেকে যদি তুমি কিছু খাও তবে তা সুদ। (কিঃ কাঃ)

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ঋন থেকে কোন লাভ পাওয়া যায় তা সুদ। (কিঃ কাঃ)

কুরআনে করীমে সুদের নিন্দা ঃ কুরআনে করীমে সুদের নিন্দা করে বলা হয়েছে - "যারা সুদ খায় তারা (কিয়ামতে) উত্থিত হবে ঐ ব্যক্তির মত, যাকে শয়তান আছর করে দিশেহারা করে দেয়।" (বাকারা - ২৭৫) "আল্লাহ তাআলা সুদকে নিশ্চিহ্নকরেন এবং দান-খয়রাতকে বর্ধিত করেন।" (বাকারা - ২৭৬) "অতএব যদি তোমরা সুদ পরিত্যাগ না কর, তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সাথে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে যাও।" (বাকারা - ২৭৯)

— ৬

ইমাম কাতাদা (রহঃ) বলেন ঃ সুদখোর কিয়ামতের দিন উম্মাদ অবস্থায় উঠবে। এই উম্মাদ অবস্থা সুদখোরীর আলামত হিসাবে কিয়ামতের মাঠে সকলের কাছে পরিচিত থাকবে। (কিঃ কাঃ)

সুদখোরী ও তার শাস্তির মাঝে সামঞ্জস্যশীলতা ঃ আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যে শাস্তি কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায়কে কোন অপরাধের কারণে দেয়া হয়, তার সাথে অপরাধের অবশ্যই মিল থাকে। হাশরে সুদখোরদেরকে মাতাল অবস্থায় উথিত করার মধ্যে সম্ভবতঃ এ বিষয়ের প্রতি ইংগিত রয়েছে যে, সুদখোর টাকা-পয়সার লালসায় এমন বিভোর হয়ে পড়ে যে, কোন দরিদ্রের প্রতি তার মনে সামান্য দয়ারও উদ্রেক হয় না এবং লজ্জা-শরম তাকে বাধা দিতে পারে না। সে প্রকৃতপক্ষে জীবদ্দশায়ও অজ্ঞানই ছিল। তাই হাশরেও তাকে এ অবস্থায়ই উঠানো হবে।

কুরআনে সুদের সাথে দান-খয়রাতকে উল্লেখ করার কারণ ঃ সুদের সাথে দান-খয়রাতকে উল্লেখ করার পেছনে একটি বিশেষ সামঞ্জস্য রয়েছে। সদকা ও খয়রাতে কোনরূপ বিনিময় ছাড়াই নিজ অর্থ-সম্পদ অপরকে দেয়া হয় এবং সুদে কোনরূপ বিনিময় ছাড়াই অপরের অর্থ-সম্পদ নিয়ে নেয়া হয়। এ দুটি কাজ যারা করে, তাদের নিয়ত ও উদ্দেশ্য পরস্পর বিপরীতমুখী। এর কারণ এই যে, দান-খয়রাতকারী ব্যক্তি শুধু আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ও সওয়াবের জন্যে স্বীয় অর্থ-সম্পদ হ্রাস কিংবা নিঃশেষ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। পক্ষান্তরে, সুদ গ্রহনকারী ব্যক্তি তার বর্তমান অর্থ-সম্পদকে অবৈধভাবে বৃদ্ধি করার উদগ্র বাসনা পোষন করে থাকে। উভয়ের মাঝে বিপরীতমুখী হাকীকত ও নিয়ত বিদ্যমান থাকার কারণে বিপরীতমুখী পরিনতি হওয়াই স্বাভাবিক। তাই সুদকে নিশ্চিহ্ন এবং দান খয়রাতকে বৃদ্ধি করার কথা বলা হয়েছে।

সুদকে মেটানো এবং দান-খয়রাতকে বাড়ানোর অর্থ ঃ সুদকে মেটানো এবং দান-খয়রাতকে বাড়ানো পরকালে তো হবেই; কিন্তু এর কিছু কিছু লক্ষন দুনিয়াতেও প্রত্যক্ষ করা যায়। সুদমিশ্রিত সম্পদ তো অধিকাংশ সময় ধ্বংস হয়-ই, অধিকন্তু আগে যা ছিল তাও সাথে নিয়ে যায়। অবশ্য সুদবিহীন ব্যবসা-বানিজ্যেও লোকসানের সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু গতকাল যে ছিল কোটিপতি সে আজ পথের ভিখারী - এমন ক্ষতি শুধু সুদ ও জুয়ার ক্ষেত্রেই দেখা যায়। প্রায়ই কোন না কোন বিপর্যয়ের মুখে তা ধ্বংস হয়ে যায়। হযরত মা'মার (রহঃ) বলেন ঃ আমি বুযর্গদের মুখে শুনেছি, চল্লিশ বছর যেতে না যেতেই সুদখোরের ধন-সম্পদে ভাটা আরম্ভ হয়ে যায়। যদি বাহ্যিক দৃষ্টিতে ধন-সম্পদের ধ্বংস দেখা নাও যায়, তবুও তার উপকারিতা, বরকত ও ফলাফল থেকে বঞ্চনা নিশ্চিত ও অবশ্যম্ভাবী। উপকারিতা ও বরকত বলতে আমরা বুঝি, ধন-সম্পদের সাহায্যে মানুষ সুখী ও সম্মানজনক জীবন যাপন করতে সক্ষম হওয়া। আপনি পরীক্ষা করলে

প্রত্যক্ষভাবে বুঝতে পারবেন যে, সুদ খোরের ধন-সম্পদ যদিও ক্রমবর্ধিষ্ণু দেখা যায়, কিন্তু এ বর্ধিষ্ণুতা পান্ডুরোগীর দেহ ফুলে মোটা হয়ে যাওয়ারই মত।

সুদ খোরেরা প্রকৃত আরাম-আয়েশ থেকে বঞ্চিত ঃ এখানে হয়তো কারো মনে সন্দেহ দেখা দিতে পারে যে, আজকাল তো সুদ খোরদেরই আধিপত্য বেশী। সম্মান, আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসের যাবতীয় সামগ্রী তাদেরই হাতের মুঠোয়।

কিন্তু চিন্তা করলে প্রত্যেকেই বুঝতে পারবে যে, আরামের সাজ-সরঞ্জাম তো কারখানায় নির্মিত হয় এবং তা বাজারে ও বিক্রি হয়। স্বর্ন-রৌপ্যের বিনিময়ে তা অর্জন ও করা যায়। কিন্তু যার নাম আরাম ও শান্তি তা কোন কারখানায় নির্মিত হয় না এবং বাজারেও বিক্রি হয় না; বরং তা এমন একটি রহমত, যা সরাসরি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকেই আসে। অনেক সময় বিস্তর সরঞ্জাম থাকা সত্বেও তা অর্জিত হয় না। মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্রের কথা শোনা যায় যে, সেখানে শতকরা প্রায় পঁচাত্তর জন মানুষ ঘুমের বড়ি ব্যবহার না করে ঘুমোতেই পারে না এবং মাঝে মাঝে বড়িও তাদের ঘুম আনতে ব্যর্থ হয়। একটি নিদ্রাসুখের অবস্থা যখন এই হলো, অন্যান্য আরাম ও সুখের অবস্থা কি হবে, তা সহজেই অনুমান করা যায়।

অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, সুদের ধন-সম্পদ সুদখোরের ভবিষ্যত বংশধরদের জীবনকেও সুখময় করে না। হয় তারা ধ্বংস হয়ে যায়, না হয় এর অমঙ্গলে তারাও ধন-সম্পদের সত্যিকার ফলাফল থেকে বঞ্চিত হয়।

সুদ থেকে বাঁচার উপায় অবশ্যই রয়েছে ঃ বর্তমান যুগে সুদই হচ্ছে কাজ-কারবারের প্রধান অবলম্বন। সারা বিশ্বের ব্যবসা-বানিজ্য সুদের উপরই চলছে। বর্তমান যুগে ব্যাংকের সাথে সম্পর্ক বর্জন করার অর্থ ব্যবসায়ের তল্পীতল্পা গুটানো। এ থেকে মুক্তি লাভের উপায় কি ?

এর জবাব এই যে, কোন রোগ যখন ব্যাপক হয়ে মহামারী আকার ধারণ করে তখন তার চিকিৎসা কঠিন অবশ্যই হয়, কিন্তু নিষ্ফল কখনো হয় না। নিষ্ঠার সাথে যে কোন সংশোধন প্রচেষ্টাই পরিনামে সফল হয়। তবে এ জন্যে ধৈর্য, দৃঢ়তা এবং সাহসিকতার একান্ত প্রয়োজন। কুরআনে বলা হয়েছে ঃ "আল্লাহ তাআলা ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের কোন রূপ সংকীর্নতায় ফেলেননি।" তাই সুদ থেকে বেঁচে থাকার জন্যে এমন কোন কার্যকর ও ফলপ্রসূ পথ অবশ্যই রয়েছে, যাতে অর্থনৈতিক ক্ষতিও নেই, আভ্যন্তরীন ও বহির্বানিজ্যের দ্বারও রুদ্ধ হয় না এবং সুদ থেকেও মুক্তি পাওয়া যায়। শরীঅতের নিয়ম অনুযায়ী ব্যাংক পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে ইন্‌শাআল্লাহ সমগ্র বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করবে যে, এতে মানব জাতির কিরূপ মঙ্গল সাধিত হতে পারে।

২০ নং হাদীস ঃ

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ إِلٰى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلٰكِنْ يَنْظُرُ إِلٰى قُلُوْبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ

রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তোমাদের রং-রূপ এবং ধন-সম্পদ দেখেন না। দেখেন তোমাদের মন এবং কর্ম।" (মুসলিম) অর্থাৎ সচ্ছ মন ও বিশুদ্ধ নিয়ত ছাড়া বাহ্যিক পরিপাটির কোনই মূল্য নেই।

সংযোজন ঃ আত্মশুদ্ধির আবশ্যকতা ঃ যেই আমল শুধু বাহ্যিক দৃষ্টিতে ভাল ও সুন্দর মনে হয় কিন্তু ইখ্লাস তথা বিশুদ্ধ নিয়ত ও আন্তরিকতা শুন্য হয়, এমন আমল আল্লাহ্ তাআলা কবুল করেন না। যেমন, কেহ বাহ্যতঃ ইবাদতে মশগুল থাকল, কিন্তু তার অন্তর হলো অবহেলায় পরিপূর্ণ। তার অন্তরে এ তারতম্যটুকু নেই যে, সে আল্লাহ্র সামনে দাঁড়িয়েছে, না অন্য কোন কাজ করছে - এমন আমল আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। উক্ত হাদীসের উদ্দেশ্য এ নয় যে, যাহেরী আমলের একেবারে কোন মূল্যই নেই; বরং মূল্য তো অবশ্যই রয়েছে, তবে ইখ্লাস ও আন্তরিকতা থাকার শর্তে। কেননা, অন্তর হলো আল্লাহ পাকের বিশেষ লক্ষ্যবস্তু। যেমনিভাবে চিকিৎসাশাস্ত্রে দেহের রাজা হিসাবে উহার মর্যাদা রয়েছে, তেমনিভাবে আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেও সকল অঙ্গ-প্রতঙ্গের রাজারূপে উহার গৌরব রয়েছে। যতক্ষন পর্যন্ত উহার অবস্থা বিশুদ্ধ না হবে, ততক্ষন পর্যন্ত সফলতা ও মুক্তির কোন ব্যবস্থা অর্জিত হতে পারে না। যেমন, কেহ বাহ্যতঃ মুসলমান হলো, কিন্তু অন্তরে তার ইসলাম নেই, এমন ব্যক্তির ইসলামের কোন মূল্যই মহান আল্লাহর দরবারে নেই। এমনিভাবে লোক দেখানো কিংবা অন্য কোন ভ্রান্ত উদ্দেশ্যে কেহ নামায, সদকা ইত্যাদি করল, তাতে যদিও সে ফরয আদায়ের দায়িত্ব থেকে রেহাই পেয়ে যাবে; কিন্তু পূর্ণ সওয়াব সে কিছুতেই পাবে না। বরং লোক দেখানোর কারণে সে গুনাহ্গার সাব্যস্ত হবে। অতএব, বুঝা গেল যে, উভয়জগতের সফলতা এবং মহান আল্লাহর নিকট গ্রহযোগ্যতা একমাত্র আত্মশুদ্ধির উপর নির্ভরশীল। কিন্তু বর্তমানে প্রায় সকল মানুষ এ ব্যাপারে খুবই সিথিলতা প্রদর্শন করছে। যাহেরী আমল এবং উহার ইল্ম অর্জন তো কম-বেশী করে থাকে; কিন্তু আত্মিক সংশোধনের ফিকির মোটেও নেই । কেমন যেন রিয়া ও হিংসা-বিদ্বেষ ইত্যাদি আত্মিক রোগের চিকিৎসার কোন প্রয়োজনীয়তাই মানুষ অনুভব করছে না। কেবল যাহেরী আমলকেই নাজাতের জন্য যথেষ্ট মনে করছে। অথচ যাহেরী আমল অত্যাবশ্যকীয় হলেও অন্তরের সংশোধন হলো মুখ্য উদ্দেশ্য। অবশ্য যাহের ও বাতেন উভয়ের মাঝে কুদরতীভাবে এমন নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে যে, যাহেরী অবস্থা বিশুদ্ধ না হলে বাতেনী অবস্থাও বিশুদ্ধ হয় না এবং যাহেরী আমলের উপর পাবন্দী এবং স্থায়িত্ব না হলে বাতেনী সংশোধনও স্থায়ী থাকে না। আর যখন বতেনী অবস্থা বিশুদ্ধ হয়ে যায়, তখনই যাহেরী আমল খুব ভালরূপে পালিত হতে থাকে।

যাহেরী আমল নিষ্প্রয়োজন হওয়ার আকীদা রাখা কুফরী ঃ উপরোক্ত বক্তব্যের কারণে কোন নির্বোধ যেন এ-সন্দেহে পতিত না হয় যে, যাহেরী আমল কেবল ততক্ষনই দরকার, যতক্ষন পর্যন্ত অন্তরের অবস্থা বিশুদ্ধ না হয়-অন্তর ঠিক হয়ে গেলে যাহেরী আমলের আর কোন প্রয়োজন থাকে না। এরূপ আকীদা রাখা বাতিল এবং কুফরী। কারণ, যথাসাধ্য সার্বক্ষনিকভাবে ইবাদতে লিপ্ত থাকাই অন্তর ঠিক হওয়ার দাবী ও নিদর্শন। কেননা, আত্মশুদ্ধির উদ্দেশ্যই হলো, আল্লাহর আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতা আদায়ের যোগ্যতা অর্জন করা এবং তাঁর নাফরমানী ও না-শুক্রী থেকে বাঁচার শক্তি সঞ্চয় করা। যদি ইবাদতই ছেড়ে দিল তাহলে অন্তর ঠিক রইলো কোথায় ? অন্তর ঠিক থাকলে তো আউলিয়া এবং আম্বিয়ায়ে কেরাম (আঃ) এর ন্যায় নিশ্চয় ইবাদতে মশগুল থাকত। নাঊযু বিল্লাহ ! কারো অন্তর কি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অন্তর অপেক্ষা অধিক পূতঃপবিত্র হতে পারে ? তিনি তো সৃষ্টিকুল সেরা হওয়া সত্ত্বেও সারাজীবন ইবাদত করে গেছেন। তাঁর ইবাদতের কষ্ট দেখে অন্যদের মনে দয়ার সঞ্চার হতো। সুতরাং বুঝা গেল, যেমনিভাবে যাহেরী আমলসমূহ-নামায, রোযা ইত্যাদি পালন করা এবং তা পালন করার বিধিমালা জানা ও সে মতে আমল করা ফরয, ঠিক তেমনিভাবে নামায, রোযা ইত্যাদিকে রিয়া মুক্ত রাখা ও হিংসা-বিদ্বেষ, ক্রোধ ও কিবির ইত্যাদি থেকে অন্তর কে পবিত্র রাখা এবং তা পালন করার পদ্ধতি জানাও ফরয। হাদীস শরীফে আছে ঃ " এমন পরহেযগার ব্যক্তির দুই রাক্আত নামায যিনি (হারাম থেকে বেঁচে থাকার সাথে সাথে) সংশয়ের বিষয় থেকেও বেঁচে থাকেন, ঐ ব্যক্তির হাযার রাক্আত নামায অপেক্ষা উত্তম, যে সংশয়ের বিষয় থেকে বেঁচে থাকে না।" এ মর্যাদা তো আত্মশুদ্ধি ব্যতিরেকে হাসিল হওয়া অসম্ভব। যে ব্যক্তির অন্তর রোগমুক্ত নয় সে তো পুর্নরূপে ফরয, ওয়াজিবকেই আদায় করতে এবং হারাম থেকে বেঁচে থাকতে সক্ষম নয়; সংশয়ের বিষয় থেকে বাঁচতে পারে কিভাবে ? তাক্ওয়া এবং আত্মশুদ্ধির সংগে যে ইবাদত করা হয়, তা অল্প হলেও আল্লাহর নিকট গ্রহন যোগ্য হয়। তাই মুসলমানদের জন্য কর্তব্য হলো, পরিপূর্ণরূপে যাহের ও বাতেন এর সংশোধন করে নেয়া। ইহাই মুক্তির পথ। আত্মশুদ্ধি ব্যতিরেকে শুধু যাহেরী আমলকে নাজাতের জন্য যথেষ্ট মনে করা উচিত নয়।

ক্ষুধার তাড়নাসহ নামায পড়া মাকরূহ হওয়ার রহস্য ও হুজুরে কল্ব এর গুরুত্ব ঃ ক্ষুধার তাড়নায় মন অস্থির থাকাকালীন নামায পড়া শরীঅতে মাকরূপ। নামাযের সময় চলে না যাওয়ার শর্তে প্রথমে খাবার খেয়ে নিবে, পরে নামায আদায় করবে। এর পেছনে রহস্য এই যে, ইবাদতের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, একযোগে দেহ ও মনকে আল্লাহর সামনে হাজির করে তাঁর দাসত্ব প্রকাশ করা এবং গায়রুল্লাহ্র দিকে যথাসম্ভব মন ধাবিত না হওয়া। অধিক ক্ষুধার সময় যদিও দেহ নামাযে থাকে; কিন্তু মন

থাকে খাওয়ার জন্য পেরেশান। সুতরাং আল্লাহর সামনে পরিপূর্ণরূপে হাজেরী দেয়া সম্ভব হয় না বিধায়, এমতাবস্থায় নামাযকে মাকরূহ বলা হয়েছে। এ থেকে বুঝা গেল, আল্লাহ তাআলার আসল লক্ষ্যবস্তু হলো অন্তর। এর সংশোধনের জন্য শরীঅত বিশেষ ভাবে গুরুত্বারোপ করেছে। বুযর্গানে দ্বীন আত্মশুদ্ধির জন্য বছরের পর বছর সাধনা করেছেন। অপর একটি হাদীসে আছে ঃ "মধ্যম অবস্থার দু' রাকআত নামায, গাফেল অন্তর নিয়ে সারা রাত নামায পড়া অপেক্ষা উত্তম।" অর্থাৎ যেই দুই রাক্আত নামাযে ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নত সমূহ হুজুরে কল্‌ব তথা মনযোগের সাথে আদায় করা হয়েছে এবং কিরাআত ইত্যাদিকে দীর্ঘায়িত করা হয়নি-এমন দুই রাক্আত নামায, মনের গাফিলতি নিয়ে রাতভর নামায পড়া অপেক্ষা অতি উত্তম এবং আল্লাহর কাছে প্রিয়। প্রকৃত ব্যাপার হলো, কাজের গুনগত মান লক্ষ্যনীয় বিষয়, পরিমানের আধিক্য নয়। ভালমানের অল্প আমল আল্লাহর নিকট প্রিয়; কিন্তু গুনগতমানবিহীন বেশী আমল তাঁর কাছে প্রিয় নয়।

দামী ও বেদামী হওয়ার মাপকাঠি ঃ ইসলামে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে পার্থক্য নেই, যারা মানুষ হওয়া সত্ত্বেও মনুষত্ব কাকে বলে-তা জানে না ; তাদের মতে জীবনের লক্ষ্যবস্তু হলো পানাহার, নিদ্রা-জাগরণ ও ভোগ-বিলাস ইত্যাদি। তাই তারা মনে করে, যার কাছে পানাহার ও ভোগ-বিলাস সামগ্রীর প্রাচুর্য রয়েছে, সে-ই সফলকাম, সম্ভ্রান্ত, ভদ্র ও দামী এবং যার কাছে এসব বস্তু স্বল্পমাত্রায় আছে, সে বেদামী ও নিগৃহীত; কিন্তু জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের মতে সংশোধিত জীবনই মানুষের সর্ববৃহৎ কৃতিত্ব ও সাফল্য। এ বিশ্বাস ও ভাবধারা অনুযায়ী ভদ্রতা ও অভদ্রতা, সম্মান ও অপমানের মাপকাঠি অধিক পানাহার কিংবা অধিক ধন-সম্পদ সঞ্চয় করা নয়; বরং সচ্চরিত্র ও সৎকর্মই হবে আভিজাত্যের একমাত্র মাপকাঠি। চাই, ধন-দৌলতের প্রাচুর্য থাকুক বা না থাকুক। একবার কতিপয় কাফের কোরায়শ সর্দার এসে নবীজির চাচা আবু তালিবকে বলল ঃ আপনার ভ্রাতুস্পুত্র মুহাম্মদের কথা মেনে নিতে আমাদের সামনে একটি বাঁধা এই যে, তাঁর চার পাশে সর্বদা এমন লোকদের ভীড় লেগে থাকে, যারা হয় আমাদের কৃতদাশ ছিল- যাদের আমরা মুক্ত করে দিয়েছি, না হয় আমাদেরই দান-দক্ষিনায় যারা লালিত পালিত। এমন নীচ লোকদের উপস্থিতিতে আমরা তাঁর মজলিসে যোগদান করতে পারি না। আপনি তাঁকে বলে দিন, যদি আমাদের আসার সময় সে তাদেরকে মজলিস থেকে সরিয়ে দেয়, তবে আমরা তার কথা নিয়ে বিবেচনা করতে সম্মত আছি।

আবু তালিব মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে একথা জানিয়ে দিলে হযরত উমর (রাযিঃ) মত প্রকাশ করে বললেন ঃ এতে অসুবিধা কি ? আপনি কিছুদিন তাই করে দেখুন। এর পরিপ্রেক্ষিতে কুরআনের আয়াত নাযিল হয় এবং এ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে কঠোর ভাষায় নিষেধ করা হয়।

দুনিয়ার সম্পদ ও সম্মানের উপর অহংকার করার পরিণতি ঃ দুনিয়ার ধন-সম্পদ ও মান-সম্মানের উপর নির্ভর করে অহংকার করা এবং দরিদ্র লোকদের প্রতি উপহাস করার পরিনতি কেয়ামতের দিন চোখের সামনে ভেসে উঠবে। হযরত আলী (রাযিঃ) থেকে বর্নিত ঃ যে ব্যক্তি কোন মুমিন স্ত্রী বা পুরুষকে তার দরিদ্রতার জন্যে উপহাস করে, আল্লাহ তাআলা তাকে কেয়ামতের দিন সমস্ত উম্মতের সামনে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুমিন স্ত্রী বা পুরুষের উপর এমন অপবাদ আরোপ করবে, যে দোষে সে দোষী নয়, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে একটি উঁচু অগ্নিকুন্ডের উপর দাঁড় করাবেন; সে তার মিথ্যার স্বীকারোক্তি না করা পর্যন্ত তাতেই তাকে রাখা হবে।

বুদ্ধিমান কে? ঃ বুদ্ধিমান তাকেই বলে, যে দুনিয়ার ঝামেলায় কম মগ্ন থাকে এবং পরকালের চিন্তা বেশী করে ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেনঃ যদি কেউ মৃত্যুকালে ওসিয়ত করে যায় যে, তার ধন-সম্পদ ও সহায়-সম্পত্তি যেন সর্বাধিক বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে দান করা হয়, তবে এই ধন-সম্পদের শরীঅত সম্মত প্রাপক হবে সেসব লোক, যারা আল্লাহ্ তাআলার ইবাদত ও আনুগত্যে লিপ্ত রয়েছেন। কেননা, বুদ্ধির দাবী এটাই এবং দুনিয়াবাসীদের মধ্যে সর্বাধিক বুদ্ধিমান তারাই। এই মাস্‌আলা হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ কিতাব দুর্‌রে মুখ্‌তারেও উল্লেখিত আছে।

দু'টি মানসিক ব্যাধি ও তার প্রতিকার ঃ সম্পদপ্রীতি এবং যশ-খ্যাতির মোহ এমন ধরনের দুটি মানসিক ব্যাধি, যদ্দরূন ইহলৌকিক ও পারলৌকিক-উভয় জীবনই নিষ্প্রভ ও অসার হয়ে পড়ে। গভীর ভাবে চিন্তা করলে বুঝা যাবে যে, মানবেতিহাসে এ যাবত যতগুলো মানবতা বিধ্বংসী যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে এবং যত বিশৃংখলা ও অশান্তি বিস্তার লাভ করেছে, সে গুলোর উৎপত্তিই হয়েছিল এ-দু'টি ব্যাধি থেকে। এ-দু'টি ব্যাধির প্রতিকার কুরআন পাকে এভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে- "তোমরা ধৈর্য্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর।" অর্থাৎ ধৈর্য্য ধারন করে ভোগ-বিলাস ও প্রবৃত্তির কামনা-বাসনাকে বশীভুত করে ফেল। তাতে সম্পদপ্রীতি হ্রাস পাবে। আর নামায দ্বারা যশ-খ্যাতির আকর্ষন দমে যাবে। কারণ, নামাযের মধ্যে আভ্যন্তরীন ও বাহ্যিক-সব ধরনের বিনয় ও নম্রতা বিদ্যমান রয়েছে। যখন যথানিয়মে নামায আদায় করার অভ্যাস গড়ে উঠবে, তখন আল্লাহ্ পাকের সামনে নিজের অক্ষমতা ও ক্ষুদ্রতার ধারণা অন্তরে বিরাজ করতে থাকবে। ফলে, অহংকার, আত্মম্ভরিতা ও মান-মর্যাদার মোহ হ্রাস পাবে।

২১ নং হাদীস

مَنْ دَلَّ عَلٰى خَيْرٍ فَلَهٗ مِثْلُ اَجْرِ فَاعِلِهٖ –

রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ"যে ব্যক্তি কোন সৎকর্মের প্রতি পথ দেখাবে, তার উপর আমলকারীর সমান সওয়াব সেও পাবে।" (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ যেমন, কেউ কাউকে নামায শিক্ষা দিল। শিক্ষাকারী ব্যক্তি যতদিন পর্যন্ত যত নামায পড়বে, তত নামাযের সওয়াব শিক্ষাদাতা ব্যক্তিও পাবে। অথবা কেহ কারো নিকট সুপারিশ করে গরীবের জন্য কিছু দান করালো। এতে দানকারীর সমান সওয়াব সুপারিশকারীও পাবে। এমনিভাবে নির্দেশিত প্রত্যেক নেক কাজের মধ্যে উভয়েই সমান সওয়াব পাবে। কারো সওয়াবে কোন প্রকার ঘাটতি হবে না। যেমন এক বর্ণনায় এসেছে ঃ (কাউকে) কোন সৎ কথা বলে দিলে কিংবা হাঁসিমুখে মুসলমান ভাইয়ের সাক্ষাত করলে - তাতেও সদকার সওয়াব পাওয়া যাবে।

২২ নং হাদীস

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ -

রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর জন্য ইল্‌ম অন্বেষন করা ফরয।" (ইবনে মাজা)

ব্যাখ্যা ঃ এখানে ইল্‌ম দ্বারা দ্বীনের জরুরী বিষয়াদী সম্পর্কীয় ইল্‌মকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ যেই অবস্থায় দ্বীনের যেই বিষয়ের ইল্‌ম হাসিল করা দরকার, তখন সেই বিষয়ের ইল্‌ম অন্বেষন করা ফরয। যেমন আল্লাহ ও তাঁর গুনাবলী সম্পর্কে জানা, নবুওয়াত ও রিসালাতের বিষয় জানা, রোযা, নামায, হজ্ব, যাকাত, হায়জ ও নিফাসের আহকাম এবং বেচা-কেনার মাসাইল ইত্যাদির ইল্‌ম হাসিল করা। এককথায়, যে সব বিষয় ছাড়া ঈমান শুদ্ধ হয় না তা জানা।

সংযোজন ঃ দ্বীনী ইল্‌মের মর্যাদা ঃ দ্বীনি ইল্‌মের ফযীলত ও সওয়াব সম্পর্কে বহু হাদীস রয়েছে। এখানে অল্প কয়েকটি হাদীস পেশ করা গেল ঃ

⦿ জনৈক সাহাবী নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন ঃ বনী-ইস্‌রাঈলের দু'জন লোক ছিলেন, যাদের একজন ছিলেন আলেম। তিনি শুধু নামায এবং লোকদের দ্বীনি তালীম দানে ব্যস্ত থাকতেন। অপরজন সারাদিন রোযা রাখতেন এবং সারারাত ইবাদতে নিয়োজিত থাকতেন। এ-দু'জনের মধ্যে কার ফযীলত বেশী ? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ সেই আলেমের মর্যাদা আবেদের উপর এমন, যেমন আমার মর্যাদা তোমাদের সাধারণ মানুষের উপর। (দারেমী)

⦿ শয়তানের মোকাবেলায় একজন ফকীহ আলেম, এক হাজার আবেদের চাইতেও শক্তিশালী এবং ভারী। (তিরমিযী, ইবনে মাজা)

⦿ যে ব্যক্তি ইল্‌মে দ্বীনের তালাশে কোন রাস্তায় চলতে আরম্ভ করে (ঘর থেকে বের হয়) আল্লাহ তার জন্য বেহেশ্‌তের রাস্তা সহজ করেদেন। তালিবে ইল্‌মের সন্তুষ্টির জন্য ফেরেশ্‌তাগণ স্বীয় ডানা বিছিয়ে দেন। খাঁটি আলেমের জন্য আসমান ও যমীনবাসীরা

দোয়ায়ে মাগফিরাত করে। এমনকি পানির মাছও তাদের জন্য দোয়া করে। আলেমের মর্যাদা আবেদের উপর এমন, যেমন পূর্নিমার চন্দ্রের মর্যাদা সমস্ত তারকার উপর। নিশ্চয় আলেমগণ নবীগনের ওয়ারিস। নবীগণ মীরাস হিসাবে কোন দিরহাম দীনার- সোনা রূপা রেখে যাননি। রেখে গেছেন শুধু ইল্‌ম। কাজেই যে ইল্‌ম হাসিল করল সে অনেক বড় দৌলত হাসিল করল। (মিশকাত)

⦿ রাত্রে কিছু সময় ইল্‌ম চর্চা করা সারা রাতের ইবাদত অপেক্ষা উত্তম। (দারেমী)

⦿ ওয়ায়েল বা ধ্বংস তার জন্য, যে ইল্‌ম হাসিল করে নাই। (কানযুল উম্মাল)

⦿ যেই আলেম স্বীয় ইল্‌ম অনুযায়ী আমল করবে, আল্লাহ তাকে এমন ইল্‌ম দান করবেন, যা সে জানে না। (হিলইয়াতুল আউলিয়া-বেঃ জেঃ ১ম খন্ড)

⦿ আলেমের চেহারা দেখা ইবাদত। (দায়লামী-বেঃজেঃ ১ম খন্ড)

⦿ নিশ্চয় যদি আলেম স্বীয় ইল্‌মের দ্বারা একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের ইচ্ছা পোষন করে, তাকে সকল বস্তু ভয় করবে। (মুখ্‌তাছার-বেঃ জেঃ ১ম খন্ড)

⦿ যদি আলেমগন পরকালে আল্লাহর ওলী না হন, তবে অন্য কেহই আল্লাহর ওলী হতে পারে না। (সাখাভী-বেঃ জেঃ ১ম খন্ড)

⦿ আমার উম্মতের মধ্যে দুই শ্রেণীর লোক রয়েছে যারা ঠিক হয়ে গেলে সকল মানুষ ঠিক হয়ে যায় এবং যারা বিগড়ে গেলে সকল মানুষ বিগড়ে যায়। তাদের এক শ্রেণী হচ্ছে শাসক এবং অপর শ্রেণী ফেকাহবিদ অর্থাৎ দ্বীনী ইল্‌মে সমৃদ্ধ ব্যক্তিবর্গ। (এহ্‌ইয়াউ উলূমিদ্দীন)

⦿ কিয়ামতের দিন তিন শ্রেণীর লোক সুপারিশ করবে-পয়গম্বরগণ, অতঃপর আলেমগণ, অতঃপর শহীদগণ। (এহঃ উঃ)

⦿ একজন ফকীহ আলেম শয়তানের জন্য হাজার আবেদ অপেক্ষা কঠোর হয়ে থাকে। প্রত্যেক বস্তুর একটি স্তম্ভ আছে। এ দ্বীনের স্তম্ভ হচ্ছে ফেকাহ (দ্বীনী জ্ঞান)। (এহঃ উঃ)

⦿ তোমরা এমন এক যুগে রয়েছ, যখন আলেমের (জ্ঞানী ব্যক্তির) সংখ্যা বেশী এবং বক্তার সংখ্যা কম। ভিক্ষুকের সংখ্যা অল্প এবং দাতার সংখ্যা অধিক। এমন যুগে ইল্‌ম হাসিল করা অপেক্ষা আমল করা উত্তম। অতিসত্বর এমন যুগ আসবে, যখন আলেমের সংখ্যা হ্রাস পাবে এবং বক্তা হবে অধিক। দাতা কম হবে এবং ভিক্ষুক বেশী হবে। তখন ইল্‌ম অর্জন হবে আমল অপেক্ষা উত্তম। (এহঃ উঃ)

⦿ কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা বান্দাদেরকে উঠাবেন। অতঃপর আলেমগণকে উঠাবেন এবং তাদেরকে বলবেন ঃ হে আলেমগণ ! আমি তোমাদের মধ্যে যে ইল্‌ম রেখেছিলাম, তা তোমাদেরকে কিছু জেনেই রেখেছিলাম। আমি তোমাদের মধ্যে আমার ইল্‌ম এজন্যে রাখিনি যে, তোমাদেরকে শাস্তি দেব। যাও, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করলাম। (এহঃ উঃ)

◉ সাহাবীগণ আরজ করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ ! কোন্ আমলটি উত্তম ? তিনি বললেন : আল্লাহ পাক সম্পর্কিত জ্ঞান। সাহাবীগণ আরজ করলেন : আমরা উত্তম আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছি। তিনি বললেন : আল্লাহ পাক সম্পর্কিত জ্ঞান। আবার বলা হলো : আমরা আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছি, আপনি ইল্‌ম সম্পর্কে বলছেন। তিনি বললেন : ইল্‌মের সমন্বয়ে অল্প আমল উপকারী হয় এবং মূর্খতার সমন্বয়ে অধিক আমলও নিষ্ফল হয়ে যায়। (এহ্‌ঃ উঃ)

দ্বীনী ইল্‌ম দুই প্রকার তথা ফরযে আইন ও ফরযে কেফায়া হওয়ার বিবরণঃ

উপরোক্ত সকল হাদীসে উল্লেখিত ইল্‌ম শব্দের অর্থ দ্বীনের ইল্‌ম। তবে অন্যান্য বিষয়ের মত দুনিয়ার জ্ঞান-বিজ্ঞানও মানুষের জন্য জরুরী। কিন্তু হাদীসসমূহে সে সবের ফযীলত বর্নিত হয়নি। অতঃপর দ্বীনী ইল্‌ম বলতে একটি মাত্র বিষয়ই বোঝায় না। বরং তা বহু বিষয়ের উপর পরিব্যপ্ত। কাজেই প্রত্যেক মুসলমানের উপর যেই ইলম তলব করা ফরয, তা হলো ঐ বিষয়ের ইলম যা ঈমান ও ইসলামের জন্য জরুরী এবং যার অবর্তমানে মানুষ না পারে ফরযসমূহ আদায় করতে, আর না পারে হারাম বিষয় থেকে বাঁচতে। পক্ষান্তরে, কুরআন ও হাদীসের যাবতীয় হুকুম-আহ্‌কাম এবং তার অসংখ্য শাখা-প্রশাখা আয়ত্বে আনা সকল মুসলমানের পক্ষে সম্ভবপরও নয় এবং ফরযে আইনও নয়। তবে গোটা মুসলিম বিশ্বের জন্য তা ফরযে কেফায়া। প্রত্যেকটি এলাকায় যদি শরীয়তের যাবতীয় বিষয়ের একজন সুদক্ষ আলেম থাকেন, তাহলে অন্যান্য মুসলমান এ ফরযের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ করতে পারে। তা - না হলে তাদেরই কাউকে আলেম বানানো বা অন্যস্থান থেকে কোন সুদক্ষ আলেমকে ডেকে এনে এখানে রাখার ব্যবস্থা করা স্থানীয় লোকের পক্ষে ফরয। যাতে প্রয়োজনীয় ব্যাপারে তার কাছ থেকে ফতোয়া নিয়ে সে অনুসারে আমল করা যায়।

দ্বীনি ইল্‌ম সম্পর্কে ফরযে আইন ও ফরযে কেফায়ার তফসীল : ফরযে আইন : ইসলামের বিশুদ্ধ আকীদাসমূহ, পাকী-নাপাকীর আহ্‌কাম, নামায ,রোযা ও অন্যান্য ইবাদত যা শরীয়ত ফরয বা ওয়াজিব করে দিয়েছে এবং যেসব বিষয় হারাম বা মাকরূহ করে দিয়েছে সেগুলো সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হওয়া প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর উপর ফরয। অনুরূপ ভাবে যাকাতের নেছাবের মালিকের জন্য যাকাতের মাসাইল জানা, হজ্ব আদায়ে সামর্থবানের জন্য হজ্বের আহ্‌কাম জানা, ব্যবসায়ী বা শিল্পপতির জন্য তার সংশ্লিষ্ট আহকাম জেনে রাখা এবং যে বিয়ের উদ্যোগ নিচ্ছে তার পক্ষে বিয়ে ও তালাকের মাসাইল সম্পর্কে অবগত হওয়া ফরয।

ইল্‌মে তাসাউফ ফরযে আইনের অন্তর্ভূক্ত : শরীঅতের যাহেরী বিষয়সমূহের ন্যায় বাতেনী বিষয় সমূহের আমলও ফরযে আইন। তাই বাতেনী ফরয বিষয়াদি জানা এবং বাতেনী হারাম বস্তুর ইল্‌ম হাসিল করাও ফরযে আইন। বর্তমানে বিভিন্ন ইল্‌ম,

তত্ত্বজ্ঞান, কাশ্‌ফ ও আত্মোপলব্ধির সম্মিলিত রূপকে ইল্‌মে তাসাউফ বলা হয়। তবে এখানে বাতেনী বিষয়সমূহের সেই অংশটুকুই ফরযে আইনের অন্তর্ভুক্ত যা ফরয-ওয়াজিবের শামিল। যেমনঃ বিশুদ্ধ আকীদা, সবর, শোকর ও তাওয়াক্‌কুল প্রভৃতি বিষয় ফরয এবং অহংকার, বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, কৃপনতা ও দুনিয়ার মোহ প্রভৃতি বিষয় হারাম। এ সকল বিষয়ের উপরই হল ইল্‌মে তাসাউফের আসল ভিত্তি যা ফরযে আইন।

ফরযে কেফায়া ঃ পূর্ণ কুরআন মজীদের অর্থ ও মাসাইল সম্পর্কে অবহিত হওয়া, সমুদয় হাদীসের মর্ম বোঝা, বিশুদ্ধ ও দুর্বল হাদীস সম্পর্কে ওয়াকিফহাল থাকা, কুরআন ও হাদীস থেকে নির্গত আহ্‌কাম ও মাসাইলের জ্ঞান অর্জন করা এবং এ ব্যাপারে সাহাবা, তাবেঈন ও মুজ্‌তাহিদ ইমামগনের মতামত ও আমলের পূর্ণ জ্ঞান হাসিল করা ফরযে কেফায়া স্তরের একজন আলেমের কর্তব্য।

আল্লাহর কাছে আলেম কে ? ঃ ইমাম বগভী (রহঃ) হযরত জাবের (রাযিঃ) থেকে বর্ননা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "সে ব্যক্তিই আলেম, যে আল্লাহর কালাম নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে, তাঁর ইবাদত করে এবং তাঁর অসন্তুষ্টির কাজ থেকে বিরত থাকে"। এ থেকে জানা গেল যে, কুরআন ও হাদীসের কিছু শব্দ বোঝে নিলেই কেউ আল্লাহর কাছে আলেম হয়না, যে পর্যন্ত কুরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনার অভ্যাস গড়ে না তোলে এবং যে পর্যন্ত সে কুরআন অনুযায়ী আমল না করে।

ইল্‌ম অনুযায়ী আমল করলে ইল্‌ম বাড়ে ঃ হযরত আবুদ্দারদা (রাযিঃ) থেকে বর্নিত ঃ আল্লাহ তাআলা বলেনঃ ইল্‌ম অনুযায়ী আমল করার জন্যে যারা মুজাহাদা বা কষ্ট স্বীকার করে আমি তাদের সামনে নতুন নতুন ইল্‌মের দ্বার খুলে দেই।

যে জ্ঞান ও শাস্ত্র আল্লাহ এবং পরকাল থেকে মানুষকে গাফেল করে দেয় তা নিন্দনীয় ঃ ইবনে আবী জমরাহ (রহঃ) বলেন ঃ যে জ্ঞান ও শাস্ত্র অন্তরকে কঠোর বানায়, আল্লাহ তাআলার স্মরণ থেকে বিমুখ করে, আকীদা বিশ্বাসে সংশয় পয়দা করে এবং অন্যান্য আধ্যাত্মিক রোগ সৃষ্টি করে তা নিন্দনীয়, যেমন অশ্লীল কবিতা নিন্দনীয়।

পরকাল থেকে গাফেল হয়ে দুনিয়াবী জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা করা বুদ্ধিমত্তা নয় ঃ কুরআন পাক বিশ্বের ধনৈশ্বর্যশীল ও ভোগ-বিলাসী জাতিসমূহের কাহিনীতে পরিপূর্ন। তাদের অশুভ পরিনতির কথা দুনিয়াবাসীর সামনে এসেছে। পরকালের চিরস্থায়ী আযাব তো ভাগ্যে আছেই। তাই এসব জাতিকে কেউ বুদ্ধিমান ও দুরদর্শী বলতে পারে না। পরিতাপের বিষয়, আজ-কাল যে ব্যক্তি অধিকতর অর্থ এবং বিলাস-ব্যসনের উৎকৃষ্টতর সামগ্রী যোগাতে পারে, তাকেই সর্বাধিক বুদ্ধিমান বলা হয়, যদিও সে হয় মানবতাবোধ থেকে বঞ্চিত। অথচ এরূপ লোককে বুদ্ধিমান বলা শরীঅতের দৃষ্টিতে বুদ্ধির অবমাননা ছাড়া কিছু নয়। কুরআন পাকের ভাষায় একমাত্র তারাই বুদ্ধিমান যারা আল্লাহ ও

পরকালকে চিনে, তার জন্য আমল করে এবং সাংসারিক প্রয়োজনাদিকে প্রয়োজন পর্যন্তই সীমিত রাখে সেটাকে জীবনের লক্ষ্যবস্তু বানায় না।

হক্কানী আলেম ও মাশায়েখই জাতির প্রানকেন্দ্র ঃ সত্যানুরাগী ও খোদাভীরু আলেম এবং মাশায়েখগনের অস্তিত্বের মধ্যেই সমগ্র জাতির জীবন নিহিত। যতদিন কোন জাতির মধ্যে এমন আলেম ও মাশায়েখ বিদ্যমান থাকেন যারা পার্থিব লোভ-লালসার বশবর্তী নয় এবং খোদাভীরু, ততদিন সে জাতি অব্যাহতভাবে কল্যান ও বরকত লাভ করতে থাকে।

আলেমদের অনুসরন করার বিধান ঃ আলেমদের কাছ থেকে মাস্‌আলা-মাসায়েল জানার পূর্বে তাদের যোগ্যতা সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেয়া দরকার। যারা আলেম নন তাদের ধর্ম-কর্ম করার একমাত্র পথ হচ্ছে আলেমদের কাছে যাওয়া এবং তাঁদের শিক্ষা অনুযায়ী কাজ করা। রুগ্ন ব্যক্তি কোন চিকিৎসকের কাছে যাওয়ার পূর্বে খোঁজ নেয় যে, এ রোগের জন্যে কোন্ ডাক্তার পারদর্শী, তার কি-কি ডিগ্রী আছে, তার রোগীদের পরিণাম কেমন হয় ? যথাসম্ভব খোঁজ নেয়ার পরও যদি সে কোন ভ্রান্ত চিকিৎসকের ফাঁদে পড়ে যায়, তবে বিজ্ঞজনদের দৃষ্টিতে সে নিন্দার পাত্র নয়। কিন্তু যদি কেহ খোঁজ না নিয়েই হাতুড়ে ডাক্তারের ফাঁদে পড়ে এবং পরিনামে অর্থ ও স্বাস্থ্য উভয়ই নষ্ট করে, বিজ্ঞজনদের মতে এর জন্য সে নিজেই দায়ী। সাধারণ মুসলমানদের ধর্ম-কর্মের অবস্থাও তাই।

কিন্তু পরিতাপের বিষয়, মুসলমানরা এ ব্যাপারে উদাসীন। এ উদাসীনতাই আজকাল মুসলমানের দুরাবস্থার কারন। অথচ তারা বৈষয়িক ক্ষেত্রে খুবই হুঁশিয়ার ও সুচতুর। কিন্তু ধর্মের ব্যাপারে এত নির্বোধ যে, কারও দাড়ি-কোর্তা দেখে এবং কিছু কথাবার্তা শুনেই তাকে অনুসরন যোগ্য আলেম, মুফ্‌তী ও হাদী বলে নির্বাচিত করে নেয়। সে নিয়মিত কোন মাদ্রাসায় লেখাপড়া করেছে কি-না, বিশেষজ্ঞ আলেমদের সংসর্গে থেকে ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করেছে কি-না, শিক্ষাক্ষেত্রে কাজ করার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে কি-না, সাচ্চা বুযর্গ ও আল্লাহভক্তদের সংসর্গে থেকে কিছু আত্মিক পবিত্রতা হাসিল করেছে কি-না? ইত্যাদি বিষয়ের খবর নেয়ারও প্রয়োজন মনে করে না। ফলে, মুসলমানদের মধ্যে যারা ধর্ম-কর্মে মনোযোগী তাদের একটি বিরাট অংশ মুর্খ ওয়ায়েজ ও ব্যবসায়ী পীরের ফাঁদে পড়ে বিশুদ্ধ ধর্মপথ থেকে দুরে সরে যায়।

২৩ হাদীস নং ঃ

مَنْ جَاءَهُ الْمَوْتُ وَهُوَ يَطْلُبُ الْعِلْمَ لِيُحْيِيَ بِهِ الْإِسْلَامَ فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّيْنَ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ –

রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ"ইসলামকে জিন্দা রাখার উদ্দেশ্যে ইল্ম অন্বেষন করা অবস্থায় যার মৃত্যু ঘটে, বেহেশ্তে তার মাঝে আর নবীগনের মাঝে কেবল একটি মর্তবার পার্থক্য থাকবে।" (দারেমী)

ব্যাখ্যা ঃ (মাওলানা আবুল হুসাইন বিন মাওলানা মুহাম্মদ মুহসিন জৌনপূরী (রহঃ) কর্তৃক) ইসলাম জিন্দা করাই ছিল নবীগনের মূল কাজ। তাঁরা এর তাবলীগ তথা প্রচার প্রসারের জন্যই আল্লাহ কর্তৃক আদিষ্ট ছিলেন। যিনি তালিবে ইল্ম তিনিও ইসলামের পূনর্জাগরণ এবং তাবলীগের উদ্দেশ্যেই ইল্ম অর্জনে রত থাকেন। যেহেতু উভয়ের উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন, তাই জান্নাতে উভয়ের মাঝে কেবল নবুওয়াতের একটি মর্তবারই পার্থক্য হবে। সেই তালিবেইল্ম জান্নাতে নবীগনের এই পরিমান বিশেষ নৈকট্য লাভ করবে, যা অন্যদের ভাগ্যে হবে না। আল্লাহ তাআলা সকল মুসলমানকে ইল্মে দ্বীন হাসিল করার তাওফীক দান করুন ! আমীন ॥

যারা শুধু পার্থিব জ্ঞানার্জনে ডুবে আছেন তারা উক্ত হাদীস থেকে উপদেশ গ্রহণ করুন। বন্ধুগণ ! যদি আপনারা যে কোন কারণে খালেস আরবী ভাষায় ইল্মেদ্বীন হাসিল করতে সমর্থ না হন, তাহলে প্রত্যেক ভাষায়ই দ্বীনি কিতাবাদি রয়েছে সেগুলো পড়ে ইল্ম হাসিল করুন। নিজে পড়তে অক্ষম হলে অন্যের দ্বারা পড়িয়ে শুনুন এবং আমল করুন। আল্লাহ ওয়ালাগনের সংসর্গ অবলম্বন করুন। এতে যথেষ্ট পরিমান অবগতি লাভ হবে। তাঁদের সংসর্গে থাকার বরকতে পরিপূর্ণদ্বীন ও ঈমান নসীব হবে, ইন্শাআল্লাহ । এক কথায়, যে কোন ভাবে সম্ভব হয় ইল্মে দ্বীন হাসিলের ধ্যান ও চেষ্টায় লেগে থাকুন। যদি এই ফিকির ও তালাশের মধ্যেই মৃত্যু এসে যায়, তাহলে আপনিও ইন্শাআল্লাহ উক্ত হাদীসের সুসংবাদে শামিল হবেন এবং তালিবে ইল্মীর অবস্থায় মৃত্যুবরনের কারণে শাহাদাতের সওয়াব পাবেন।

আবুল হুসাইন বিন মাওলানা মুহাম্মদ মুহসিন জৌনপুরী।

সংযোজন ঃ ইসলামকে জিন্দা রাখার জন্য মুজাদ্দিদগণের আগমন ঘটে ঃ

কতিপয় হাদীস ঃ

⦿ হযরত আবুহুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তাআলা এই উম্মতের জন্য প্রত্যেক শতাব্দীর মাথায় (অর্থাৎ শুরুতে বা শেষে-যখন ইল্ম কমে যাবে এবং অজ্ঞতাও বিদআত বেড়ে যাবে) এমন কিছু লোক পাঠাবেন যারা তাদের দ্বীনের সংস্কার করবেন। (মিশকাত, আবু দাউদ, তাবরানী)

⦿ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রত্যেক যুগ ও প্রজন্মের বিশ্বস্ত ও খোদাভীরু লোকেরা এই (কুরআন ও হাদীসের) ইল্মকে অর্জন করবে এবং বাড়াবাড়িকারীদের বাড়াবাড়ি ও বিকৃতিসাধন, মিথ্যুক ও বাতিল পন্থীদের ভুল

মাসআলা ও আকীদার সংযোজন এবং(আলেম নামধারী)জাহেলদের ভুল ব্যাখ্যাকে দ্বীন থেকে দূরীভূত করতে থাকবে। (মিশকাত ৩৬পৃঃ)

⦿ আমার উম্মতের মধ্য থেকে সর্বদা একদল লোক দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষন করার কাজে নিয়োজিত থাকবে। তাদের বিরোধীতাকারীরা তাদের কোন ক্ষতিসাধন করতে পারবে না। এমনকি তাদের সেই অবস্থার উপর আল্লাহর হুকুম (মৃত্যু কিংবা কিয়ামত) এসে যাবে। (বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত)

⦿ আমার উম্মতের মধ্য থেকে কিয়ামত পর্যন্ত সর্বদা একদল লোক আল্লাহর সাহায্য প্রাপ্ত থাকবে। তাদের বিরোধীতাকারীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। (তিরমিযী, মিশকাত) অর্থাৎ, পৃথিবীতে সব সময় একদল লোক আল্লাহর আদেশ-নিষেধ পালন ও দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে অটল থাকবে। তাদের কাজ থেকে তারা বিরত হবে না। চাই মানুষ তাদের সহযোগীতা করুক বা বিরোধীতা করুক।

যে বস্তু ইসলামকে ধ্বংস করে ঃ কতিপয় হাদীস ঃ ⦿ যিয়াদ বিন জাদীর তাবেয়ী বলেন ঃ হযরত উমর (রাযিঃ) আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তুমি কি জান, কোন্ জিনিস ইসলামকে ধ্বংস করে ? (অর্থাৎ ইসলামের ইজ্জত ও প্রভাবকে নষ্ট করে) আমি বললাম না আমি জানি না। তখন তিনি বললেন ঃ ইসলামকে ধ্বংস করে আলেমের পদস্খলন ও ত্রুটি-বিচ্যুতি, কুরআনের ভুল ব্যাখ্যা করার মাধ্যমে মুনাফিক লোকদের (হক পন্থীদের সংগে) বিতর্কে লিপ্ত হওয়া এবং পথভ্রষ্ট জাহেল নেতাদের ভুল সিদ্ধান্ত। (দারেমী, মিশকাত,)

⦿ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তাআলা বান্দাদের থেকে ইল্‌মকে ছিনিয়ে নিবেন না। কিন্তু আলেমগণকে তুলে নেয়ার মাধ্যমে ইল্‌মকে তুলে নিবেন। শেষ পর্যন্ত যখন কোন আলেমকে বাকী রাখবেন না তখন লোকেরা জাহেলদেরকে নেতারূপে গ্রহণ করবে। তাদের কাছে কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করা হবে আর তারা না জেনেই ফতোয়া দিবে। তারা নিজেরাও ভুল পথে যাবে এবং অন্যদেরকে ও ভুলপথে নিবে। (বুখারী ও মুসলিম-মিশকাত)

⦿ হযরত উমর (রাযিঃ) হযরত কা'ব আহবার (রাযিঃ) কে জিজ্ঞাসা করেন যে, আলেম কারা ? তিনি বললেন ঃ যারা তাদের ইল্‌ম অনুযায়ী আমল করেন। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন ঃ কোন জিনিস আলেমদের অন্তর থেকে ইল্‌মকে বের করে দেয় ? তিনি বললেন ঃ লোভ-লালসা। (দারেমী, মিশকাত)

⦿ দ্বীনের ভিত্তি ও নির্ভর হলো পরহেযগারী। (বায়হাকী, মিশকাত)

⦿ হযরত আলী (রাযিঃ) বসূরা শহরে আসার পর জামে মসজিদে গিয়ে দেখলেন, অনেক ওয়ায়েজ মানুষকে ওয়াজ ও নসীহত করছে। তিনি তাদেরকে ধমকিয়ে বের করে দিলেন। শেষ পর্যন্ত হাসান বসরী (রহঃ) নিকট এসে বললেন ঃ হে যুবক ! আমি তোমাকে একটি বিষয়ে প্রশ্ন করব। সঠিক উত্তর দিতে পারলে তোমাকে এখানে থাকতে

দেব, নতুবা অন্যদের মত তোমাকেও বের করে দেব। হাসান বসরী (রহঃ) বললেন ঃ আপনি যে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতে চান, তা জিজ্ঞাসা করুন। তখন তিনি বললেন ঃ দ্বীনের ভিত্তি ও রক্ষাকারী কোন জিনিস ? উত্তরে হাসান বসরী বললেন ঃ পরহেযগারী। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন ঃ দ্বীনের ধ্বংসকারী কোন জিনিস ? প্রত্যুত্তরে হাসান বসরী বললেন ঃ লোভ-লালসা। তখন হযরত আলী (রাযিঃ) বললেনঃ তুমি এখানে কায়েম থাক। কেননা, তোমার মত ব্যক্তিই মানুষকে ওয়াজ করার উপযুক্ত। (তানভীর-হাকীকাতু তাসাউফ) হযরত মাওলানা হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহঃ) বলেন ঃ উক্ত ঘটনার মাধ্যমে হাসান বসরী (রহঃ) হযরত আলী (রাযিঃ) এর খলীফা হওয়া প্রমানিত হয়। (তানভীর ১২৮পৃঃ- হাকীকাতুত্তাছাউফ)

ধর্ম প্রতিষ্ঠিত রাখা ফরয এবং বিভেদ সৃষ্টি করা হারাম ঃ আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন ঃ "তিনি তোমাদের জন্যে দ্বীনের ক্ষেত্রে সেই পথই নির্ধারিত করেছেন, যার আদেশ দিয়েছিলেন নূহকে এবং যা আমি ওহী পাঠিয়েছি আপনার প্রতি এবং যার আদেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মুসা ও ঈসাকে। এই মর্মে যে, তোমরা ইকামতে দ্বীন তথা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং তাতে অনৈক্য সৃষ্টি করো না। আপনি মুশরেকদেরকে যে বিষয়ের প্রতি আহবান করেন, তা তাদের কাছে ভারী মনে হয়। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন আর যে তাঁর অভিমুখী হয়, তাকে পথ প্রদর্শন করেন। (শুরা - ১৩) অর্থাৎ যে দ্বীন বা ধর্মমতে পয়গম্বরগণ সকলেই এক ও অভিন্ন সে ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত রাখ, তাতে বিভেধ ও অনৈক্য বৈধ নয়; বরং তা ধ্বংসের কারন। এ আয়াতে দ্বীন বলে সকল পয়গম্বরের অভিন্ন ধর্মকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ মৌলিক বিশ্বাস-যেমন তাওহীদ, রিসালাত, পরকালে বিশ্বাস এবং মৌলিক ইবাদত - যেমন নামায, রোযা, হজ্ব ও যাকাতের বিধান মেনে চলা। এমনিভাবে চুরি, ডাকাতি, ব্যভিচার, মিথ্যা, প্রতারনা, যুলুম ও ওয়াদা ভঙ্গ করার মত অনাচার সমূহের নিষিদ্ধতা। এগুলো সকল আস্‌মানী ধর্মেরই অভিন্ন ও সর্বসম্মত বিষয়। শাখাগত বিধানসমুহে পয়গম্বরগনের শরীয়তে আংশিক বিভিন্নতাও রয়েছে।

অতএব, পয়গম্বরগনের অভিন্ন বিধানাবলীতে বিভেদ সৃষ্টি করা হারাম এবং ধ্বংসের কারণ। এ সম্পর্কে হাদীসে কঠোর নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে। হাদীসে বলা হয়েছে ঃ যে ব্যক্তি মুসলমানদের জামাত থেকে অর্ধ হাত পরিমানও দুরে সরে পড়ে, সে ইসলামের বন্ধনকেই তার কাঁধ থেকে সরিয়ে দিল। আরও বলা হয়েছেঃ জামাতের উপর আল্লাহ্‌র রহমতের হাত রয়েছে। হযরত মুয়ায (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে আছে - শয়তান মানুষের জন্য ব্যাঘ্রস্বরূপ। বাঘ ছাগলের পেছনে লাগে। অতঃপর যে ছাগল তার দল থেকে পেছনে অথবা এদিক ওদিক বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে, বাঘ সেটার উপরই পতিত হয়। তাই তোমাদের উচিত জামাআতের সঙ্গে থাকা-পৃথক না থাকা।

সারকথা এই যে, উক্ত আয়াতে সকল পয়গম্বর কর্তৃক অনুসৃত অভিন্ন ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত রাখার আদেশ দিয়ে তাতে মতভেদ করাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং হাদীসে এ মতভেদের নিষিদ্ধতাই ব্যক্ত করা হয়েছে।

মুজতাহিদ ইমামগণের মতভেদ কি নিষিদ্ধ? ঃ মুজ্‌তাহিদ ইমামগনের শাখাগত মতভেদ এতে দাখিল নয়। আয়াতে নিষিদ্ধ মতভেদের সংগে এই মতভেদের কোন সম্পর্ক নেই। এ ধরনের মতভেদ নবীযুগ থেকে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যেও হয়ে এসেছে এবং এটা যে উম্মতের জন্য রহমত স্বরূপ, এ বিষয়ে ফেকাহ্‌বিদগণ একমত।

২৪ নং হাদীস ঃ

مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ الصَّلٰوةُ وَمِفْتَاحُ الصَّلٰوةِ الطُّهُوْرُ

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "বেহেশ্‌তের চাবি নামায, আর নামাযের চাবি হল ওযু (পবিত্রতা)।" (আহমাদ)

ব্যাখ্যা ঃ যেমনিভাবে তালাবদ্ধ দরজা চাবি ছাড়া খোলা যায় না এবং ঘরেও প্রবেশ করা যায় না, তেমনিভাবে মানুষ নামায ছাড়া বেহেশ্‌তে যেতে পারবে না। আর নামায ওযু ছাড়া কিছুতেই শুদ্ধ হয় না। সুতরাং যেহেতু বেহেশ্‌তে যাওয়ার জন্য নামায একান্ত জরুরী আর নামাযের জন্য ওযু শর্ত, তাই ওযু এবং নামাযের মাসআলা-মাসাইল খুব ভালভাবে জেনে নেয়া উচিত। বহুলোক নামায-রোযার মাসাইল সম্পর্কে সম্পূর্ণ বে-খবর। তাদের জন্য উচিত, রাহে নাজাত, মিফ্‌তাহুল জান্নাত, বেহেশ্‌তী যেওর, মা-লা-বুদ্ধা মিন্‌হু প্রভৃতি কিতাব নিয়মিত পাঠ করা।

সংযোজন ঃ ওযু সম্পর্কে কতিপয় হাদীস ঃ ◉ মুসলমান বান্দা যখন ওযু করার সময় তার চেহারা ধোয় তার চেহারা থেকে পানির সংগে ঐ সকল গুনাহ বের হয়ে যায়, যা তার দুই চোখ দ্বারা হয়েছে। আর যখন দুই-হাত ধোয় তখন তার দুই হাত থেকে পানির সংগে ঐ সকল গুনাহ বের হয়ে যায়, যা তার উভয় হাত দ্বারা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত সে গুনাহ থেকে পরিষ্কার হয়ে যায়। (তিরমিযী) ◉ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সা'দ (রাযিঃ) এর কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সা'দ (রাযিঃ) তখন ওযু করছিলেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ হে সা'দ! এই অপচয় কেন করছ? সা'দ বললেনঃ ওযুতেও কি অপচয় আছে? নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ হাঁ, যদি তুমি প্রবাহমান নদীতেও ওযু কর। (অর্থাৎ প্রয়োজনাতিরিক্ত পানি খরচ করাই অপচয়) (মিশকাত)

◉ একজন গ্রাম্যলোক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে ওযু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি ওযুর অঙ্গগুলো তিনবার করে ধুয়ে তাকে ওযু

দেখালেন। অতঃপর বললেন, এভাবেই ওযু করতে হয়। সুতরাং যে ব্যক্তি এর অতিরিক্ত করল, সে মন্দ কাজ করল, সীমা লংঘন করল এবং যুলুম করল। (মিশকাত)

⦿ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাগণকে লক্ষ্য করে বললেন, আমি কি তোমাদেরকে বাতলে দেব না ? এমন বিষয়, যদ্দারা আল্লাহ তাআলা গুনাহসমূহ মোচন করেন এবং মর্তবাসমূহ বুলন্দ করেন। সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন ঃ হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! তখন তিনি বললেন ঃ মনের চাহিদার বিরুদ্ধে ওযু পরিপূর্ণ করা, মসজিদের দিকে বেশী চলা এবং এক নামাযের পর অন্য নামাযের অপেক্ষা করা। ইহাই (অন্তরের) পাহারাদারী। (তিরমিযী)

✪ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে দোআ করতেনঃ "আয় আল্লাহ ! আপনার দরবারে প্রার্থনা - আমাকে পরিপূর্ণভাবে ওযু করার, পরিপূর্ণভাবে নামায আদায় করার, পরিপূর্ণভাবে আপনার সন্তুষ্টি অর্জন করার তাওফীক দান করুন এবং আমাকে পরিপূর্ন ভাবে মাফ করে দিন।"

উপরোক্ত হাদীসগুলো থেকে বুঝা গেল যে, ওযুতে অপচয় হয়ে থাকে, যা শরীঅতে হারাম। অতএব, আমাদের খেয়াল রাখতে হবে, যেন প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি ব্যয় না হয়। বিশেষভাবে ট্যাপের পানিতে ওযু করার সময় লক্ষ্য রাখা কর্তব্য। বদ্‌নার সাহায্যে ট্যাপ থেকে পানি নিয়ে ওযু করলে এর অপচয় থেকে রক্ষা পাওয়া সহজ। মাওলানা আস্‌আদুল্লাহ সাহারনপুরী (রহঃ) লিখেছেন ঃ মুবাহ কিংবা মালিকানাধীন পানিতে ওযু করার সময় পানির অপচয় করা মাকরূহে তাহরীমী আর মাদ্রাসা, মসজিদ ইত্যাদির ওয়াক্‌ফকৃত পানিতে ওযুকালীন অপচয় করা হারাম।

উপরোক্ত হাদীসগুলো থেকে একথাও বুঝা গেল যে, ওযুর পরিপূর্ণতার সাথে গুনাহমাফীর বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। অর্থাৎ ওযু যেই স্তরের হবে নামাযও সেই স্তরের হবে। এমনিভাবে নামায যেই পরিমান পরিপূর্ণ হবে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিও সেই অনুপাতে হাসিল হবে। আর এই সন্তুষ্টির ফলশ্রুতিতেই আল্লাহ পাকের মাগফিরাত তথা গুনাহমাফী হাসিল হবে।

সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) অত্যন্ত গুরুত্ব ও পরিপূর্ণতা সহকারে ওযু নামাযের আমল করেছেন, যার ফলে আল্লাহর সঙ্গে তাঁদের গভীর সম্পর্ক ও নৈকট্য হাসিল হয়েছে। আমাদেরও কর্তব্য, ওযু এবং নামাযের পরিপূর্ণতার প্রতি সর্বদা লক্ষ্য রাখা এবং এ - বিষয়ে সদা সচেষ্ট থাকা।

প্রস্রাব থেকে যথাযথভাবে পবিত্রতা অর্জন না করা কবীরা গুনাহ ও তার পরিণতি ঃ ✪ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "তোমরা প্রস্রাব থেকে পবিত্রতা অর্জন কর। কেননা অধিকাংশ কবরের আযাব এ কারণেই হয়ে থাকে।" (দারাকুত্‌নী)

— ৭

✪ তাবরানী ও ইবনে আবিদ্দুনিয়া বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : জাহান্নামবাসী তো এমনিতেই অবর্ননীয় দুঃখ ও যন্ত্রনা ভোগ করতে থাকবে। উপরন্তু, চার শ্রেণীর মানুষের কারণে তাদের দুঃখ-যন্ত্রনা আরো বেড়ে যাবে। ফলে তারা উত্তপ্ত পানি ও আগুনের মধ্য দিয়ে ছুটোছুটি করতে থাকেব এবং নিজেদের জন্য মৃত্যু ও ধ্বংস কামনা করতে থাকবে। অতঃপর জাহান্নামবাসী একে অপরকে বলবে : এ চারটি লোকের পরিচয় কি, যারা জাহান্নামে প্রবেশ করে আমাদের যন্ত্রনা বাড়িয়ে দিয়েছে ? তখন অপরজন বলবে : ওদের একজনকে একটি আগুনের খাঁচায় আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। আরেকজন নিজের বেরিয়ে পড়া নাড়িভুঁড়ি টেনে নিয়ে বেড়াচ্ছে। আরেকজনের মুখ থেকে অনবরত পুঁজ ও রক্তের বমি হচ্ছে। আর একজন নিজের শরীরের গোশ্‌ত কামড়িয়ে খাচ্ছে। অতঃপর খাঁচায় আবদ্ধ লোকটিকে লক্ষ্য করে বলা হবে : এই অভিশপ্ত লোকটির কি হয়েছে, যে আমাদের যন্ত্রনার উপর যন্ত্রনা বাড়িয়ে দিয়েছে ? সে বলবে : আমি অভিশপ্ত এজন্য যে, নানাভাবে মানুষের সম্পদ লুটেপুটে খেতাম, অতঃপর সেই সমস্ত দায়দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়েই মারা গিয়েছিলাম। অতঃপর যে ব্যক্তি নিজের নাড়িভুঁড়ি টেনে নিয়ে বেড়ায়, তাকে একই কথা জিজ্ঞাসা করা হবে। সে বলবে : আমি অভিশপ্ত এ জন্য যে, প্রস্রাব সম্পর্কে সাবধান থাকতাম না এবং তা ধুয়ে পরিষ্কার করতাম না। অতঃপর যার মুখ দিয়ে অনবরত রক্ত ও পুঁজের বমি হতে থাকবে, তাকে একইভাবে জিজ্ঞাসা করা হলে সে বলবে : আমি অভিশপ্ত এজন্য যে, আমি যে কোন খারাপ কথা শুনে মজা পেতাম এবং একজনের কথা অপরজনের কাছে পৌঁছে দিয়ে চোগলখুরি করে শত্রুতা বাধিয়ে দিতাম। অতঃপর যে নিজের দেহের গোশ্‌ত কামড়ে খাবে তাকে একই কথা জিজ্ঞাসা করা হলে সে বলবে : আমি এজন্য অভিশপ্ত যে, আমি মানুষের গোশত খেতাম, অর্থাৎ গীবত করতাম। (কিঃ কাঃ) আল্লাহ আমাদের সকলকে এ সব জঘন্য পাপ থেকে রক্ষা করুন।

নামাযের ফযীলত ও তাতে অবহেলার পরিণাম সম্পর্কে কতিপয় হাদীস :

⦿ পাঁচ ওয়াক্ত নামায, এক জুমুআ থেকে আরেক জুমুআ এবং এক রমাযান থেকে আরেক রমাযান -এ গুলো তার মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহসমূহ মোচনকারী। (মুসলিম)

⦿ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বলেনঃ আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলাম, আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় আমল কোনটি ? তিনি বললেন : যথা সময়ে নামায আদায় করা। আমি বললাম : তারপর কোনটি ? তিনি বললেন : মাতাপিতার সহিত সদ্ব্যবহার করা। আমি বললাম, এরপর কোনটি ? তিনি বললেন, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। (বুখারী ও মুসলিম)

⦿ পাঁচ ওয়াক্ত নামায আল্লাহ তাআলা ফরয করেছেন। যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওযু করে যথাসময়ে এই নামাযগুলোকে আদায় করবে এবং এগুলোর রুকু ও খুশু (বিনয়) কে

পরিপূর্ণ রূপে আদায় করবে, আল্লাহ তাআলার উপর যিম্মাদারী হয়ে যায় তাকে মাফ করে দেয়া। আর যে এরূপ করবে না, তার জন্যে আল্লাহ তাআলার উপর কোন যিম্মাদারী থাকে না। তিনি ইচ্ছা করলে তাকে মাফ করতে পারেন এবং ইচ্ছা করলে আযাবও দিতে পারেন। (আবুদাউদ)

⦿ যে ব্যক্তি গুরুত্ব সহকারে ঠিক ঠিকভাবে নামায আদায় করবে, তার জন্যে তা-কিয়ামতের দিন নূর, দলীল এবং নাজাতের কারণ হবে। আর যে গুরুত্ব সহকারে ঠিক ঠিকভাবে উহা আদায় করবে না, তার জন্যে তা-নূর, দলীল এবং নাজাতের কারন-কিছুই হবে না, বরং সে কিয়ামতের দিন কারুন, ফির্‌আউন, হামান ও উবাই ইবনে খলফ এর সঙ্গে থাকবে। (আহমাদ, দারেমী ও বায়হাকী)

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় কোন কোন মুসলিম মনীষী বলেছেন ঃ উল্লেখিত চারজন কুখ্যাত কাফেরের সংগে বেনামাযীর হাশর হওয়ার কারণ এই যে, নামায তরকের কারণ চার রকমের হয়ে থাকে। অর্থ-সম্পদের রক্ষনাবেক্ষন, রাষ্ট্রীয় ব্যস্ততা, প্রশাসনিক ব্যস্ততা ও বানিজ্যিক ব্যস্ততা। নামায তরকের কারণ প্রথমটি হলে কারুনের সাথে, দ্বিতীয়টি হলে ফির্‌আউনের সাথে, তৃতীয়টি হলে হামানের সাথে এবং চতুর্থটি হলে মক্কার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী উবাই বিন খাল্‌ফের সাথে তার হাশর হবে।

✪ এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে বললো ঃ হে আল্লাহর রাসূল ! ইসলামের কোন্ কাজ আল্লাহর নিকট বেশী প্রিয় ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ যথা সময়ে নামায পড়া। যে ব্যক্তি নামায ছেড়ে দিল তার ধর্ম নেই। নামায ইসলামের খুঁটি। (বায়হাকী)

✪ যে ব্যক্তি বেনামাযী হয়ে আল্লাহর কাছে যাবে, তার অন্যান্য সৎকাজকে আল্লাহ কবুল করবেন না। (তাবরানী)

✪ কোন সন্তানের বয়স সাত বছর হলেই তাকে নামায পড়তে আদেশ দাও। আর দশ বছর হলে তাকে সে জন্য প্রহার কর এবং তাদের পরস্পরের মাঝে বিছানা আলগ করে দাও। (আঃ দাঃ)

✪ যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায যথারীতি আদায় করবে, আল্লাহ তাকে পাঁচটি মর্যাদা দান করবেন। প্রথমত ঃ তার দরিদ্রতা দূর করবেন। দ্বিতীয়ত ঃ তাকে কবরের আযাব থেকে মুক্তি দিবেন, তৃতীয়ত ঃ তার আমলনামা ডান হাতে দিবেন, চতুর্থত ঃ বিদ্যুৎ বেগে তাকে পুলসিরাত পার করাবেন, পঞ্চমত ঃ তাকে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আর যে ব্যক্তি নামাযের ব্যাপারে শৈথিল্য দেখাবে, আল্লাহ তাকে ১৪টি শাস্তি দিবেন। এর মধ্যে পাঁচটি দুনিয়ার জীবনে, তিনটি মৃত্যুর সময়ে, তিনটি কবরে এবং তিনটি কবর থেকে পুনরুজ্জীবিত হওয়ার সময়ে। দুনিয়ার পাঁচটি হলো, তার জীবন থেকে বরকত উঠে যাবে, তার মুখমন্ডল থেকে সৎলোকসুলভ নূর বা উজ্জ্বলতা দূর হয়ে যাবে, তার কোন নেক আমলের প্রতিদান দেয়া হবে না, তার কোন

দোআ কবুল হবে না এবং নেককার লোকদের দোআ থেকে সে বঞ্চিত হবে। আর মৃত্যুর সময়ের তিনটি শাস্তি হলো, সে অপমানিত হয়ে মারা যাবে, ক্ষুধার্ত অবস্থায় মারা যাবে, এত পিপাসিত অবস্থায় মারা যাবে যে, সারা দুনিয়ার সমুদ্রের পানি পান করলেও তার পিপাসা মিটবেনা। কবরের তিনটি শাস্তি হলো, তার কবর সংকুচিত হয়ে তাকে এত জোরে পিষ্ট করবে যে, এক পাশের পাঁজরের হাড় ভেংগে অপর পার্শ্বে চলে যাবে, তার কবর এমনভাবে আগুন দিয়ে ভরে দেয়া হবে যে, রাত দিন তা জ্বলতে থাকবে এবং তাকে কিয়ামত পর্যন্ত একটি বিষধর সাপ দংশন করতে থাকবে। আর কবর থেকে উঠবার পরের তিনটি শাস্তি হলো, তার হিসাব কঠিন হবে, আল্লাহকে সে ক্রুদ্ধ দেখতে পাবে এবং সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। অন্য রিওয়ায়েতে আছে যে, কিয়ামতের দিন তার কপালে তিনটি কথা অংকিত থাকবে। একটি কথা হবে ঃ "হে আল্লাহর হক বিনষ্টকারী", দ্বিতীয় কথাটি হবে ঃ "হে আল্লাহর গযবের উপযুক্ত", তৃতীয় কথাটি হবে ঃ তুমি পৃথিবীতে যেমন আল্লাহর অধিকার দাওনি, আজ তেমনি আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হবে।" (কিঃ কাঃ)

✪ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্নিত যে, কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে আল্লাহর সামনে দাঁড় করিয়ে জাহান্নামে যাওয়ার আদেশ দেয়া হবে। সে জিজ্ঞাসা করবে ঃ হে আমার প্রতিপালক ! কি কারণে ? আল্লাহ্ বলবেন ঃ নামায নির্ধারিত সময়ের পরে পড়া ও আমার নামে মিথ্যা কসম খাওয়ার কারণে। (কিঃ কাঃ)

✪ একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হে আল্লাহ ! আমাদের মধ্যে কাউকে বঞ্চিত-হতভাগা বানিও না। তারপর উপস্থিত সাহাবীগণকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমরা কি জান বঞ্চিত-হতভাগা কে ? সাহাবীগণ বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল ! কে ? তিনি বললেন ঃ নামায তরককারী। (কিঃ কাঃ)

✪ কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যাদের মুখ কালো হবে, তারা হলো নামায তরককারী। জাহান্নামে 'মালহাম' নামক একটা অঞ্চল আছে। সেখানে বহু সাপ থাকে। তার প্রতিটি সাপ উটের ঘাড়ের মত মোটা এবং প্রায় এক মাসের পথের সমান লম্বা। এই সাপ নামায তরককারীকে দংশন করবে। উহার বিষ তার শরীরে ৭০ বছর ধরে যন্ত্রনা দিতে থাকবে। অবশেষে তার গোশ্‌ত খসে খসে পড়বে। (কিঃ কাঃ)

কুরআন তিলাওয়াত ও নামায মানব সংশোধনের সংক্ষিপ্ত এবং পূর্ণ ব্যবস্থাপত্র ঃ এই অমোঘ ব্যবস্থাপত্র পালন করলে পূর্ণ ধর্ম পালন করার পথ সুগম হয়ে যায় এবং ধর্ম পালনের পথে অভ্যাসগতভাবে যত বাধা-বিপত্তি দেখা দেয়, সব দুর হয়ে যায়। এই ব্যবস্থাপত্রের দুটি অংশ। একটি কুরআনের তিলাওয়াত ও অপরটি নামায কায়েম করা।

তম্মধ্যে কুরআনের তিলাওয়াত তো সব কাজের প্রান ও আসল ভিত্তি। আর নামায স্বকীয়ভাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত এবং দ্বীনের স্তম্ভ। এর উপকারিতা এই যে, যে ব্যক্তি নামায কায়েম করে, নামায তাকে অশ্লীল ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখে, চাই তা প্রকাশ্য হউক কিংবা অপ্রকাশ্য।

নামায যাবতীয় পাপকর্ম থেকে বিরত রাখার জন্য শর্ত : নামায যাবতীয় পাপকর্ম থেকে বিরত রাখে এর জন্য শর্ত এই যে, শুধু নামায পড়লে চলবে না; বরং ইকামতে সালাত হতে হবে। ইকামত শব্দের অর্থ, সোজাভাবে খাড়া করা যাতে একদিকে ঝুঁকে না থাকে। তাই ইকামতে সালাত এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রকাশ্য ও আভ্যন্তরীন রীতিনীতি পালন সহকারে যেভাবে নামায আদায় করেছেন এবং সারা জীবন তার শিক্ষাও দান করেছেন, ঠিক সেভাবে নামায আদায় করা। অর্থাৎ শরীর, পরিধেয় বস্ত্র ও নামাযের স্থান পবিত্র হওয়া, নিয়মিত জমাআতে নামায পড়া এবং নামাযের যাবতীয় ক্রীয়া-কর্ম সুন্নত অনুযায়ী সম্পাদন করা। এগুলো হলো প্রকাশ্য রীতিনীতি।

আর আভ্যন্তরীন রীতিনীতি এই যে, আল্লাহর সামনে এমনভাবে বিনয়াবনত হয়ে একাগ্রতা সহকারে দাঁড়ানো, যেন তাঁর কাছে আবেদন-নিবেদন করা হচ্ছে।

যে ব্যক্তি এভাবে নামায কায়েম করে সে আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনা-আপনি গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার এবং সৎকর্ম করার তাওফীক প্রাপ্ত হয়। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি নামায পড়া সত্বেও গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে না, বুঝতে হবে যে, তার নামাযের মধ্যেই ত্রুটি বিদ্যমান। ইমরান ইবনে হুসাইন (রাযিঃ) থেকে বর্নিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হল : إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ (নামায অশ্লীল এবং গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখে) - এই আয়াতের অর্থ কি ? তিনি বললেন : যে ব্যক্তিকে তার নামায অশ্লীল ও গর্হিত কর্ম থেকে বিরত রাখে না, তার নামায কিছুই নয়। হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্নিত আছে যে, জনৈক ব্যক্তি রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে উপস্থিত হয়ে আরয করল : অমুক ব্যক্তি রাতে তাহাজ্জুদ পড়ে এবং সকাল হলে চুরি করে। তিনি বললেন : সত্বরই নামায তাকে চুরি থেকে বিরত রাখবে। অন্য বর্ণনায় আছে, এরপর সে চুরির অভ্যাস পরিত্যাগ করে তওবা করে নেয়।

খুশু বা বিনয়ের হাকীকত ও ফেকাহগত মর্যাদা : খুশুর অর্থ-অক্ষমতা ও অপারগতাজনিত সেই মানসিক অবস্থা, যা আল্লাহ পাকের মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব এবং তাঁর সামনে নিজের ক্ষুদ্রতা ও দীনতার অনুভূতি থেকে সৃষ্টি হয়। এর ফলে ইবাদত-উপাসনা সহজ হয়ে যায়। কখনো এর লক্ষনাদি দেহেও প্রকাশ পেতে থাকে। তখন তাকে আদববিশিষ্ট, বিনম্র ও কোমলমন দেখা যায়।

অধিকাংশ ফকীহ আলেমের মতে 'খুশু' নামাযের শর্ত না হলেও তাঁরা একে নামাযের রূহ বা আত্মা বলে মন্তব্য করেছেন এবং এই শর্ত আরোপ করেছেন যে, তকবীরে তাহরীমার সময় বিনয়সহ মনের একাগ্রতা বজায় রেখে আল্লাহর উদ্দেশ্যে নামাযের নিয়ত করতে হবে। এরপর খুশু বিদ্যমান না থাকলে যদিও তার নামাযের খুশুবিহীন অংশটুকুর সওয়াব হবে না; কিন্তু সে নামায পরিত্যাগকারীরূপে গন্য হবে না। **খুশুহীন নামায সম্পূর্ণ নিরর্থক নয় ঃ** কেননা, যে অবস্থায়ই হোক, সে অন্ততঃ ফরয আদায়ের পদক্ষেপ নিয়েছে এবং সামান্য সময়ের জন্য হলেও অন্তরকে যাবতীয় বস্তুর আকর্ষন থেকে মুক্ত করে আল্লাহর প্রতি নিয়োজিত করেছে। কমপক্ষে, নিয়তের সময় শুধু সে আল্লাহ পাকেরই ধ্যানে নিমগ্ন ছিল। এ ধরনের নামাযে অন্ততঃ এতটুকু উপকার অবশ্যই হবে যে, সে অবাধ্য ও বেনামাযীদের তালিকাভূক্ত হবে না।

২৫ নং হাদীস

لَايَلِجُ النَّارَ مَنْ صَلَّى قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا

রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ"যে ব্যক্তি সুর্যোদয় ও সুর্যাস্তের পূর্বে নামায আদায় করবে সে দোযখে যাবে না।" (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ যেহেতু ফজর আরামের সময় এবং আসর কাজ কারবারের সময় সেহেতু এই দুই ওয়াক্তের নামাযকে এতটা সওয়াব ও মর্যাদাসম্পন্ন করা হয়েছে।

২৬ নং হাদীস

تَفْضُلُ الصَّلٰوةَ الَّتِيْ يَسْتَاكُ لَهَا عَلَى الصَّلٰوةِ الَّتِيْ لَايَسْتَاكُ لَهَا سَبْعِيْنَ ضِعْفًا –

রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "যেই নামাযের জন্য ওযুতে মিস্ওয়াক করা হয় তার মর্যাদা ও সওয়াব, ঐ নামাযের উপর যার জন্যে মিস্ওয়াক করা হয় না, সত্তর গুন বেশী।" (বায়হাকী)

ব্যাখ্যা ঃ মিসওয়াক করার গুরুত্ব, উপকারিতা ও সময় ঃ মিস্ওয়াকের গুরুত্ব সম্পর্কে চল্লিশটি হাদীস বর্নিত আছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যদি উম্মতের কষ্টের কথা না ভাবতাম তা হলে তাদের উপর মিস্ওয়াক করা ফরয করে দিতাম। মিসওয়াকের অগনিত উপকারিতা রয়েছে। সর্বোপরি উপকারিতা হলো, আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জন করা ও মৃত্যুকালে মুখে কালিমা শরীফ পাঠ করা নসীব হয়। আর সর্বনিম্ন উপকারিতা হলো, মুখ পস্কিার-পরিচ্ছন্ন ও দুর্গন্ধমুক্ত থাকে। নারী-পুরুষ, বৃদ্ধ-শিশু সকলেরই মিসওয়াক করা উচিত।

সংযোজন ঃ হযরত মোল্লা আলী কারী (রহঃ) কোন বিশিষ্ট আলেম থেকে মিস্ওয়াকের সত্তরটি উপকারিতা বর্ণনা করেছেন। আল্লামা ইবনুল হুমাম (রহঃ) লিখেছেন, পাঁচটি

সময়ে মিসওয়াক করা মুস্তাহাব। যথাঃ দাঁত হলুদ বর্ণ হয়ে গেলে, মুখ দুর্গন্ধময় হয়ে গেলে, ঘুম থেকে জাগ্রত হলে, নামাযের ইচ্ছা করলে এবং ওযূ করার সময়।

মিস্ওয়াক বিশিষ্ট নামাযে সত্তরগুন সওয়াবের কারণ ঃ আল্লামা ইবনুল কাইয়েম (রহঃ) মিসওয়াকবিশিষ্ট নামাযে মিসওয়াক বিহীন নামায অপেক্ষা সত্তরগুন অধিক সওয়াবের কারণ সম্পর্কে লিখেছেন - মিসওয়াক করে নামায পড়া নামাযের প্রতি গুরুত্বারোপ করা বুঝায়। বান্দার পক্ষ থেকে ইবাদতের প্রতি গুরুত্বারোপ করাই আল্লাহ তাআলার কাম্য, ইবাদতের আধিক্য কাম্য নয়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন الَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَــلاً- অর্থাৎ "যিনি সৃষ্টি করেছেন জীবন ও মৃত্যু তোমাদের পরীক্ষা করার জন্যে যে, তোমাদের মধ্যে কে উত্তম আমলকারী।" এখানে বলা হয়েছে, কে উত্তম আমলকারী। একথা বলা হয়নি যে, কে অধিক আমলকারী। তাই বুঝা গেল যে, ইবাদতের মান পরীক্ষা করাই আল্লাহর উদ্দেশ্য, আধিক্য নয়।

অতএব যেহেতু মিসওয়াক বিশিষ্ট দুই রাক্আত নামায উত্তম যদিও অধিক নয়, আর মিসওয়াকবিহীন সত্তর রাক্আত নামায যদিও অধিক হয় কিন্তু উত্তম নয়, তাই মিসওয়াকের সাথে দুই রাক্আত নামাযকে মিসওয়াকবিহীন সত্তর রাক্আত নামায অপেক্ষা অধিক মর্যাদাসম্পন্ন বলা হয়েছে। (আদ্দুররুল মানদূদ শরহে আবু দাউদ)

২৭ নং হাদীস

مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدَنِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَنِ الَّذِىْ وَعَدْتَّهٗ حَلَّتْ لَهٗ شَفَاعَتِىْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ –

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি আযান শুনে اَللّٰهُمَّ থেকে وَعَدْتَّهٗ পর্যন্ত দোআটি পাঠ করবে কিয়ামতের দিবসে তার জন্য আমার শাফাআত ওয়াজিব হবে।" (বুখারী)

ব্যাখ্যা ঃ আযানের শেষে দোয়ার পূর্বে দরুদ পাঠ করা সুন্নাতঃ (মাওলানা আবুল হুসাইন ইবনে মাওলানা মুহসিন জৌনপুরী (রহঃ) কর্তৃক) এখানে পরিপূর্ণ আযানের পর দোআটি পড়ার কথা বুঝানো হয়েছে। সহীহ মুসলিম শরীফের একখানা হাদীস দ্বারা এ কথার সমর্থন হয়, যা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আছ (রাযিঃ) থেকে বর্নিত। তিনি নবীজি (সাঃ) কে একথা বলতে শুনেছেন যে, "তোমরা

বল যেরূপ মুয়ায্যিন বলে।" (অর্থাৎ আযানের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মুয়ায্যিনের অনুরূপ শব্দগুলো তোমরাও বল। কিন্তু حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةْ এবং حَيَّ عَلَى الْفَــلَاحْ এর স্থলে لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ বল।) অতঃপর (আযান শেষে) আমার প্রতি দরূদ পাঠ কর। কারণ, যে আমার প্রতি একবার দরূদ পাঠ করে, আল্লাহ তাআলা তার প্রতি দশবার রহমত নাযিল করেন। এরপর আল্লাহ তাআলার নিকট আমার জন্য উসীলার দরখাস্ত কর। (অর্থাৎ اَللّٰهُمَّ থেকে وَعَدْتَّهٗ পর্যন্ত দোআটি পড়।) বায়হাকী শরীফের বর্ণনায় 'وَعَدْتَّهٗ' শব্দের পর اِنَّكَ لَاتُخْلِفُ الْمِيْعَادَ বাক্যটিও রয়েছে। (আবুল হুসাইন)

সংযোজন ঃ আযান সম্পর্কে কতিপয় হাদীস ঃ ⦿ হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি খালেছ অন্তকরনে মুয়ায্যিনের "আল্লাহু আক্বার আল্লাহু আকবার" এর জবাবে "আল্লাহু আকবার-আল্লাহু আক্বার" বলবে, "আশ্হাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর জবাবে "আশ্হাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলবে, "আশ্হাদু-আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ" এর জবাবে "আশহাদু-আন্না-মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ বলবে, "হায়্যা আলাস্সালাহ্" এর জবাবে লা-হাওলা ওয়ালা-কুওয়াতা ইল্লা-বিল্লাহ বলবে; "হায়্যা আলাল্ফালাহ" এর জবাবে "লা-হাওলা-ওয়ালা-কুওয়াতা ইল্লা-বিল্লাহ" বলবে, "আল্লাহু আকবার-আল্লাহু আকবার" এর জবাবে "আল্লাহু আকবার-আল্লাহু আকবার" বলবে এবং লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ" এর জবাবে "লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ" বলবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (মুসলিম)

⦿ আল্কামা ইব্নে ওয়াক্কাস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ আমি মুয়াবিয়া (রাযিঃ) এর নিকট ছিলাম। তখন তাঁর মুয়ায্যিন আযান দিল। তিনি জবাবে তদ্রুপই বললেন যেরূপ মুয়ায্যিন বলল। কিন্তু "হায়্যা আলাস্সালাহ" এর জবাবে "লা-হাওলা-ওয়ালা-কুওয়াতা ইল্লা-বিল্লাহ" এবং "হায়্যা আলাল্ ফালাহ" এর জবাবে লা-হাওলা-ওয়ালা-কুওয়াতা ইল্লা-বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম" বললেন। তারপর মুয়ায্যিনের মতই বললেন। অতঃপর বললেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে এরূপ বলতে শুনেছি। (আহ্মাদ - মিশকাত)

⦿ যে ব্যক্তি মুয়ায্যিনের আযান শুনে বলবে ঃ وَاَنَا اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ رَضِيْتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلًا وَبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا ০ তার গুনাহ সমূহ মাফ করে দেয়া হবে। (মুসলিম, আবু দাউদ) এই দোআটি আযানের জওয়াবের পরে দরূদ শরীফের পূর্বে পড়া যেতে পারে।

◉ মুয়ায্যিনগণ কিয়ামতের দিন সর্বাধিক লম্বা ঘাড় বিশিষ্ট হবেন। (মুসলিম)

◉ মুয়ায্যিনের আওয়াজের দূরত্ব পর্যন্ত জ্বিন, ইন্সান ও যে কোন বস্তুই মুয়ায্যিনের আওয়াজ শুনবে, সে-ই কিয়ামতের দিন তার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে। (বুখারী)

◉ যে ব্যক্তি একমাত্র সওয়াবের উদ্দেশ্যে সাত বছর আযান দিবে, তার জন্য জাহান্নাম থেকে মুক্তি লিখে দেয়া হবে। (তিরমিযী, ইবনে মাজা)

◉ যে ব্যক্তি বার বছর (সওয়াবের উদ্দেশ্যে) আযান দিবে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে এবং প্রত্যহ তার জন্য আযানের বিনিময়ে ষাটটি নেকী লিখা হবে এবং প্রত্যেক ইকামতের জন্য ত্রিশটি নেকী লিখা হবে। (ইবনে মাজা)

আযান ও ইকামতের জওয়াব কিরূপ হবে ? উপরোক্ত হাদীস সমূহে বর্নিত দোআ এবং জওয়াবের অতিরিক্ত করা ঠিক হবে না। কারণ, ছহীহ হাদীস দ্বারা এতটুকুই প্রমানিত আছে। তবে ফজরের আযানে اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌمِنَ النَّـــوْمِ এর জওয়াবে صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ বলবে। ইকামতের জওয়াব আযানেরই অনুরূপ; কিন্তু قَدْقَامَتِ الصَّلٰـــوةُ এর জওয়াবে اَقَامَهَا اللهُ وَاَدَامَهَا বলবে। আযানের মৌখিক জওয়াব দেয়া মুস্তাহাব এবং মসজিদে গমনের মাধ্যমে জওয়াব দেয়া আবশ্যক। আযান ও ইকামতের শব্দগুলোর শেষ হরফকে সাকিন পড়া সুন্নাত।

আযান ও ইকামত একটি ইবাদত, তাই ইহার শব্দগুলোকে মনগড়াভাবে উচ্চারণ করা যাবে না ঃ যে কোন আমলই হোক না কেন, যতক্ষন পর্যন্ত তা সঠিক পদ্ধতিতে সুন্নাত অনুযায়ী না হবে, ততক্ষন পর্যন্ত তা দ্বীন বলে গণ্য হবে না।

শরীঅতের প্রতিটি হুকুম পালন করার পদ্ধতি কুরআন, সুন্নাহ ও সাহাবায়ে কেরামের আমল দ্বারা প্রমানিত। ফুকাহায়ে কেরাম পরিষ্কার ভাবে এর পদ্ধতি বাতলে দিয়েছেন।

অতএব, আযানের এবং ইকামতেরও একটি সুন্নাত তরীকা থাকা স্বাভাবিক। তাই আযান ও ইকামতের সুন্নাত নিয়ম জেনে নেয়া আমাদের কর্তব্য। নিজের মনমত আযান ও ইকামতের শব্দগুলিকে উচ্চারণ করা উচিত হবে না। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য মজলিসে দাওয়াতুল হক কর্তৃক প্রকাশিত "আযান-ইকামতের ফাযায়েল, মাসায়েল ও তাজবীদ" নামক গ্রন্থখানি দেখা যেতে পারে।

২৮ নং হাদীস ঃ

اَحَبُّ الْبِلَادِ اِلَى اللهِ مَسَاجِدُهَا وَاَبْغَضُ الْبِلَادِ اِلَى اللهِ اَسْوَاقُهَا

রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "সমস্ত শহরের (স্থান সমূহের) মধ্যে আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয় স্থান মসজিদ এবং অধিক ঘৃনিত স্থান বাজার। (মুসলিম)

২৯ নং হাদীস

مَنْ بَنٰى لِلّٰهِ مَسْجِدًا بَنَى اللّٰهُ لَهٗ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ

রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মান করবে, আল্লাহ পাক তার জন্য বেহেশ্‌তে ঘর নির্মান করবেন।" (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ মুসলমান এই সুসংবাদের উপযুক্ত তখনই হবে যখন মসজিদ একমাত্র আল্লাহতাআলার সন্তুষ্টির জন্য নির্মান করবে।

সংযোজন ঃ মসজিদ আল্লাহর ঘর, এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ওয়াজিব ঃ হাদীস শরীফে আছে - ⦿ যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে মহব্বত রাখতে চায়, সে যেন আমাকে মহব্বত করে। যে আমার সাথে মহব্বত রাখতে চায়, সে যেন আমার সাহাবীগণকে মহব্বত করে। যে সাহাবীগণের সাথে মহব্বত রাখতে চায়, সে যেন কুরআনকে মহব্বত করে। যে কুরআনের সাথে মহব্বত রাখতে চায়, সে যেন মসজিদসমূহকে মহব্বত করে। কেননা, মসজিদ আল্লাহর ঘর। আল্লাহ এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের আদেশ দিয়েছেন এবং এতে বরকত রেখেছেন। মসজিদ আল্লাহর হেফাজতে থাকে এবং মসজিদের সাথে সম্পর্কিতরাও আল্লাহর হেফাযতে থাকে। তাঁরা (মুসল্লিমগণ) নামাযে মশগুল হন আর আল্লাহ তাঁদের কার্যোদ্ধার করেন এবং অভাব দূর করেন। তাঁরা মসজিদে থাকা অবস্থায় আল্লাহ তাআলা পশ্চাতে তাঁদের জিনিসপত্রের হেফাযত করেন। (কুরতবী)

⦿ মসজিদে কোন নাপাকী আনা হলে মসজিদ এমন কুঞ্চিত হয়, যেমন আগুনের সংস্পর্শে মানুষের চামড়া কুঞ্চিত হয়। (তাঃমাঃ কুঃ)

⦿ যে ব্যক্তি মসজিদ থেকে নাপাকী, নোংড়ামী ও কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দিবে, আল্লাহ তাআলা তার জন্যে জান্নাতে গৃহ নির্মান করে দিবেন। (ইবনে মাজা)

⦿ হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) বলেন ঃ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বাসগৃহের মধ্যে মসজিদ অর্থাৎ নামায পড়ার বিশেষ জায়গা তৈরী করার এবং তাকে পবিত্র রাখার জন্যে আদেশ করেছেন। (কুরতুবী)

⦿ হযরত ফারুকে আযম (রাযিঃ) বলেন ঃ আমি দেখেছি, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ব্যক্তির মুখে রসুন অথবা পেয়াজের দুর্গন্ধ অনুভব করতেন, তাকে মসজিদ থেকে বের করে "বাকী" নামক স্থানে পাঠিয়ে দিতেন এবং বলতেন ঃ যে

ব্যক্তি রসুন-পেয়াজ খেতে চায়, সে যেন উত্তমরূপে পাকিয়ে খায়, যাতে দুর্গন্ধ নষ্ট হয়ে যায়।

এ-হাদীসের আলোকে ফকীহ আলেমগণ বলেছেন, যে ব্যক্তি এমন রোগে আক্রান্ত যে, তার কাছে দাঁড়ালে অন্য লোকের কষ্ট হয়, তাকেও মসজিদ থেকে সরিয়ে দেয়া যায়। তার নিজেরও উচিত, যতদিন এই রোগ থাকে ততদিন গৃহে নামায পড়া।

মসজিদ ছাড়া অন্যান্য দ্বীনী প্রতিষ্ঠানও সম্মানের পাত্র ঃ যেসবগৃহ কুরআন শিক্ষা, ধর্ম শিক্ষা, ওয়াজ-নসীহত অথবা যিকিরের জন্যে বিশেষভাবে নির্মিত সেগুলোও সম্মানের পাত্র। যেমন, মাদ্রাসা ও খানকাহ ইত্যাদি। এগুলোর প্রতিও আদব এবং সম্মান প্রদর্শন করা অপরিহার্য।

মসজিদে প্রবেশের সুন্নাত সমূহ ঃ

(১) মসজিদে ডান পা আগে রাখা। (২) বিসমিল্লাহ বলা (৩) দরুদ শরীফ পড়া (৪) অতঃপর এই দোআ পড়াঃ اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

উল্লেখিত দোআ সমূহ একত্রে এভাবে পড়া যায় ঃ بِسْمِ اللّٰهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

(৫) মসজিদে প্রবেশ করে এতেকাফের নিয়ত করা।

মসজিদ থেকে বের হওয়ার সুন্নাত সমূহ ঃ (১) বিসমিল্লাহ বলা (২) দরূদ শরীফ পড়া (৩) অতঃপর এই দোআ পড়া ঃ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

উল্লেখিত দোআ সমূহ একত্রে এভাবে পড়া যায় ঃ بِسْمِ اللّٰهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ (৪) মসজিদের বাইরে জুতার উপর আগে বাম পা রাখা। (৫) তারপর প্রথমে ডান পায়ে জুতা পরা। এই শেষোক্ত কাজটি কেবল মসজিদের সাথে খাছ নয়।

৩০ নং হাদীস ঃ

لَاتَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَلَاصُوْرَةُ تَمَاثِيْلَ

রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "সেই গৃহে রহমতের ফেরেশ্‌তা প্রবেশ করে না, যেই গৃহে,কুকুর ও প্রাণীর ছবি থাকে।" (বুখারী শরীফ) অতীব পরিতাপের বিষয় যে, বর্তমানে মানুষ এ বিষয়টিকে মোটেই গুরুত্ব দিচ্ছে না।

সংযোজন ঃ ইমাম খাত্তাবী বলেন যে, এ দ্বারা রহমত ও বরকতের ফিরিশতাদেরকে বুঝানো হয়েছে। রক্ষণাবেক্ষনের দায়িত্বে নিয়োজিত ফিরিশতারা সকল গৃহেই গিয়ে থাকে। আর কুকুর দ্বারা বুঝানো হয়েছে নিছক সখের বশে পালিত কুকুরকে। শিকার

ধরা, পাহারা দেয়া ইত্যাদি কাজের জন্য কুকুরের প্রয়োজন হলে তাতে কোন বাধা নেই। আর ছবি বলতে বুঝানো হয়েছে, যে কোন প্রাণীর ছবি বা প্রতিকৃতিকে, চাই তা যে জিনিসের ওপর যেভাবেই রক্ষিত থাকুকনা কেন। এ ধরনের সকল ছবি ও প্রতিকৃতিকে সাধ্যমত অপসারণ বা ধ্বংস করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সহীহ্ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, হযরত আলী (রাযিঃ) সকল ছবি বা প্রতিকৃতিকে ধ্বংস করার এবং সকল উঁচু কবরকে সমান করে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

মূর্তি পূজার সূচনা কিভাবে হয়েছে? ঃ পূর্ববর্তী উম্মতগনের মধ্যে প্রত্যক্ষ করা হয়েছে যে, তারা পূণ্যবান ব্যক্তিদের স্মৃতি রক্ষার্থে তাঁদের চিত্র নির্মান করে উপাসনালয়ে রাখত, যাতে তাঁদের উপাসনার কথা স্মরন করে তারাও উপাসনায় উদ্বুদ্ধ হয়। কিন্তু ক্রমান্বয়ে তারা এসব চিত্রকেই উপাস্যরূপে স্থির করে নিয়েছে এবং মূর্তিপূজা শুরু করে দিয়েছে। এভাবে পূর্ববর্তী উম্মতগনের মধ্যে প্রাণীদের চিত্র মূর্তিপূজা প্রচলনের সহায়ক হয়েছে।

ইসলাম কিয়ামত পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত থাকবে, এটা আল্লাহর অমোঘ বিধান। তাই এতে এ বিষয়ের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে যে, মূল হারাম বস্তুকে যেমন নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তেমনি তার উপায় উপকরণ এবং নিকটবর্তী সহায়ক কারণ সমূহকেও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মূল মহা অপরাধ হচ্ছে শির্ক ও মূর্তিপূজা। একে নিষিদ্ধ করার সাথে সাথে যেসব ছিদ্রপথে মূর্তিপূজার অনুপ্রবেশ ঘটতে পারে, সেসব পথেও পাহারা বসিয়ে দেয়া হয়েছে এবং মূর্তিপূজার উপায় ও নিকটবর্তী কারণ সমূহকেও হারাম করে দেয়া হয়েছে। এই নীতির ভিত্তিতেই প্রাণীদের চিত্র নির্মান ও ব্যবহার হারাম করা হয়েছে। অনেক ছহীহ ও মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা এই নিষেধাজ্ঞা প্রমানিত রয়েছে।

প্রাণীর ছবি আঁকা, ছাপানো, খোদাই করা, টানানো ও সংরক্ষন ঃ কতিপয় হাদীস ঃ ✪ যে ব্যক্তি পৃথিবীতে কোন প্রাণীর প্রতিচ্ছবি বা ছবি তৈরী করেছে, কিয়ামতের দিন তাকে ঐ প্রতিচ্ছবি বা ছবিতে প্রাণ সঞ্চার করার নির্দেশ দেয়া হবে। কিন্তু তা সে কখনো পারবে না। (বুখারী)

✪ হযরত আয়িশা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সফর থেকে গৃহে ফিরলেন। তখন আমি আমার ঘরের দেয়ালের কুঠরিকে এমন একটা পর্দা দিয়ে ঢেকে রেখেছিলাম, যাতে কতকগুলো ছবি ছিল। পর্দাটি দেখা মাত্র তাঁর মুখমন্ডল বিবর্ন হয়ে গেল। তিনি বললেনঃ হে আয়িশা ! যারা নিজের সৃষ্টিকে আল্লাহর সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ করবে, কিয়ামতের দিন তারাই কঠোরতম শাস্তি ভোগ করবে। হযরত আয়িশা বলেন ঃ এরপর আমি সেই পর্দাটা কেটে দুভাগ করে ফেলি এবং তা দিয়ে দুটো বালিশ বানাই। (বুখারী, মুসলিম)

✪ প্রত্যেক চিত্রকর দোযখবাসী হবে। তার প্রতিটি ছবির জন্য তাকে এক একটা প্রাণ দেয়া হবে এবং প্রত্যেকটা প্রান জাহান্নামের আগুনে আযাব ভোগ করবে। (বুখারী, মুসলিম)

৩১ নং হাদীস

لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتّٰى يُحِبَّ لِاَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন বান্দা পূর্ণ ইমানদার হতে পারবেনা, যতক্ষন সে নিজের জন্য যাহা পছন্দ করে অপর ভাইয়ের জন্য তাপছন্দ না করবে। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে পরের কল্যানকামনা ও ইনসাফের শিক্ষা দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ মানুষ নিজেকে যেমন বিপদ থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করে তদ্রুপ অন্যকেও বাঁচাবার চেষ্টা করা উচিত এবং যেই মঙ্গল ও কল্যান নিজের জন্য কামনা করে সেই মঙ্গল ও কল্যান অপরের জন্যেও কামনা করা উচিত।

৩২ নং হাদীস

مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَشْرًا

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরূদ পাঠ করবে, আল্লাহ তাআলা তার প্রতি দশবার রহমত নাযিল করবেন।" (মুসলিম শরীফ) অপর এক বর্ণনায় আছে, দশটি গুনাহ মাফ হবে এবং দশটি মর্যাদাও বৃদ্ধি পাবে।

সংযোজন ঃ দরূদ শরীফ পাঠকারীদের জন্য হাদীসে বর্নিত সুসংবাদ ঃ

⦿ আল্লাহ তাআলার অগনিত বিশেষ রহমত তার প্রতি নাযিল হবে এবং তাঁর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য হাসিল হবে। ⦿ রহমাতুল লিল আলামীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সন্তুষ্টি, ভালবাসা ও নৈকট্য হাসিল হবে এবং সুপারিশ নসীব হবে। ⦿ দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় চিন্তার সমাধান হবে।

দরূদ শরীফের ফযীলত সম্পর্কে কুরআনে কারীম ঃ এ সম্পর্কে নিম্নের আয়াতটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ – يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا

অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশ্তাগণ নবীর প্রতি সালাত প্রেরণ করেন। হে ঈমানদারগণ! তোমরাও তাঁর প্রতি সালাত ও সালাম প্রেরণ কর।

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বহু বিধি-বিধান বর্ণনা করেছেন। কোন বিধান সম্পর্কে একথা বলেননি যে, আমি একাজ করি, তোমরাও কর। একমাত্র নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরূদ সম্পর্কেই এরূপ বলেছেন। এর চেয়ে বড় ফযীলত আর কি হতে পারে যে, এ আমলের মধ্যে আল্লাহ তাআলা এবং তাঁর ফেরেশ্‌তাদের সাথে মুমিনরাও শরীক রয়েছে। নিঃসন্দেহে এটা দরূদ শরীফের একটি বড় বৈশিষ্ট এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার অতি প্রিয় হওয়ার পরিচায়ক।

সালাত শব্দের অর্থ ঃ রহমত, দোআ ও প্রশংসাকীর্তন এবং সালাম শব্দের অর্থ সালামত ও নিরাপত্তা। আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে হলে 'সালাত' অর্থ রহমত। ফেরেশ্‌তাগনের পক্ষ থেকে হলে দোআ ও ইস্তিগ্‌ফার এবং সাধারণ মুমিনগনের পক্ষ থেকে হলে দোআ, প্রশংসা ও সম্মানের সমষ্টি। পরিভাষায়, বান্দাদের সালাতের অর্থ হলো ঃ আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি এমন রহমত অবতরনের দরখাস্ত করা, যেই রহমত উভয় জগতের সকল কল্যাণকে সামিল করে। (আশিয়্যাতুল্ লুমআত শরহে মিশকাত)

সালাত ও সালাম এর তরীকা-পদ্ধতি ঃ সহীহ বুখারী ও মুসলিম সহ সকল হাদীস গ্রন্থে এ হাদীসখানা আছে যে, কা'ব ইবনে উজরা (রাযিঃ) বলেন ঃ ('সালাত ও সালাম' সম্পর্কীয় উপরোক্ত আয়াত শরীফ নাযিল হওয়ার পর) একব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করল যে, 'সালাম এর তরীকা তো আমরা জেনেছি (আত্তাহিয়্যাত এর মধ্যে), এখন আমাদেরকে সালাতের তরীকাও শিখিয়ে দিন। তখন নবীজী বললেন ঃ এই শব্দগুলো বল ঃ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ– اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

সাহাবা কিরামের পক্ষ থেকে এই প্রশ্ন হওয়ার কারণ প্রধানতঃ এই ছিল যে, যেহেতু নবীজীর পক্ষ থেকে তাদেরকে 'আত্তাহিয়্যাত' এর মধ্যে সালামের ত্বরীকা শেখানো হয়েছে "আস্‌সালামু আলাইকা আয়্যুহান্নাবিয়্যু" বলে, তাই তাঁরা সালাতের ভাষা নিজেরা তৈরী করা পছন্দ করেননি; বরং নবীজীরই কাছ থেকে শিখে নিয়েছেন। এ কারণেই নামাযের মধ্যে সাধারণতঃ এই শব্দের সাথেই দরূদপাঠ অবলম্বন করা হয়েছে। অবশ্য তাতে বাক্য ও শব্দের পরিবর্তন নিষিদ্ধ নয়। কেননা, স্বয়ং নবীজী থেকেই বিভিন্নরূপ বাক্যে সালাতের বর্ণনা রয়েছে। অতএব, এমন প্রত্যেক বাক্য দ্বারাই

'সালাত ও সালাম' পাঠ করার হুকুম পালন করা যেতে পারে, যার মধ্যে 'সালাত ও সালাম' এর শব্দ উল্লেখ থাকে। তবে নবীজী থেকে বর্ণিত শব্দ ও বাক্যে দরূদ পাঠ করা হলে অবশ্যই অধিক সওয়াব ও বরকত লাভ হবে। কিয়ামত পর্যন্ত নামাযের বৈঠকে উপরিউক্ত শব্দ ও বাক্য দ্বারাই সালাত ও সালাম পাঠ করা সুন্নত এবং নামাযের বাহিরে রওযা মুবারকের সামনে নবীজীকে সম্বোধনের শব্দ 'আস্‌সালাতু ওয়াস্‌সালামু আলাইকা' বলা সুন্নত। এছাড়া গায়েবানা ও দূরবর্তী অবস্থায় নবীজীকে সম্বোধন করে সালাত ও সালাম পাঠ করার নিয়ম সাহাবা, তাবেঈন এবং আইম্মায়ে ফুকাহা ও মুহাদ্দেসীন থেকে বর্ণিত নেই। (তাঃ মাঃ কুঃ)

দরূদের ফযীলত সম্পর্কে কতিপয় হাদীস ঃ ⊙ নিশ্চয় সেই ব্যক্তি কিয়ামতের দিন সর্বক্ষেত্রে আমার অধিক নিকটবর্তী থাকবে, যে আমার প্রতি অধিক পরিমানে দরূদ পাঠ করবে। (তিরমিযী) ⊙ এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আরয করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! যদি আমি আমার সমস্ত (দোআর) সময়টাকে আপনার প্রতি দরূদ পাঠের কাজে ব্যয় করি, তবে কেমন হয় ? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তাহলে আল্লাহ তাআলা তোমাকে দুনিয়া ও আখেরাতের সমস্ত চিন্তা থেকে মুক্ত করে দিবেন। (তিরমিযী)

⊙ আল্লাহ তাআলার এমন বহু ফেরেশ্‌তা রয়েছে যারা পৃথিবীতে ঘুরে বেড়ায় এবং আমার উম্মতের পক্ষ থেকে আমার কাছে সালাম পৌঁছায়। (নাসায়ী)

⊙ আল্লাহ তাআলা আমার কবরের জন্য একজন ফেরেশ্‌তা নির্ধারিত করে রেখেছেন। তাকে সমস্ত মাখলুকের কথা শোনার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। কিয়ামত পর্যন্ত যে কোন লোক আমার প্রতি দরূদ পাঠ করবে, সেই ফেরেশতা সে ব্যক্তির নাম ও তার পিতার নাম সহ তার দরূদ আমার নিকট পৌঁছাবে। (তারগীব)

⊙ যে ব্যক্তি আমার কবরের কাছে থেকে আমার প্রতি দরূদ পাঠ করবে, আমি তার দরূদ শুনব। আর যে ব্যক্তি দূর থেকে আমার প্রতি দরূদ পাঠ করবে তার দরূদ আমার কাছে পৌঁছে দেয়া হবে। (বায়হাকী)

⊙ যে ব্যক্তি আমার প্রতি সকাল বেলায় দশবার ও বিকাল বেলায় দশবার দরূদ পাঠ করবে সে কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ লাভ করবে। (তাবারানী)

⊙ যে ব্যক্তি কোন কিতাবে দরূদ লিপিবদ্ধ করার মাধ্যমে আমার প্রতি দরূদ প্রেরণ করে, যতদিন আমার নাম সেই কিতাবে থাকবে, ততদিন ফেরেশ্‌তাগণ তার প্রতি দরূদ প্রেরণ করবেন। (তাবারানী)

দরূদ শরীফ পাঠ না করার নিন্দা সম্পর্কীয় কতিপয় হাদীস ঃ ⊙ সেই ব্যক্তি অপমানিত হোক যার সামনে আমার নাম উচ্চারণ করা হলে সে দরূদ পাঠ করে না।

◉ সেই ব্যক্তি কৃপন, যার সামনে আমার নাম উচ্চারণ করা হলে সে দরূদ পাঠ করে না। ◉ যখন কোন সম্প্রদায় কোন মজলিসে বসে এবং সেই মজলিসে আল্লাহ তাআলার আলোচনা ও রাসূলের প্রতি দরূদ পাঠ করা না হয়, সেই মজলিসটি তাদের জন্য কিয়ামতের দিন অভিশাপ হয়ে দাঁড়াবে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করলে তাদেরকে শাস্তি দিবেন অথবা ইচ্ছা করলে তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। (আবু দাউদ)

সর্বোত্তম দরূদ শরীফ ঃ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ- اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

জুমআর দিনের বিশেষ দরূদ শরীফ ঃ ◉ হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) কর্তৃক বর্নিত হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি জুম্‌আর দিন আসরের নামাযান্তে নিজ জায়গা থেকে উঠার পূর্বে আশিবার এ দরূদ শরীফটি পড়বে - اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا তার আশি বছরের গুনাহ মাফ হয়ে যাবে এবং আশি বছরের ইবাদতের সওয়াব তার আমল নামায় লেখা হবে।

◉ হযরত আলী (রাযিঃ) থেকে বর্নিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ যে ব্যক্তি জুম্‌আর দিন একশতবার দরূদ শরীফ পাঠ করবে সে কিয়ামতের দিন এমন এক জ্যোতি নিয়ে উঠবে যে, যদি সেই জ্যোতি সমস্ত সৃষ্টিকে বন্টন করে দেয়া হয়, তবে সবার জন্যেই তা যথেষ্ট হবে।

◉ তোমরা জুম্‌আর দিন আমার প্রতি বেশী পরিমান দরূদ পাঠ কর। এ দরূদে ফেরেশ্‌তাগন উপস্থিত হন এবং এ দরূদ আমার কাছে পেশ করা হয়। (ইঃ মাঃ আঃ দাঃ)

দোআ কবুল হওয়ার জন্য দরূদ পাঠ করা শর্ত ঃ হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাযিঃ) বলেন ঃ দোআ আসমান ও যমীনের মাঝখানে থেমে যায়, উপরে যেতে পারে না যে পর্যন্ত রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি দরূদ প্রেরণ করা না হয়। (তিরমিযী, মাআরেফ)

দরূদ সম্পর্কে কতিপয় মাসাইল ঃ ◉ জীবনে কমপক্ষে একবার দরুদ পাঠ করা ফরয। নবীজীর নাম মুবারক উচ্চারণ করলে কিংবা শুনলে দরুদ পাঠ করা ওয়াজিব এবং স্বাভাবিকভাবে অন্যান্য অবস্থায় বেশী বেশী দরুদ পাঠ করা মুস্তাহাব।

◉ অধিকাংশ আলেমের মতে 'সালাত' শব্দটি নবীগণ ছাড়া অন্য কারো জন্যে ব্যবহার করা জায়েয নেই। তবে নবীগণের প্রতি দরুদ ও সালাম পাঠকালে আনুষংগিকভাবে অন্যদেরকে শামিল করে নেয়া জায়েয আছে।

⦿ একই মজলিসে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নাম বারবার উচ্চারিত হলে একবার দরূদ পাঠ করলেই ওয়াজিব আদায় হয়ে যায়। কিন্তু প্রত্যেকবার দরূদ পাঠ করা মুস্তাহাব।

⦿ মুখে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নাম উচ্চারণ করলে যেমন দরূদ ও সালাম পাঠকরা ওয়াজিব, তেমনি কলমে লেখার সময়ও দরূদ ও সালাম লেখা ওয়াজিব। এ - ক্ষেত্রে সংক্ষেপে 'সাঃ' লেখা যথেষ্ট নয়। সম্পূর্ণ দরূদ ও সালাম লেখা বিধেয়।

⦿ দরূদ ও সালাম উভয়টি লিখা কিংবা পাঠ করা উত্তম ও মুস্তাহাব। তম্মধ্যে যে কোন একটি পাঠ করলে অধিকাংশ ফেকাহবিদের মতে তাতেও কোন গুনাহ নাই।

⦿ কোন নামাযের পরে কিংবা অন্য কোন সময়ে মজলিসের আয়োজন করে সমবেতভাবে উচ্চস্বরে দরুদ ও সালাম পাঠ করা নবী, সাহাবী, তাবেঈন এবং আইম্মায়ে মুজতাহেদীন ও উলামায়ে সালাফ্ এর কারো থেকেই প্রমাণিত নয়। তাই এরূপ নিয়মের গুরুত্বারোপ করা ও তা নিয়ে বাড়াবাড়ি করা শরীঅতের দৃষ্টিতে ঠিক হবে না। একাকীভাবে আস্তে দরুদ পাঠ করলেও পূর্ণ সওয়াব লাভ হবে।

⦿ ওযু ছাড়া দরূদ পাঠ করা জায়েয এবং ওযুর সাথে পড়া খুবই উত্তম।

⦿ নামাযের বাইরে দরূদের মধ্যে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নামের পূর্বে 'সাইয়্যেদেনা' শব্দটি যোগ করা মুস্তাহাব। (দুররে মুখতার)

৩৩ নং হাদীস

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ اِنِّــىْ لَاَسْتَغْفِرُ اللهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ فِى الْيَوْمِ اَكْثَرَمِنْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً –

রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহর শপথ, আমি দৈনিক আল্লাহর নিকট সত্তর বারের অধিক ইস্তিগফার ও তওবা করি।" (বুখারী শরীফ)

সংযোজন ঃ-সাইয়্রেদুল ইস্তেগফার ও উহার ফজীলত ঃরাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লাম বলেছেন, সইয়্যেদুল ইস্তেগফার হল ঃ

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ لَاۤاِلٰهَ اِلَّاۤاَنْتَ خَلَقْتَنِىْ وَاَنَــاعَبْدُكَ وَاَنَــاعَلٰى عَــهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَااسْتَطَعْتُ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَاصَنَعْتُ اَبُوْءُلَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ وَاَبُوْءُ بِذَنْبِىْ فَاغْفِرْلِىْ فَاِنَّهٗ لَايَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ যে ব্যক্তি দিনের বেলায় উক্ত ইস্তিগফার ইয়াকীনের সাথে পড়ে অতঃপর সেদিন সন্ধ্যা হওয়ার পূর্বে মারা যায়,

সে জান্নাত বাসীদের অন্তর্ভূক্ত হবে এবং যে রাত্রিবেলায় উহা ইয়াকীনের সাথে পড়ে অতঃপর ভোর হওয়ার পূর্বে মারা যায়, সেও জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (বুখারী)

⊙তওবা ও ইস্তেগফারের ফজীলত : ⊙ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : হে লোকসকল! তোমরা আল্লাহর নিকট তওবাকর। কেননা, আমি তাঁর নিকট দৈনিক একশত বার তওবাকরি। (মুসলীম)⊙হযরত আবুবক (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সালল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ- সে ব্যক্তি গুনাহের উপর বহাল থাকেনা যে ইস্তেগফার করেনেয়। যদিও সে দিনে সত্তর বার গুনাহ করে (তিরঃ ও আবু দাঃ)

⊙ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আদম সন্তানের প্রত্যেকেই গুনাহগার। গুনাহগারদের মধ্যে উত্তম হলো তওবাকারীগণ। (তিরমিযী, মিশকাত)

⊙ যে ব্যক্তি সর্বদা ইস্তিগফার করে আল্লাহ তার জন্য সকল কষ্ট থেকে বের হওয়ার পথ করে দেন, তাকে সকল দুশ্চিন্তামুক্ত করেন এবং যা সে ধারনা করতে পারে না এমন জায়গা থেকে রিযিক দান করেন। (আবু দাউদ, মিশকাত)

⊙ হযরত ইবনে উমর (রাযিঃ) বলেন ঃ আমরা গণনা করতাম, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মজলিসে একশত বার বলতেন ঃ (رَبِّ اغْفِرْلِيْ وَتُبْ عَلَيَّ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ০) (আবু দাউদ)

৩৪ নং হাদীস

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ –

রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তি যিম্মাদার - দায়িত্ববান এবং প্রত্যেকেই তাঁর অধিনস্থের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।" (বুঃও মুঃ)

ব্যাখ্যা ঃ যেমনি ভাবে একজন বাদশাহ্ তার রাজ্যের দায়িত্বশীল, তার সকল প্রজা সম্পর্কে সে জিজ্ঞাসিত হবে - ইন্‌সাফ করেছে, না যুলুম করেছে, তেমনি ভাবে একজন পুরুষ তার পরিবার পরিজনের দায়িত্বশীল, সেও জিজ্ঞাসিত হবে তাদেরকে সৎকাজের শিক্ষা দিয়েছে কি-না এবং বদকাজ থেকে ফিরাতে চেষ্টা করেছে কিনা। অনুরূপ ভাবে, স্ত্রী তার স্বামীর ঘর ও মালপত্রের দায়িত্বশীল। সেও জিজ্ঞাসিত হবে স্বামীর কল্যান কামনা করেছে কি-না এবং তার মালের হেফাযত করেছে কি-না।

একককথায়, প্রতিটি মানুষ কিয়ামতের দিন তার অধীনস্থ ব্যক্তি ও বস্তু সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে যে, শক্তি ও সামর্থ থাকা সত্ত্বে তুমি তাদের হক আদায় করেছ কি-না ? এই প্রশ্ন কেবল বাদশাহকেই করা হবে না; বরং দলেরনেতা, সমাজপতি,

গোত্রপ্রধান, সর্দার-মাতব্বর সকলকেই জিজ্ঞাসা করা হবে যে, তুমি তোমার অধীনস্থদের কিভাবে পরিচালনা করেছ ? সুতরাং প্রত্যেক দায়িত্বশীল ব্যক্তি একথা স্মরণ রাখতে হবে এবং নিজের অনুসারী ও অধীনস্থ ব্যক্তিবর্গকে সঠিক পথে পরিচালনা করতে হবে।

সংযোজন ঃ দুর্বল শ্রেণী, দাস-দাসী বা চাকর-চাকরানী ও জীব-জন্তুর সাথে নিষ্ঠুর আচরণ করার পরিণাম ঃ কতিপয় হাদীস ঃ ✪ পাঁচ ব্যক্তির উপর আল্লাহর ক্রোধ অবশ্যম্ভাবী। তিনি ইচ্ছা করলে দুনিয়াতেই তাদের উপর তা কার্যকর করবেন, নচেৎ আখিরাতে কার্যকর করবেন ঃ (১) কোন জাতির শাসক, যে তার প্রজাদের কাছ থেকে রাষ্ট্রের প্রাপ্য আদায় করে নেয়, কিন্তু তাদের উপর ইনসাফ ও সুবিচার করে না এবং তাদেরকে যুলুম থেকে রক্ষা করে না। (২) এমন নেতা, সকলেই যার আনুগত্য করে ও তার নির্দেশ মেনে চলে অথচ সে সবল ও দুর্বলের সাথে সমান আচরণ করে না এবং নিজের খেয়াল খুশীমত কথা বলে। (৩) যে ব্যক্তি নিজের পরিবার-পরিজন ও সন্তান-সন্ততিকে আল্লাহর হুকুম মানার নির্দেশ দেয় না এবং তাদেরকে ইসলামের বিধান শিক্ষা দেয় না। (৪) যে ব্যক্তি নিজের নিযুক্ত কর্মচারীর নিকট থেকে আপন প্রাপ্য কাজ পুরোপুরিভাবে আদায় করে নেয়, কিন্তু কর্মচারীর প্রাপ্য পারিশ্রমিক পুরোপুরিভাবে বুঝিয়ে দেয় না। (৫) যে ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীকে মোহরানা থেকে বঞ্চিত করে এবং তার উপর অত্যাচার চালায়। (কিঃ কাঃ)

✪ তাবরানী বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন সর্ব প্রথম যে বিবাদ বিচারের জন্য উঠবে তা হবে এক স্বামী ও তার স্ত্রী সংক্রান্ত। স্ত্রী কথা বলবে না, তবে তার হাত ও পা সাক্ষ্য দেবে, তার স্বামীর প্রতি সে-যে আচরণ করতো সে সম্পর্কে এবং স্বামীর হাত ও পা সাক্ষ্য দেবে, স্ত্রীর প্রতি সে ভালো বা মন্দ যে আচরণ করতো সে সম্পর্কে। এরপর মামলা উঠবে মনিব ও চাকর-চাকরানীদের সম্পর্কে। সেখানে কোন অর্থ-কড়ি দিয়ে বিবাদ মেটানো হবে না। কেবল মযলুমকে যালিমের নেক আমল দিয়ে দেয়া হবে। অতঃপর সকল প্রতাপশালী যালিম শাসককে লোহার শিকলে বেঁধে হাজির করা হবে এবং তাদেরকে জাহান্নামে পাঠানো হবে। (কিঃ কাঃ)

✪ অধিনস্থদের সাথে সদ্ব্যবহার সৌভাগ্যের উৎস আর তাদের সাথে দুর্ব্যবহার দুর্ভাগ্যের উৎস। (আহমাদ, আবু দাউদ)

✪ হযরত আবু মাসউদ (রাযিঃ) বলেন ঃ আমি একজন গোলামকে লাঠি দিয়ে পেটাচ্ছিলাম। এই সময় আমার পশ্চাতে একটা শব্দ শুনলাম ঃ জেনে রেখ, হে আবু মাসউদ ! আল্লাহ তাআলাই তোমাকে এই গোলামের উপর কর্তৃত্ব দিয়েছেন। আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমি আর কখনো দাস-দাসী ও চাকর-চাকরানীকে প্রহার

করবোনা। আমি ওকে আযাদ করে দিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এই কাজটি না করলে আগুন তোমাকে কিয়ামতের দিন ভস্মীভূত করে দিত। (মুসলিম)

✪ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো, অধিনস্থদেরকে কতবার ক্ষমা করবো। তিনি বললেন ঃ প্রতিদিন ৭০ বার। (কিঃ কাঃ)

✪ দাস-দাসী বা চাকর-চাকরানীকে প্রয়োজনীয় খাদ্যবস্ত্র দিতে হবে এবং তার ক্ষমতার অতিরিক্ত দায়িত্ব তার উপর চাপানো যাবে না। নিতান্তই যদি চাপাতে হয়, তবে তার সাথে নিজে কাজ করতে হবে। আল্লাহর সৃষ্টিকে কষ্ট দিওনা। তিনি তোমাদেরকে তাদের মালিক বানিয়েছেন। তিনি যদি চাইতেন, তবে তাদেরকে তোমাদের মালিক বানাতে পারতেন। (মুসলিম, তাবরানী)

✪ মানুষের নিজের অধিনস্থ মানুষ বা পশুকে ক্ষুধায় কষ্ট দেয়ার মত বড় গুনাহ আর হতে পারে না। (মুসলিম)

শাসক কর্তৃক শাসিতের উপর যুলুম ঃ কতিপয় হাদীস ঃ ✪ আল্লাহ যার শাসনাধীন কিছু লোককে ন্যস্ত করেছেন, অতঃপর সে তার হিত কামনা দ্বারা তাদেরকে উপকৃত করে না, তার উপর আল্লাহ জান্নাত হারাম করে দিবেন। (বুখারী)

✪ ন্যায়বিচারক বিচারপতিও কিয়ামতের দিন এমন একটি মুহুর্তের সম্মুখীন হবে, যখন সে আক্ষেপ করবে যে, দুইজনের মধ্যে কোন একটি খুরমা সংক্রান্ত দ্বন্দ্ব মেটাতেও তার না যাওয়া ভাল ছিল। (আহমাদ)

✪ দশজন মানুষের শাসককে কিয়ামতের দিন পিঠমোড়া দিয়ে বেঁধে আল্লাহর দরবারে হাযির করা হবে, অতঃপর হয় তার কৃত সুবিচার ও সুশাসন তাকে মুক্ত করবে, নচেৎ তার কৃত অবিচার ও দুঃশাসন তাকে ধ্বংস করে দিবে। (আহমাদ, ইবনে হাব্বান)

✪ হে আল্লাহ ! যারা উপর এই উম্মতের কোন দায়িত্ব অর্পন করা হয়, অতঃপর সে তাদের প্রতি নম্র আচরণ করে, তার প্রতি আপনি সদয় হোন, আর যে তাদের উপর কঠোরতা করে, তার প্রতি আপনিও কঠোরতা করুন। (মুসলিম, নাসায়ী)

✪ আমার উম্মতের দুই শ্রেণীর মানুষ আমার শাফাআত কখনো পাবে না, অত্যাচারী ও ধোকাবাজ শাসক এবং ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়িকারী। এদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়া হবে এবং এদের ব্যাপারে কেউ কোন দায়দায়িত্ব স্বীকার করবে না। (তাবরানী)

✪ আল্লাহর কসম ! আমি এই দায়িত্ব এমন কারো উপর অর্পন করবো না, যে তা চাইবে বা তার আকাংখা করবে। (বুখারী)

✪ যে বিচারক বা শাসক আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুসারে ফয়সালা করে না, আল্লাহ তার নামায কবুল করেন না। (হাকেম)

✪ বিচারক তিনি প্রকারের ঃ তম্মধ্যে দুই প্রকারের বিচারক জাহান্নামে যাবে এবং এক প্রকারের বিচারক জান্নাতে যাবে। যে বিচারক সত্য ও ন্যায় বিচার কি, তা জানে এবং তদনুযায়ী বিচার করে, সে জান্নাতে যাবে। আর যে বিচারক সত্য ও ন্যায় কি, তা জানে না আর যে বিচারক সত্য ও ন্যায় কি, তা জেনেও ন্যায় বিচার করে না এরা উভয়ে জাহান্নামী। জিজ্ঞাসা করা হলো ঃ যে জানে না তার কি দোষ ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ সে না জেনে বিচারক হয়েছে, এটাই তার দোষ। (হাকেম, আবু দাউদ, তিরমিযী)

✪ হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বলেন ঃ যাকে বিচারক নিয়োগ করা হলো, তাকে যেন ছুরি ছাড়াই যবাই করা হলো। (কিঃ কাঃ)

✪ আল্লাহ তাআলা ন্যায় বিচারক শাসককে যেদিন তাঁর ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না সেদিন, তাঁর আরশের ছায়ায় স্থান দিবেন। (বুখারী, মুসলিম)

✪ সেই সব ন্যায় বিচারক কিয়ামতের দিন জ্যোতির্ময় মিম্বরের উপর অধিষ্ঠিত থাকবে, যারা নিজের অধস্তনদের উপর, পরিবার-পরিজনদের ও আত্মীয়-স্বজনের উপর এবং জনগনের উপর শাসন পরিচালনার সময় ন্যায় বিচার করবে। (মুসলিম, নাসায়ী)

✪ তিন ব্যক্তি জান্নাতে যাবে না। যে ব্যক্তি পিতামাতার অবাধ্য, দায়ুস অর্থাৎ পরিবারের মধ্যে অশ্লীলতা ও পাপাচারের প্রশ্রয়দাতা এবং পুরুষ সুলভ আচরণকারী নারী। (কিঃ কাঃ)

✪ আমর ইবনে মুহাজির বলেন ঃ হযরত উমর ইবনে আব্দুল আজীজ (রহঃ) আমাকে বলেছিলেন ঃ যখন দেখবে আমি সত্যের পথ থেকে দুরে সরে গেছি, তৎক্ষনাত আমার কলার টেনে ধরে বলবে যে, ওহে উমর ! তুমি এ-কি করছ ? (কি কাঃ)

✪ হযরত ফুযায়ল ইবনে আয়ায (রহঃ) বলেন ঃ একজন বিচারপতির উচিত, একদিন বিচারকার্য পরিচালনা করা, আর একদিন নিজের জন্য কান্নাকাটি করা। (কিঃ কাঃ)

অতএব, ওহে যুলুমবাজ, অত্যাচারী শাসক ! মনে রেখ, তোমার কারাগার হচ্ছে জাহান্নাম এবং মহা প্রভু আল্লাহই তোমার চূড়ান্ত বিচারক। সেখানে তুমি কোন উযর-আপত্তি দেখাতে পারবে না। ভয়াবহ কবর হবে তোমার হাজতখানা। সুতরাং নিজেকে সেই শাস্তি থেকে বাঁচাও। আর ওহে মযলুম। মনে রেখ, যালিমকে বিন্দুমাত্রও ছাড় দেয়া হবে না। যদি দেখ, কোন যালিম এত প্রভাবশালী যে, তাকে আর প্রতিহত করা যাচ্ছে না, তবে তাকে আল্লাহর উপর সোপর্দ করে ঘুমিয়ে থাক। দেখবে, হয়তো রাতের মধ্যেই সে কোন রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে যাবে, আল্লাহর পাকড়াও থেকে সে কিছুতেই নিস্তার পাবেনা।

নেতা হওয়ার দু'টি শর্ত ঃ (১) সবর বা ধৈর্য্যধারণ করা। অর্থাৎ আল্লাহ পাকের আদেশসমূহ পালনে অটল ও দৃঢ়পদ থাকা এবং তাঁর নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ থেকে নিজেকে

বিরত রাখা। শরীয়তের যাবতীয় নির্দেশাবলী এর অন্তর্গত - যা এক বিরাট কর্মগত দক্ষতা ও সাফল্য। (২) আল্লাহর আয়াত সমূহের উপর ইয়াকীন বা অটুট বিশ্বাস স্থাপন করা। আয়াতসমূহের মর্ম অনুধাবন এবং অতঃপর তাতে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা উভয়ই এর অন্তর্গত। এটা এক বিরাট জ্ঞানগত দক্ষতা ও সাফল্য। এক কথায়, আল্লাহ পাকের নিকট নেতৃত্ব ও অনুসরনের যোগ্য কেবল তারাই যারা আমল ও ইল্‌ম উভয় দিকে পূর্ণতা লাভ করেছে। ইবনে কাসীর (রহঃ) কিছু সংখ্যক উলামার মন্তব্য উদ্ধৃত করেছেন যে- "بِالصَّبْرِ وَالْيَقِيْنِ تُنَالُ الْإِمَامَةُ فِي الدِّيْـــنِ" অর্থাৎ, ধৈর্য্য ও দৃঢ় বিশ্বাসের মাধ্যমেই দ্বীনের ক্ষেত্রে নেতৃত্বের মর্যাদা লাভ করা যায়।

৩৫ নং হাদীস ঃ

مَنْ اَحَبَّ لِلّٰهِ وَاَبْغَضَ لِلّٰهِ وَاَعْطٰى لِلّٰهِ وَمَنَعَ لِلّٰهِ فَقَدْ اِسْتَكْمَلَ الْاِيْمَانَ –

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি মহব্বত করল আল্লাহ্‌র জন্য, শত্রুতা রাখল আল্লাহর জন্য, দান করল আল্লাহর জন্য এবং দান হতে বিরত থাকল আল্লাহর জন্য, নিশ্চয় সে তার ঈমানকে পরিপূর্ণ করে নিল (আঃ দাঃ তিরা)

ব্যাখ্যা ঃ সার কথা হলো, যে কোন কাজে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনকে লক্ষ্য বস্তু রূপে নিরূপন করতে পারাই পরিপূর্ন ঈমানের আলামত। অর্থাৎ যদি কারো সংগে মহব্বত কিংবা দুশমনী হয়, তাহলে যেন আল্লাহর জন্যই হয়, পার্থিব স্বার্থে নয়। এক কথায়, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দোস্তের সংগে দোস্তী রাখা এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দুশ্‌মনের সংগে দুশমনী রাখা পরিপূর্ন ঈমানের চিহ্ন। আবু দাউদ শরীফের এক বর্ণনায় একে শ্রেষ্ঠতম আমল বলা হয়েছে। কেননা, সকল নিষিদ্ধ বিষয় বর্জন এবং সকল করনীয় বিষয় পালনের পরই এই সদ্‌গুনটি হাসিল হয়ে থাকে।

সংযোজন ঃ দুষ্কর্মপরায়ন ও ধর্মদ্রোহী বন্ধুর বন্ধুত্ব কিয়ামতের দিন অনুতাপ ও দুঃখের কারণ হবে ঃ আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ পরকালের শাস্তি সামনে দেখে তারা পরিতাপের সাথে হস্তদ্বয় কামড়াবে এবং বলবে ঃ হায় ! আমার দুর্ভাগ্য, আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহন না করতাম। (সূরা ফোরকান - ২৮)

হাদীস শরীফে আছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ لَاتُصَاحِبْ اِلَّا مُؤْمِنًا وَلَايَاكُلْ مَـــالَكَ اِلَّا تَقِــيٌّ অর্থাৎ মুমিন ব্যতীত কোন অমুসলিমকে বন্ধু করোনা এবং তোমার ধন-সম্পদ (বন্ধুত্বের দিক দিয়ে)যেন পরহেযগার ব্যক্তিই খায়। অর্থাৎ পরহেযগার নয়, এমন ব্যক্তির সাথে বন্ধুত্ব করো না। (তিরমিযী ও আবু দাউদ) অন্য এক রিওয়ায়েতে আছে اَلْمَرْءُ عَلٰى دِيْنِ خَلِيْلِهٖ

فَلْيَنْظُرْ اَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ – অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষ (অভ্যাসগত ভাবে) বন্ধুর ধর্ম ও চাল-চলন অবলম্বন করে। তাই কিরূপ লোককে বন্ধুরূপে গ্রহন করা হচ্ছে, তা পূর্বেই ভেবে দেখা উচিত। (বুখারী) হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো যে, আমাদেব মজলিসী বন্ধুদের মধ্যে কে উত্তম ? তিনি বললেন ঃ

مَنْ ذَكَّرَكُمْ بِاللهِ رُؤْيَتُهُ وَزَادَكُمْ فِى عِلْمِكُمْ مَنْطِقُهُ وَذَكَّرَكُمْ بِالْاٰخِرَةِ عَمَلُهُ

অর্থাৎ যাকে দেখে আল্লাহ্র কথা স্মরণ হয়, যার কথা বার্তায় তোমার জ্ঞান বাড়ে এবং যার কর্ম দেখে পরকালের স্মৃতি তাজা হয়। (কুরতবী)

প্রকৃত বন্ধুত্ব তাই, যা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য হয় ঃ মানুষ যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক নিয়ে দুনিয়াতে গর্ব করে এবং যার জন্যে হালাল ও হারাম এক করে দেয়, কিয়ামতেরদিন সে সম্পর্ক কেবল নিষ্ফলই হবে না; বরং তা শত্রুতায় পর্যবসিত হবে। হাফেজ ইবনে কাছীর (রহঃ) এ প্রসংগে হযরত আলী (রাযিঃ) এর উক্তি উল্লেখ করেছেন যে "দুই মুমিন বন্ধু এবং দুই কাফের বন্ধু হবে। মুমিন বন্ধুদ্বয়ের মধ্যে একজনের ইন্তেকাল হলে তাকে জান্নাতের সুসংবাদ শুনানো হবে। তখন তার আজীবন বন্ধুর কথা মনে পড়লে সে দোআ করবে। ইয়া আল্লাহ ! আমার অমুক বন্ধু আমাকে আপনার ও আপনার রাসূলের আনুগত্য করার আদেশ দিত, সৎকাজে উৎসাহ দিত এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করত এবং আপনার সাথে সাক্ষাতের বিষয় স্মরন করিয়ে দিত। কাজেই, হে আল্লাহ ! আমার পরে তাকে পথভ্রষ্ট করবেন না যাতে সেও জান্নাতের দৃশ্য দেখতে পারে, যা আপনি আমাকে দেখিয়েছেন। আপনি আমার প্রতি যেমন সন্তুষ্ট, তার প্রতিও তেমনি সন্তুষ্ট হোন। এই দোআর জওয়াবে তাকে বলা হবে, যাও তোমার বন্ধুর জন্যে আমি যে পুরস্কার ও সওয়াব রেখেছি, তা যদি তুমি জানতে পার, তবে কাঁদবে কম, হাসবে বেশী। এরপর অপর বন্ধুর ইন্তেকাল হয়ে গেলে উভয়ের রূহ একত্রিত হবে। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে বলবেন, তোমরা একে অপরের প্রশংসা কর। তখন তাদের প্রত্যেকেই অপরের সম্পর্কে বলবে ঃ সে শ্রেষ্ঠ ভাই, শ্রেষ্ঠ সঙ্গী ও শ্রেষ্ঠ বন্ধু।

এর বিপরীতে কাফের বন্ধুদ্বয়ের মধ্যে একজন মারা গেলে তাকে জাহান্নামের ঠিকানা জানানো হবে। তখন তার বন্ধুর কথা মনে পড়বে এবং সে দোআ করবে ইয়া আল্লাহ ! আমার অমুক বন্ধু আমাকে আপনার ও আপনার রাসূলের অবাধ্যতা করার আদেশ করত, মন্দ কাজে উৎসাহ দিত এবং ভাল কাজে বাধা দিত। সে আমাকে বলত যে, আমি কখনো আপনার কাছে হাযির হব না। কাজেই হে আল্লাহ ! আমার পরে তাকে হেদায়েত দিবেন না যাতে সেও জাহান্নামের দৃশ্য দেখে, যা আপনি আমাকে দেখিয়েছেন। আপনি আমার প্রতি যেমন অসন্তুষ্ট, তেমনি তার প্রতিও অসন্তুষ্ট থাকুন।

এরপর একদিন অপর বন্ধুর ও মৃত্যু হয়ে যাবে এবং উভয়ের রূহ একত্রিত হবে। তাদেরকে বলা হবে, তোমরা একে অপরের পরিচয় বর্ণনা কর। তখন তাদের প্রত্যেকেই পরস্পরের সম্পর্কে বলবে ঃ সে নিকৃষ্ট ভাই, নিকৃষ্ট সঙ্গী এবং নিকৃষ্ট বন্ধু।"

একারনেই ইহকাল ও পরকাল-এ উভয় দিক বিচারে উৎকৃষ্ট বন্ধুত্ব তাই যা আল্লাহর ওয়াস্তে হয়। যে দুই জন মুসলমানের মধ্যে আল্লাহর ওয়াস্তে বন্ধুত্ব হয়, তাদের ফযীলত ও মহত্ব অনেক হাদীসে বর্নিত আছে। তম্মধ্যে একটি এই যে, হাশরের ময়দানে তারা আল্লাহর আরশের ছায়াতলে থাকবে।

আল্লাহর ওয়াস্তে বন্ধুত্বের অর্থঃ অপরের সাথে কেবল ধর্মপরায়নতার ভিত্তিতে সম্পর্ক স্থাপন করা। সে মতে ধর্মীয় শিক্ষার উস্তাদ, শায়খ, মুর্শিদ, আলেম ও আল্লাহ ওয়ালাদের প্রতি এবং সারা মুসলিম বিশ্বের মুসলমানদের প্রতি নিঃস্বার্থ মহব্বত পোষন করা আল্লাহর ওয়াস্তে বন্ধুত্বের অন্তর্ভূক্ত।

আল্লাহর পথে ব্যয় করার একটি দৃষ্টান্ত ঃ যারা আল্লাহর পথে ব্যয় করে অর্থাৎ হজ্ব, জিহাদ কিংবা ফকীর, মিসকীন, বিধবা ও এতীমদের জন্য কিংবা সাহায্যের নিয়তে আত্মীয় স্বজনদের জন্যে যারা অর্থ ব্যয় করে, কুরআনে বর্নিত তাদের দৃষ্টান্ত এমন, যেমন কেউ গমের একটি দানা সরস জমিতে বপন করল। এ দানা থেকে একটি চারা গাছ উৎপন্ন হল, যাতে গমের সাতটি শীষ এবং প্রত্যেকটি শীষে একশ করে দানা থাকে। এর ফল দাঁড়ালো এই যে, একটি দানা থেকে সাতশ দানা অর্জিত হয়ে গেল। আল্লাহর পথে ব্যয় করার সওয়াবও এক থেকে শুরু করে সাতশ পর্যন্ত পৌঁছে। সহীহ ও নির্ভরযোগ্য হাদীস সমূহে বর্নিত আছে, একটি সৎকর্মের সওয়াব দশগুন পাওয়া যায় এবং তা সাতশ গুনে পৌঁছে। ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, জিহাদ ও হজ্জে এক দিরহাম ব্যয় করার সওয়াব সাতশ দিরহাম এর সমান। এক কথায়, আল্লাহর পথে এক টাকা ব্যয় করার সওয়াব সাতশ টাকা ব্যয় করার সমান পাওয়া যায়। (তাঃ মাঃ কুঃ)

কৃষক গমের এক দানা থেকে সাতশ দানা তখনই পেতে পারে, যখন দানাটি হবে উৎকৃষ্ট এবং কৃষকও কৃষিবিষয়ে পুরোপুরি ওয়াকিফহাল হবে এবং জমিও হবে সরস। কেননা, এ তিনটির যে কোন একটি বিষয়ে অভাব হলে, হয় দানা বেকার হয়ে যাবে - মোটেই উৎপন্ন হবে না কিংবা এক দানা থেকে সাতশ দানার ফলন হবে না।

এমনিভাবে সাধারণ সৎকর্ম এবং বিশেষ করে আল্লাহর পথে কৃত ব্যয় গ্রহণীয় এবং অধিক সওয়াব লাভের যোগ্য হওয়ার জন্য ও তিনটি শর্ত রয়েছে। এক ঃ পবিত্র ও হালাল ধন-সম্পদ ব্যয় করা। হাদীসে আছে, আল্লাহ তাআলা পবিত্র ও হালাল বস্তু ছাড়া কিছুই গ্রহন করেন না। দুই ঃ সদুদ্দেশ্যে ব্যয় করা। কোন খারাপ নিয়ত কিংবা নাম জষ অর্জনের উদ্দেশ্য না থাকা। তিন ঃ যাকে দান করবে, সে দানের যোগ্যপাত্র হতে হবে।

দান-সদকা গ্রহনীয় হওয়ার শর্তাবলী ঃ (১) যে ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করা হয়, তা হালাল হতে হবে। (২) সুন্নাহ অনুযায়ী ব্যয় করতে হবে। অর্থাৎ যেন হকদারের হক নষ্ট না হয়, তার প্রতি লক্ষ রাখতে হবে। (৩) বিশুদ্ধখাতে ব্যয় করতে হবে। অর্থাৎ ব্যয়ের খাতটি শরীয়তের বিচারে বৈধ ও পছন্দনীয় কি-না, তা দেখতে হবে। (৪) দান করে খোটা দেয়া বা অনুগ্রহ প্রকাশ করা যাবে না। (৫) যাকে দান করা হবে, তার সাথে এমন ব্যবহার করা যাবে না, যাতে সে হেয় প্রতিপন্ন হয়। (৬) যা কিছু ব্যয় করা হয়, খাঁটি নিয়তের সাথে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই তা করতে হবে-নাম-যশের জন্য নয়।

নিজের কৃত দান খয়রাত ও অনুগ্রহের দোহাই দেয়া, খোটা দেয়া ও প্রচার করার পরিণাম ঃ ✪ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন তিন ব্যক্তির সাথে আল্লাহ কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না, তাদেরকে পাপ থেকে পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্য যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি নির্দিষ্ট রয়েছে ঃ পায়ের গিঁঠের নীচ পর্যন্ত কাপড় পরিধানকারী, নিজের কৃত দান সদকা ও অনুগ্রহের খোটা দাতা ও প্রচারকারী এবং মিথ্যা কসম খেয়ে পন্য দ্রব্য বিক্রয়কারী। (মুসলিম)

✪ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তিন ব্যক্তি জান্নাতে যেতে পারবে না ঃ পিতামাতাকে অসন্তুষ্টকারী, মদ্যপায়ী ও নিজের কৃত অনুগ্রহ ও দান খয়রাতের খোটা দান কারী। (নাসায়ী)

ইমাম ইবনে সীরীন (রহঃ) শুনতে পেলেন এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে বলছে ঃ আমি তোমাকে অমুক জিনিস দিয়েছি, অমুক উপকার করেছি। ইবনে সীরীন তাকে বললেন ঃ চুপ কর, উপকার করে তার হিসাব করলে কোন সওয়াব হয় না। (কিঃ কাঃ)

অপব্যয়, অপচয় ও বিশৃংখল ব্যয় নিষিদ্ধ ঃ হযরত মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ কেউ নিজের সমস্ত মাল হক আদায় করার জন্যে ব্যয় করে দিলে তা অযথা ব্যয় হবে না। পক্ষান্তরে, যদি অন্যায়-অহেতুক কাজে এক মুদ (একসের)ও ব্যয় করে, তবে তা অযথা ব্যয় বলে গণ্য হবে।

ইমাম কুরতবী (রহঃ) বলেন ঃ "হারাম ও অবৈধ কাজে এক দিরহাম খরচ করাও অপব্যয় এবং বৈধ ও অনুমোদিত কাজে সীমাতিরিক্ত খরচ করা, যদ্দরুন ভবিষ্যতে অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়ার আশংকা দেখা দেয় - এটাও অপব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য যদি কেউ আসল মুলধন ঠিক রেখে তার মুনাফাকে বৈধ কাজে মুক্ত হস্তে ব্যয় করে, তবে তা অপব্যয়ের অন্তর্ভূক্ত নয়।"

ভবিষ্যতঅবস্থা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে যা কিছু আছে, তৎক্ষনাৎ তা খরচ করে ফেলা এবং আগামীতে কোন অভাবী লোক এলে অথবা দ্বীনি প্রয়োজন দেখা দিলে দান

করতে অক্ষম হয়ে পড়া এটাই বিশৃংখল ব্যয়। (কুরতবী) কিংবা খরচ করার পর পরিবার পরজনের ওয়াজিব হক আদায় করতে অক্ষম হয়ে পড়াও বিশৃংখল ব্যয়। (মাযহারী) তবে, যারা এতটুকু সৎসাহসী যে, পরবর্তী কষ্টের জন্যে মোটেই ঘাবড়ায় না এবং হকদারদের হকও আদায় করতে পারে, তাদের জন্য এরূপ ব্যয় নিষিদ্ধ নয়। নিষিদ্ধ কেবল তাদের জন্যেই যারা ক্ষুধা ও উপবাসের কষ্ট সহ্য করতে পারেনা এবং খরচ করার পর-খরচ না করলেই ভাল হত-একথা বলে অনুতাপ ও আফ্সোস করে। এরূপ অনুতাপ তাদের বিগত সৎকাজকে নষ্ট করে দেয়। তাই তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

ইখলাসের সাথে দান করার শক্তি ঃ

عَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا خَلَقَ اللهُ الْاَرْضَ جَعَلَتْ تَمِيْدُ فَخَلَقَ الْجِبَالَ فَقَالَ بِهَا عَلَيْهَا فَاسْتَقَرَّتْ فَعَجِبَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ شِدَّةِ الْجِبَالِ فَقَالُوْا يَارَبِّ هَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْئٌ اَشَدُّ مِنَ الْجِبَالِ قَالَ نَعَمْ اَلْحَدِيْدُ فَقَالُوْا يَارَبِّ هَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْئٌ اَشَدُّ مِنَ الْحَدِيْدِ قَالَ نَعَمْ اَلنَّارُ فَقَالُوْا يَارَبِّ هَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْئٌ اَشَدُّ مِنَ النَّارِ قَالَ نَعَمْ اَلْمَاءُ فَقَالُوْا يَارَبِّ هَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْئٌ اَشَدُّ مِنَ الْمَاءِ قَالَ نَعَمْ اَلرِّيْحُ فَقَالُوْا يَارَبِّ هَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْئٌ اَشَدُّ مِنَ الرِّيْحِ قَالَ نَعَمْ اِبْنُ اٰدَمَ تَصَدَّقَ صَدَقَةً بِيَمِيْنِهٖ يُخْفِيْهَا مِنْ شِمَالِهٖ – رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

অর্থাৎ হযরত আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ আল্লাহ এই পৃথিবী সৃষ্টি করার পর সেটা কাঁপতে থাকে। তখন তিনি পাহাড় সৃষ্টি করে পৃথিবীর উপর উহা স্থাপন করার পর উহার কাঁপুনি বন্ধ হয় এবং তা স্থির হয়ে যায়। পাহাড়ের এই মজবুতী ও দৃঢ়তা দেখে ফেরেশ্তাগন আশ্চর্যান্বিত হন এবং আল্লাহ তাআলার নিকট জিজ্ঞাসা করেন ঃ হে পর্ওয়ারদেগার! পাহাড়ের চেয়ে কি আর কোন শক্ত বস্তু আছে? আল্লাহ তাআলা উত্তর দেন ঃ হ্যাঁ আছে, তা হলো লোহা। (কেননা, লোহা পাহাড় ভাঙতে পারে)। ফেরেশতাগণ জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে পরওয়ারদেগার! আপনার সৃষ্টিতে লোহার চেয়েও বেশী শক্ত জিনিস আছে কি? আল্লাহ তাআলা বললেন ঃ হ্যাঁ আছে, তা হলো আগুন। (কেননা, আগুন লোহাকে গলিয়ে তরল পদার্থে পরিণত করে দেয়।) তারপর ফেরেশতাগন জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনার সৃষ্টিতে আগুনের চেয়ে শক্তিশালী কোন বস্তু আছে কি? আল্লাহ তাআলা বললেন ঃ হ্যাঁ আছে, তা হচ্ছে পানি। (কেননা পানি আগুন নিভিয়ে দিতে পারে।) তারপর তারা জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনার সৃষ্টিতে পানির তুলনায় অধিক শক্তিশালী কোন বস্তু আছে কি? আল্লাহ তাআলা বললেন ঃ হ্যাঁ আছে, তা হচ্ছে বাতাস। (বাতাস পানিকে উড়িয়ে নিতে পারে।) ফেরেশতাগন আবার জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে পরওয়ারদেগার! আপনার সৃষ্টিতে বাতাস অপেক্ষা বেশী শক্তিশালী কোন বস্তু, আছে কি? আল্লাহ বললেন ঃ হ্যাঁ আছে, মানুষ যে ডান হাতে এমন গোপনে দান করে যে, বাম হাতকে তা জানতে দেয় না। (এমন ব্যক্তি সব কিছুকে পরাভূত করতে পারে।)

৩৬ নং হাদীস ঃ

اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَاذَنْبَ لَهُ–

রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "পাপ হতে তওবাকারী ঐ ব্যক্তির মত, যে পাপই করেনি।" (ইবনে মাজা, বায়হাকী)

ব্যাখ্যা ঃ তওবার মাধ্যমে নিস্পাপ হওয়ার জন্য খাঁটি তওবা হওয়া শর্ত। অর্থাৎ পুনরায় গুনাহ করার ইচ্ছা ও আশা অন্তরে না থাকা এবং মনের সংকল্প এমন হওয়া যে, তওবার পরে গুনাহের দিকে ফিরে যাওয়া এমন অসম্ভব মনে হবে যেমন দুধ তার স্তনের মধ্যে ফিরে যাওয়া অসম্ভব। (তওবা যতবার ভংগ হবে ততবার এরূপ প্রতিজ্ঞার সাথে তওবা করতে থাকলে তওবাকারী গুনাহের উপর বহাল আছে বলে গন্য হবে না।)

সংযোজন ঃ তওবার তাৎপর্য ও শর্তাবলী ঃ বান্দার হকের সাথে কিংবা আল্লাহর হকের সাথে সম্পর্কযুক্ত সব গুনাহই তওবা ও ইস্তিগফার দ্বারা মাফ হতে পারে। তবে তওবা ও ইস্তিগফারের স্বরূপ জানা জরুরী। শুধু মুখে 'আস্তাগ্‌ফিরুল্লাহ ওয়া আতূবু ইলাইহি' বলার নাম তওবা নয়। তাই আলেমগন এ-বিষয়ে একমত যে, গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি যদি সেজন্য অনুতপ্ত না হয় এবং অবিলম্বে তা পরিত্যাগ না করে এবং ভবিষ্যতে তা না করার সংকল্প না করে, তবে মুখে 'আস্তাগ্‌ফিরুল্লাহ' বলা তওবার সাথে উপহাস করা বৈ কিছু নয়। উপরোক্ত তিনটি বিষয় তওবা কবুল হওয়ার জন্য শর্ত। হযরত আলী (রাযিঃ) কে জিজ্ঞাসা করা হলো, তওবা কি ? তিনি বললেন ঃ ছয়টি জিনিসের একত্র সমাবেশ হলে তওবা হবে - (১) অতীত মন্দ-কর্মের জন্য অনুতাপ, (২) যেসব ফরয ও ওয়াজিব কর্মতরক করা হয়েছে সেগুলোর কাযা করা, (৩) কারো ধন-সম্পদ ইত্যাদি অন্যায়ভাবে গ্রহণ করে থাকলে তা প্রত্যার্পণ করা, (৪) কাউকে হাতে অথবা মুখে কষ্ট দিয়ে থাকলে সেজন্যে ক্ষমা নেয়া, (৫) ভবিষ্যতে সেই গুনাহের কাছে না যাওয়ার ব্যাপারে দৃঢ়-সংকল্প হওয়া, এবং (৬) নিজেকে যেমন আল্লাহ তাআলার নাফরমানি করতে দেখেছিল, তেমনি এখন আনুগত্য করতে দেখা। (তাঃ মাযহারী) এই শর্তগুলি সবার কাছে স্বীকৃত তবে কেউ সংক্ষেপে এবং কেউ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন।

বান্দার হকের সাথে যেসব গুনাহের সম্পর্ক সেগুলো বান্দার কাছ থেকেই মাফ করিয়ে নেয়া কিংবা হক পরিশোধ করে দেয়াও তওবার অন্যতম শর্ত।

---- ওযু, নামায, রোযা প্রভৃতি সৎকর্মের মাধ্যমে যে সব গুনাহ্ মাফ হয়, তা হলো সগীরা গুনাহ। কবীরা গুনাহ শুধু তওবা দ্বারাই মাফ হতে পারে।

তওবা গ্রহনের অধিকার আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নেই ঃ খৃষ্টান ও ইহুদীগণ এ ক্ষেত্রে মারাত্মক ভুলে পড়ে আছে। তারা পাদ্রী-পুরোহিতদের কাছে কিছু হাদিয়া-উপঢৌকনের বিনিময়ে পাপ মোচন করিয়ে নেয় এবং মনে করে যে, তারা মাফ করে দিলে আল্লাহ্র নিকটেও মাফ হয়ে যায়। বর্তমানে বহু মুসলমানও এধরনের ভ্রান্ত বিশ্বাস পোষন করে। অথচ কোন পীর বা আলেম কারো পাপ মোচন করিয়ে দিতে পারেন না; তাঁরা বড়জোর দোআ করতে পারেন।

৩৭ নং হাদীস ঃ

مَنْ حَجَّ فَزَارَ قَبْرِىْ بَعْدَ مَوْتِىْ كَانَ كَمَنْ زَارَ نِىْ فِىْ حَيٰوتِىْ –

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "আমার ওফাতের পর যে ব্যক্তি হজ্ব করে আমার কবর যিয়ারত করবে, সে ঐ ব্যক্তির মত হবে যে আমার জীবিতকালে আমার সহিত সাক্ষাত করল।" (বায়হাকী)

ব্যাখ্যা ঃ উক্ত হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, হজ্বের পর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে মদীনা তায়্যেবা যাওয়া চাই। অন্য এক বর্ননায় আছে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ যে ব্যক্তি আমার কবর যিয়ারত করবে তার জন্য আমার সুপারিশ ওয়াজিব হয়ে যাবে। আরেকটি হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহর হজ্ব করল অথচ আমার যিয়ারত করল না, সে আমার উপর যুলুম করল।

সংযোজন ঃ হজ্বের ফযীলত ঃ কতিপয় হাদীস ঃ ⦿ হযরত কাতাদাহ (রাযিঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা যখন হযরত ইবরাহীম (আঃ) কে হজ্জের ঘোষনা করতে বলেন, তখন তিনি সজোরে বললেন ঃ হে লোক সকল ! আল্লাহ তাআলা একটি গৃহ নির্মান করেছেন। তোমরা এর হজ্জ কর। আল্লাহ তাআলা তাঁর এই কণ্ঠ এমন প্রত্যেক ব্যক্তির কানে পৌঁছে দিলেন, কিয়ামত পর্যন্ত যাদের সম্পর্কে তিনি জানতেন যে, তারা হজ্জ করবে। (এহঃ উঃ)

⦿ যে ব্যক্তি হজ্জ করে অতঃপর ব্যভিচার ও পাপাচার না করে, সে ভূমিষ্ট হওয়ার দিনের মত গুনাহ থেকে পবিত্র হয়ে যায়। (বুখারী ও মুসলিম)

◉ মকবুল হজ্জ দুনিয়া ও দুনিয়াস্থিত সবকিছু থেকে উত্তম এবং মকবুল হজ্জের প্রতিদান একমাত্র জান্নাত। (এহঃ উঃ)
◉ যারা হজ্জ ও উমরা করে তারা আল্লাহ তাআলার দুত ও মেহমান। তারা কিছু চাইলে তিনি তা দান করেন, মাগফিরাত চাইলে মাগফিরাত করেন, দোআ করলে মঞ্জুর করেন। (এহঃ উঃ) ◉ সর্ববৃহৎ গুনাহগার সে ব্যক্তি; যে আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করেও ধারনা করে যে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেননি। (এহঃ উঃ) ◉ কাবাগৃহের উপর প্রত্যহ ১২০টি রহমত নাযিল হয়। ৬০টি তওয়াফকারীদের জন্যে, ৪০টি নামায আদায়কারীদের জন্যে এবং ২০টি দর্শকদের জন্যে। (এহঃ উঃ) ◉ যে ব্যক্তি সামর্থবান হওয়া সত্বেও হজ্জ না করে, তার এই (হজ্জ নাকরা) অবস্থায় মারা যাওয়া এবং ইয়াহুদী কিংবা খৃষ্টান অবস্থায় মারা যাওয়ার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। (তিঃ, মিশঃ)

৩৮ নং হাদীস ঃ

لَا يَرُدُّ الْقَضَاءَ اِلَّا الدُّعَاءُ وَلَا يَزِيْدُ فِي الْعُمْرِ اِلَّا الْبِرُّ –

রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "দোআ ব্যতীত অন্য কোন আমল তাকদীরকে পরিবর্তন করে না এবং নেক আমল ব্যতীত অন্য কিছু বয়স বৃদ্ধি করে না।" (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ তাকদীর দুই প্রকার ঃ যথা, একটি মুবরাম তাকদীর অপরটি মুআল্লাক তাকদীর। যে তাকদীরে কোন কারণে কোনরূপ পরিবর্তন হয় না, তাকে মুবরাম তাকদীর বলে। আর যে তাকদীরে কোন কারণে পরিবর্তন হয় তাকে মুআল্লাক তাকদীর বলে। আলোচ্য হাদীসে 'মুআল্লাক তাকদীর' ই উদ্দেশ্য। প্রকৃত পক্ষে সব কিছুই সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র ক্ষমতাধীন।

সংযোজন ঃ তদবীর সহকারে তাক্দীরে বিশ্বাস করা চাই ঃ বিনা তদবীরে তাওয়াক্কুল করা আমাদের মত সাধারন মানুষদের জন্য মস্তবড় ভুল। তাকদীর ও তাওয়াক্কুল এর প্রতি বিশ্বাসের অর্থ এই নয় যে, মানুষ হাত পা গুটিয়ে বসে থাকবে এবং বলবে যে, ভাগ্যে যা আছে তাই হবে। বরং তার অর্থ হলো, সম্ভাব্য সকল উপায় অবলম্বনের পর সাধ্যমত চেষ্টা ও সাধনা করে যাবে। এরপর বিষয়টিকে তাকদীর ও তাওয়াক্কুলের উপর অর্পন করবে, আর দৃষ্টি আল্লাহর প্রতি নিবদ্ধ রাখবে। কারণ, চেষ্টা ও তদবীরের ফলাফল দান করার মালিক হলেন তিনি।

তাকদীরকে অস্বীকার করার পরিণাম ঃ ✪ হযরত উমর (রাযিঃ) থেকে বর্নিত ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ যখন কিয়ামতের দিন পূর্ববর্তীদেরকে ও পরবর্তীদেরকে একত্রিত করবেন, তখন তাঁর আদেশক্রমে জনৈক ফেরেশ্তা-পূর্ববর্তীরা ও পরবর্তীরা শুনতে পারে-এত জোরে ঘোষনা করবেন যে, আল্লাহর অবাধ্যরা কোথায় ? তখন কাদরিয়াগন (অর্থাৎ অদৃষ্টের অবিশ্বাসীগন) উঠে

দাঁড়াবে। তাদেরকে তৎক্ষনাত জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। (কিঃ কাঃ) ✪ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ জেনে রাখ, সমগ্র মানবজাতি যদি তোমার কোন কাজে উপকার করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়, তবুও তারা আল্লাহ যতটুকু তোমার জন্য লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন তার চেয়ে বেশী উপকার করতে পারবে না। আর যদি তোমার ক্ষতি করার জন্য ঐক্যবদ্ধহয়, তবুও আল্লাহ যেটুকু নির্দিষ্ট করে রেখেছেন তাছাড়া আর কোন ক্ষতি করতে পারবেনা। (কিঃ কাঃ)

দোআর হাকীকত ঃ দোআর শাব্দিক অর্থ 'ডাকা'। কোন কোন সময় যিকিরকেও দোআ বলা হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ। অর্থাৎ দোআ-ই ইবাদত অথবা ইবাদতেরই নাম দোআ। উক্ত আরবী বাক্যের উভয় অর্থই গ্রহন করা যায়।

শাব্দিক অর্থের দিক দিয়ে দোআ এবং ইবাদত যদিও পৃথক পৃথক কিন্তু উভয়ের ভাবার্থ এক। অর্থাৎ প্রত্যেক দোআই ইবাদত এবং প্রত্যেক ইবাদতই দোআ। কারণ, ইবাদত বলা হয় - কারো সামনে চুড়ান্ত দীনতা অবলম্বন করাকে। আর নিজেকে কারো মুখাপেক্ষী মনে করে তার সামনে সওয়ালের হস্ত প্রসারিত করা বড় দীনতা, যা ইবাদতের অর্থ। এমনিভাবে প্রত্যেক ইবাদতের সারমর্ম হলো, আল্লাহর কাছে মাগফিরাত ও জান্নাত তলব করা এবং ইহকাল ও পরকালের শান্তি ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করা। একারনেই এক হাদীসে কুদ্‌সীতে আল্লাহ তাআলা বলেনঃ مَنْ شَغَلَهُ الْقُرْاٰنُ عَنْ ذِكْرِىْ وَ عَنْ مَسْئَلَتِىْ اَعْطَيْتُهٗ اَفْضَلَ مَا اُعْطِى السَّائِلِيْنَ – অর্থাৎ " কুরআন তিলাওয়াত ও চর্চা যে ব্যক্তিকে এমনিভাবে মশগুল করে যে, আমার জিকির করার ও আমার কাছে নিজের প্রয়োজন চাওয়ার অবসরটুকুও পায়না, আমি তাকে যারা চায় তাদের চেয়ে বেশী দেব।" এ - থেকে বুঝা গেল যে, প্রত্যেক ইবাদতই দোআর মত ফায়দা দেয়।

দোআর ফযীলত সম্পর্কে কতিপয় হাদীস ঃ ⊙ আল্লাহর কাছে দোআ অপেক্ষা অধিক প্রিয় কোন বিষয় নেই। (তিরমিযী)

⊙ দোআ ইবাদতের মগজ। (তিরমিযী)

⊙ আল্লাহ তাআলার কাছে অনুগ্রহ প্রার্থনা কর। কেননা, আল্লাহ তাআলা দোআ বা প্রার্থনাকে পছন্দ করেন। অভাব-অনটনের সময় সচ্ছলতার জন্যে দোআ করে রহমত প্রাপ্তির অপেক্ষা করা সর্ববৃহৎ ইবাদত। (তিরমিযী)

⦿ যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে তার প্রয়োজন প্রার্থনা করে না, আল্লাহ তার প্রতি রুষ্ট হন। (তিরমিযি।) ⦿ তোমরা দোআ করতে অপারগ হয়ো না। কেননা, দোআ সহ কেউ ধ্বংস প্রাপ্ত হয় না। (ইবনে হাব্বান)

⦿ দোআ মুমিনের হাতিয়ার, ধর্মের স্তম্ভ এবং আকাশ ও পৃথিবীর নূর। (হাকেম)

⦿ যার জন্য দোআর দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়া হয়, তার জন্য রহমতের দ্বার উন্মুক্ত করা হয়। আফিয়ত তথা সার্বিক নিরাপত্তা প্রার্থনা অপেক্ষা কোন পছন্দনীয় দোআ আল্লাহর কাছে নেই। (তিরমিযী)

দোআ কবুলের ওয়াদা ঃ আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারীমে দোআ কবুল করার ওয়াদা করেছেন। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যেন দোআ কবুল হয় না। এর জবাবে আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) থেকে বর্নিত হাদীসে আছে - মুসলমান আল্লাহর কাছে যে দোআই করে, আল্লাহ তা দান করেন যদি তা কোন গুনাহ অথবা সম্পর্কচ্ছেদের দোআ না হয়।

দোআ কবুল হওয়ার পদ্ধতি তিনটি। তম্মধ্যে কোনা না কোন পদ্ধতিতে দোআ কবুল হয়। (এক) - যা চাওয়া হয়, তাই পাওয়া যায়। (দুই) - প্রার্থিত বিষয়ের পরিবর্তে পরকালের কোন সওয়াব ও পুরষ্কার দান করা হয়। (তিন) - প্রার্থিত বিষয় না দিয়ে তার পরিবর্তে কোন সম্ভাব্য আপদ-বিপদ সরিয়ে দেয়া হয়। (মাযহারী)

দোআ কবুলের শর্ত ঃ দোআ কবুলের জন্য মুসলমান হওয়া শর্ত নয়। কাফের ব্যক্তির দোআও আল্লাহ তাআলা কবুল করেন। ইব্‌লীস কিয়ামত পর্যন্ত জীবিত থাকার দোআ করেছিল। আল্লাহ তাআলা তা কবুল করেছেন। দোআর জন্যে কোন নির্দিষ্ট সময় হওয়া এবং ওযু থাকা শর্ত নয়। তবে নির্ভরযোগ্য হাদীছে কোন কোন বিষয়কে দোআ কবুলের পথে বাধা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এসব বিষয় থেকে বেঁচে থাকা জরুরী। যেমন হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্নিত হাদীসে আছে - কোন কোন লোক খুব সফর করে আকাশের দিকে হাত তুলে 'ইয়া রব' বলে দোআ করে; কিন্তু তার পানাহার ও পোষাক-পরিচ্ছদ হারাম পন্থায় অর্জিত। এমতাবস্থায় তার দোআ কিরূপে কবুল হবে ?

এমনিভাবে অসাবধান, বেপরোয়া ও অন্যমনষ্কভাবে দোআর বাক্যাবলী উচ্চারন করলে তাও কবুল হয় না বলে হাদীসে বর্নিত আছে। দোআ করার সময় নিজের দুর্বলতা, দুর্দশা ও অভাবগ্রস্ততা উল্লেখ করা মুস্তাহাব এবং দোআ কবুল হওয়ার পক্ষে সহায়ক।

দোআর আদাব ঃ নির্ভরযোগ্য হাদীস সমূহে দোআর বিভিন্ন আদবের তালীম দেয়া হয়েছে। এই আদবগুলো অনুসরণ করে দোআ করলে নিঃসন্দেহে তা কবুল হওয়ার আশা করা যায়। কিন্তু যদি কেউ এই আদবগুলো রক্ষা করতে না পারল, তাই বলে

দোআ করাই ছেড়ে দেয়া কখনও ঠিক হবে না; বরং সর্বাবস্থায় দোআ কোন না কোনভাবে অবশ্যই উপকারী হয়ে থাকে এবং আল্লাহ তাআলার নিকট কবুল হওয়ার আশা করা যায়। বিভিন্ন হাদীস থেকে দোআর আদবগুলো সংক্ষিপ্ত ভাবে নিম্নে প্রদত্ত হলো :

১। পানাহার ও উপার্জনের মধ্যে হারাম থেকে বেঁচে থাকা। (মুসলিম, তিরমিযী)

২। ইখলাসের সংগে দোআ করা। অর্থাৎ অন্তরে একথা বুঝা যে, একমাত্র আল্লাহ তাআলা ব্যতীত আর কেহই আমাদের মাকসুদ পুরা করতে পারে না। (মুস্তাদরাক)

৩। দোআর পূর্বে কোন নেক কাজ করা এবং দোআ করার সময় উহার উল্লেখ এভাবে করা যে, আয় আল্লাহ ! আমি আপনার সন্তুষ্টির জন্য অমুক কাজটি করেছি, আপনি উহার বরকতে আমার অমুক কাজটি করে দিন। (মুসলিম, তিরমিযী, আবু দাউদ)

৪। পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন হয়ে দোআ করা। (সুনানে আরবাআ, ইবনে হাব্বান, মুস্তাদরাক)

৫। ওযু করা। (সিহাহে ছিত্তা)

৬। দোআর সময় কিব্‌লামুখী হওয়া। (সিহাহে ছিত্তা)

৭। দু'যানু হয়ে বসা অর্থাৎ নামাযের বৈঠকের ছুরতে বসা। (আবু আওয়ানা)

৮। দোআর শুরুতে এবং শেষে আল্লাহ তাআলার হাম্‌দ -ছানা অর্থাৎ প্রশংসা ও গুনকীর্তন করা। (সিহাহে ছিত্তা)

৯। দোআর শুরুতে এবং শেষে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি দরুদ প্রেরন করা। (আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে হাব্বান, মুস্তাদ্‌রাক)

১০। উভয় হাত বিছিয়ে দোআ করা। (তিরমিযী, মুস্তাদরাকে হাকেম)

১১। উভয় হাতকে কাঁধ বরাবর কিংবা তার কাছাকাছি অর্থাৎ বুক সমান উঠানো। (আবু দাউদ, মুসনাদে আহমাদ, হাকেম)

১২। আদব এবং নম্রতার সাথে বসা। (মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী)

১৩। নিজের অক্ষমতা ও মুখাপেক্ষীতা উল্লেখ করা। (তিরমিযী)

১৪। আল্লাহ তাআলার পবিত্র নামসমূহ এবং গুনাবলী উল্লেখ করে দোআ করা।(ইঃ হাঃ) ১৫। দোআর শব্দের মধ্যে কৃত্রিমভাবে ছন্দ মিলানো থেকে বিরত থাকা। (বুখারী)

১৬। যদি পদ্যের মাধ্যমে দোআ করা হয় তাহলে গানের সুর থেকে বেঁচে থাকা। (হিছ্‌ন)

১৭। দোআর সময় আম্বিয়া আলাইহিমুস্‌সালাম এবং আল্লাহ তাআলার অন্যান্য মাকবুল ও নেক বান্দাদের উসীলা দেয়া। অর্থাৎ একথা বলা যে, আয় আল্লাহ ! এই সকল বুযর্গদের উসীলায় আমার দোআ কবুল করুন। (বুখারী, বায্‌যার, হাকেম)

১৮। দোআর মধ্যে আওয়াজ ছোট করা। (সিহাহে ছিত্তা)

১৯। ঐ সকল দোআ করা যেগুলো মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত। কেননা, ইহ-পরকালের এমন কোন প্রয়োজন নেই, যার জন্য তিনি দোআ করে উম্মতকে শিক্ষা দিয়ে যাননি। (আবু দাউদ, নাসায়ী)

২০। এমন দোআ করা, যা ইহ-পরকালীন অধিকাংশ প্রয়োজনকে শামিল করে নেয়। (আঃ দাঃ)

২১। দোআর মধ্যে সর্বপ্রথম নিজের জন্য দোআ করা। অতঃপর স্বীয় মাতা-পিতা এবং অন্যান্য মুসলমান ভাইদের শরীক করে নেয়া। (মুসলিম)

২২। ইমাম হলে শুধু নিজের জন্যই দোআ করবে না; বরং জমাআতের সকল সদস্যকে দোআর মধ্যে শরীক করবে। (আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজা) আবু দাউদ শরীফের এক রিওয়ায়েতে আছে-যেই ইমাম নিজেকেই দোআর মধ্যে খাছ করে নেয়, সে কওমের সংগে খিয়ানত করল।

২৩। দৃঢ়তার সাথে দোআ করবে। (অর্থাৎ এমন বলবে না যে, আয় আল্লাহ! যদি তুমি চাও তাহলে আমার এই মাক্সুদ পুরা করে দাও।) (সিহাহে ছিত্তা)

২৪। আগ্রহ এবং উদ্দীপনা সহকারে দোআ করবে। (ইবনে হাব্বান, আবু আওয়ানা)

২৫। যথাসম্ভব মনযোগ রক্ষা করার চেষ্টা করবে এবং দোআ কবুল হওয়ার দৃঢ় আশা পোষন করবে। (মুস্তাদরাক)

২৬। দোআর মধ্যে এক কথা বারবার বলা। (বুখারী, মুসলিম) এবং নিম্ন পক্ষে তিনবার বলা। (আবু দাউদ, ইব্নুস্সুন্নী)

২৭। দোআর মধ্যে কাকুতি-মিনতি করা। (নাসায়ী, হাকেম, আবু আওয়ানা)

২৮। কোন গুনাহ কিংবা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নের দোআ করবে না। (মুঃ, তিরঃ)

২৯। এমন বিষয়ের দোআ করবে না, যা সাব্যস্ত হয়ে গিয়েছে। যেমন, কোন মহিলা পুরুষ হয়ে যাওয়ার জন্য কিংবা লম্বাদেহী ব্যক্তি বেটে হওয়ার জন্য দোআ করা। (নাঃ)

৩০। কোন অসম্ভব বিষয়ের দোআ করবে না। (বুখারী) ৩১। আল্লাহ তাআলার রহমতকে শুধু নিজের জন্য খাস করার দোআ করবে না। (বুঃ, আঃ দাঃ, নাঃ, ইঃ মাঃ)

৩২। নিজের সকল প্রয়োজন আল্লাহ তাআলার কাছে পেশ করবে, কোন মখলুকের উপর ভরসা করবে না। (তিরমিযী, ইবনে হাব্বান)

৩৩। দোআর শেষে দোআকারী ব্যক্তি নিজেও 'আমীন' বলবে এবং শ্রোতারা ও আমীন বলবে। (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী)

৩৪। দোআর শেষে উভয় হাত চেহারার উপর বুলাবে। (আবু দাউদ, তিরমিযী, ইঃ মাঃ)

৩৫। দোআ কবুল হওয়ার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করবে না। অর্থাৎ একথা বলবে না যে, আমি দোআ করেছিলাম, এখনো পর্যন্ত কবুল হলোনা কেন।(বুঃ,মুঃ,আঃদাঃ,নাঃ)

যে সকল সময়ে বিশেষভাবে দোআ কবুল হয় ঃ ⊙ শবে কদর অর্থাৎ রমাযানুলমুবারকের শেষ দশকের বেজোড় রাত্রিগুলো। এর মধ্যে আবার সাতাইশতম রাত্রি অধিক গুরুত্বপূর্ণ। ⊙ আরাফার দিন ⊙ মাহে রমাযানুল মুবারকের প্রত্যেক দিবারাত্রি। ⊙ জুমআর রাত্রি ⊙ জুমআর দিন ⊙ প্রত্যেক রাতের প্রথম দিকের

— ৯

তৃতীয়াংশ, শেষের দিকের তৃতীয়াংশ, অর্ধরাত্রি ও সাহরীর সময় ⦿ জুম্‌আর দিনের বিশেষ সময়। বিভিন্ন সহীহ হাদীসে এসেছে যে,জুম্‌আর দিনে এমন একটি সময় আছে যখন কোন দোআ করা হলে তা কবুল হয়ে যায়। এ সময়টি নির্ধারনে আলেমগনের বিভিন্ন মত রয়েছে। তম্মধ্যে দুটি মত প্রাধান্য লাভ করেছে। প্রথমটি হলো, ইমাম যখন খুত্‌বার জন্য বসেন তখন থেকে ফরয শেষ করা পর্যন্ত। তবে খুত্‌বা চলাকালীন মুখে দোআ করা নিষেধ; বরং মনে মনে দোআ করবে অথবা খুত্‌বার মধ্যে খতীব যেই দোআ করে সেই দোআর পরে মনে মনে আমীন বলতে থাকবে। আর দ্বিতীয় মতটি হলো, আছরের নামাযের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত। (উভয় সময়ের মধ্যেই দোআ করা উচিত যাতে সেই সময়টি পাওয়া সম্ভব হয়।)

যেসব আমলের অবস্থায় দোআ করা হলে বিশেষভাবে দোআ কবুল হয় ঃ

⦿ আযানের অবস্থায় ⦿ আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী অবস্থায় ⦿ হায়্যা আলাস্‌সালাহ এবং 'হায়্যা আলাল ফালাহ' এর পরে। বিশেষ ভাবে মুসীবতগ্রস্ত ব্যক্তির দোআ সেই সময় ফলপ্রসু হওয়া পরীক্ষিত। ⦿ জিহাদের মধ্যে যখন সারিবদ্ধ হয়। ⦿ ফরয নামায সমূহের পরে ⦿ সাজদারত অবস্থায় (তবে ফরয নামাযের সাজদায় নয়) ⦿ তিলাওয়াতে কুরআনের পর। বিশেষভাবে কুরআন শরীফ খতম করার পর। তিলাওয়াতকারীর দোআ শ্রবনকারী অপেক্ষা অধিক কবুল হয় ⦿ যমযমের পানি পান করার মুহূর্তে ⦿ মাইয়েতের নিকট উপস্থিত হওয়ার সময়। অর্থাৎ কারো জান নির্গতহওয়া অবস্থায় তার কাছে আসার সময় দোআ করলে দোআ কবুল হয়। ⦿ মোরগ বাঁগ দেয়ার সময়। ⦿ মুসলমানদের সমবেত হওয়ার মুহূর্তে ⦿ যিকিরের মজলিস সমূহে ⦿ ইমাম সূরা ফাতিহা শেষ করার সময়। (এ সময় দোআর অর্থ আমীন বলা, অন্য দোআ নহে।) ⦿ নামাযের ইকামতের সময় ⦿ বৃষ্টির সময় ⦿ বায়তুল্লাহ শরীফের উপর যখন দৃষ্টি পড়ে ⦿ সূরা আন্‌আমের আয়াত وَاِذَا جَاءَتْــهُمْ اٰيَةٌ قَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ حَتّٰى نُؤْتٰى مِثْلَ مَآاُوْتِىَ رُسُلُ اللّٰهِ – اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْــثُ يَجْعَلُ رِسَــالَتَهٗ এর মধ্যে উভয় আল্লাহ শব্দের মাঝখানে যেই দোআ করা হয় তাও কবুল হয়।

৩৯ নং হাদীস ঃ

قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ اُمَّتِىْ سَبْعُوْنَ اَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ هُمُ الَّذِيْنَ لَايَسْتَرْقُوْنَ وَلَايَتَطَيَّرُوْنَ وَعَلٰى رَبِّــهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ

"রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমার উম্মতের সত্তর হাজার লোক বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে। তারা ঐ সব লোক হবে, যারা মন্ত্র, ঝাড়-ফুঁক ও অশুভ লক্ষন গ্রহণ করে না। একমাত্র আল্লাহ্র উপরই ভরসা করে।" (বুঃ, মুঃ)

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ তারা সর্বকাজে আল্লাহ তাআলার ইচ্ছার প্রতি সন্তুষ্ট থাকে। আর এটা তাওয়াক্কুলের সর্বোচ্চ স্তর।

সংযোজন ঃ যাদু করা কবীরা গুনাহ ঃ ✪ এক হাদীসে কুদ্সীতে আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ আমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। যে জাদু করে, যার জন্য জাদু করা হয়, যে ভবিষ্যত গণনা করে, যার জন্য ভবিষ্যত গণনা করা হয়, যে শুভ বা অশুভ লক্ষনে বিশ্বাস করে বা কাউকে বিশ্বাস করতে উপদেশ দেয়, তারা কেউ আমার পছন্দনীয় নয়। (কিঃ কাঃ)

✪ হযরত আলী (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তিন ব্যক্তি জান্নাতে যাবে না। (১) মদ্যপায়ী (২) রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়তা ছিন্নকারী (৩) জাদুতে আস্থা স্থাপনকারী। (মুসনাদে আহমাদ)

যে কোন তাবীজ-তুমার ও ঝাড়ফুঁক নিষিদ্ধ নয় ঃ ✪ হযরত ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বর্নিত হাদীসে আছে ঃ তাবীজ ও ঝাঁড়ফুঁকে বিশ্বাস করা শিরক। অবশ্য আল্লাহর ইচ্ছা ও অনুগ্রহ ছাড়া এসবের কোন উপকারিতা নেই এরূপ বিশ্বাস করলে তাবীজ-তুমার ও ঝাড়ফুঁকে দোষ নেই, যদি তা ইসলাম বিরোধী ভাষায় লিখিত না হয়। (কিঃ কাঃ)

ইমাম খাত্তাবী (রহঃ) বলেছেন ঃ কুরআনের আয়াত বা আল্লাহর নাম লেখা তাবীজ বৈধ। কেননা, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং হাসান ও হুসাইন (রাযিঃ)কে তাবীজ লিখে দিয়েছিলেন। (কিঃ কাঃ)

৪০ নং হাদীস ঃ

اَبْغَضُ الْحَلَالِ اِلَى اللهِ الطَّلَاقُ –

রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "হালাল বস্তুসমূহের মধ্যে আল্লাহর নিকট সর্বাধিক ঘৃন্য বস্তু তালাক।" (আবু দাউদ, ইবনে মাজা)

ব্যাখ্যাঃ মানুষের জন্য উচিত, সামান্য অপরাধ এবং স্বাভাবিক ভুল-ত্রুটির কারণে স্ত্রীকে তালাক না দেয়া। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, রাগের বশিভূত হয়ে তালাক দেয়ার পর লজ্জা, অনুতাপ ও আফসোসের সাগরে হাবুডুবু খেতে থাকে। অবশেষে বাধ্য হয়ে অন্যায় ও মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে একটি মনগড়া প্রশ্ন সাজিয়ে বৈধতার ফতোয় লিখিয়ে

নেয়। আবার কেহ কেহ ফতোয়ার তোয়াক্কাও করে না। অতঃপর সেই স্ত্রীকে নিয়ে সম্পূর্ণ নাজায়েয পন্থায় ঘর-সংসার করার মাধ্যমে গুনাহের মধ্যে ডুবে থাকে এবং এ-চিন্তাটুকুও করে না যে, এভাবে চিরদিনের জন্য জারজ বংশবিস্তারের ভিত্তি স্থাপন হচ্ছে। লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা-বিল্লাহ।

সংযোজন ঃ শরীঅতের দৃষ্টিতে বিয়ে ও তালাক ঃ বিয়ের একটি দিক হচ্ছে এই যে, এটি পরস্পরের সম্মতিক্রমে সম্পাদিত একটি চুক্তি মাত্র। যেমন ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে আদান-প্রদান হয়ে থাকে, অনেকটা তেমনি। দ্বিতীয় দিক হচ্ছে, এটি আল্লাহ তাআলার একটি হুকুম ও ইবাদত। তাই বিয়ের ব্যাপারে এমন কতিপয় শর্ত রাখা হয়েছে, যা সাধরণ ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে রাখা হয়নি। যেমন, যে কোন স্ত্রীলোকের সাথে যে কোন পুরুষের বিয়ে হতে পারেনা। কোন কোন স্ত্রীলোকের বিয়ে কোন কোন পুরুষের সাথে হওয়া নিষিদ্ধ। তাছাড়া বিয়ের কাজ সমাধা করার জন্যে সাক্ষী থাকা শর্ত। সাক্ষী ছাড়া বিবাহই শুদ্ধ হয় না; কিন্তু অন্যান্য লেন-দেন সমাধাকালে সাক্ষীর প্রয়োজন হয় না, অবশ্য পরস্পরের মাঝে মতবিরোধ দেখা দিলে সাক্ষীর প্রয়োজন হয়।

আর তালাক বলতে বুঝায়, বিয়ের চুক্তি ও লেন-দেনকে বাতিল করা। যেহেতু ইসলামী শরীঅত, বিয়ে-শাদীকে ইবাদত হওয়ার কারণে অন্যান্য সাধারণ লেন-দেন অপেক্ষা অনেক উর্ধ্বে স্থান দিয়েছে, তাই এ চুক্তি বাতিল করার ব্যাপারটিও সাধারণ ব্যাপারের চাইতে অনেকটা জটিল। যখন খুশী, যেভাবে খুশী তা বাতিল করে অন্যের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা চলবে না ; বরং এর জন্য একটি সুষ্ঠু আইন রয়েছে।

বিবাহ বন্ধন রক্ষার্থে ইসলামের ভূমিকা ঃ ইসলামের শিক্ষা এই যে, বিয়ের চুক্তি সারা জীবনের জন্য সম্পাদন করা হয়, তা ভঙ্গ করার মত কোন অবস্থা যাতে সৃষ্টি না হয়, সেদিকেও বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। কেননা, এ সম্পর্ক ছিন্ন করার পরিণাম শুধু স্বামী-স্ত্রী পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং এতে বংশ এবং সন্তানদের জীবনও বরবাদ হয়ে যায়। এমনকি অনেক সময় উভয় পক্ষের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টি হয় এবং সংশ্লিষ্ট অনেকেই এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আর এজন্যই এ সম্পর্ক ছিন্নকারী সমস্ত কারণ নিরসনের জন্য কুরআন ও হাদীসের শিক্ষায় পরিপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর প্রত্যেকটি বিষয় ও অবস্থা সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে যে উপদেশ রয়েছে, সেগুলোর সারমর্ম হলো - যাতে এ সম্পর্ক দিন দিন গাঢ় হতে থাকে এবং কখনো ছিন্ন হতে না পারে, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা। পরস্পরের মাঝে অমিল দেখা দিলে প্রথমে বুঝাবার চেষ্টা করা, অতঃপর সতর্কীকরণ ও ভীতিপ্রদর্শনের উপদেশ দেয়া হয়েছে। যদি এতেও সমস্যার সমাধান না হয়, তবে উভয় পক্ষের কয়েক ব্যক্তিকে সালিস সাব্যস্ত করে ব্যাপারটির মীমাংসা করে নেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

একান্ত অপারগ অবস্থাতেই তালাকের ক্ষমতা প্রয়োগের অনুমতি দেয়া হয়েছেঃ অনেক সময় ব্যাপার এমন হয় যে, সংশোধনের সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে যায় এবং বিবাহের আকাংখিত ফল লাভের স্থলে উভয়ের একত্রে মিলে-মিশে থাকাও মস্ত আযাবে পরিনত হয়। এমতাবস্থায়, এ সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়াই উভয় পক্ষের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তার পথ। আর এ জন্যেই ইসলামে তালাক ও বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। যেহেতু চিন্তাশক্তি ও ধৈর্যের সামর্থ স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের মধ্যে অনেক বেশী, তাই তালাকের অধিকারও পুরুষকেই দেয়া হয়েছে।

তবে স্ত্রীজাতিকেও এ অধিকার হতে একেবারে বঞ্চিত করা হয়নি। স্বামীর যুলুম-অত্যাচার হতে আত্মরক্ষা করার ব্যবস্থা তাদের জন্যেও রয়েছে। তারা কাজীর দরবারে নিজেদের অসুবিধার বিষয় উপস্থাপন করে স্বামীর দোস প্রমান করে বিবাহ বিচ্ছেদ করিয়ে নিতে পারে। যদিও পুরুষকে তালাক দেয়ার স্বাধীন ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, কিন্তু এতদসংগে এ কথাও বলা হয়েছে যে, এ ক্ষমতার ব্যবহার আল্লাহর নিকট অত্যন্ত অপছন্দনীয় ব্যাপার। একমাত্র অপারগ অবস্থাতেই এ ক্ষমতা প্রয়োগ করা যায়।

স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় থাকার উপায়ঃ স্বামীর ধনসম্পদে বিনা অনুমতিতে হস্তক্ষেপ করা স্ত্রীর জন্য বৈধ নয়। নিজের অধিকারের উপর স্বামীর অধিকারকে এবং নিজের আত্মীয়দের অধিকারের উপর স্বামীর আত্মীয়দের অধিকারকে অগ্রাধিকার দেয়া স্ত্রীর পক্ষে অপরিহার্য। সব সময় পূর্ণ পরিচ্ছন্নতা সহকারে স্বামীর ডাকে সাড়া দেয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। নিজের সৌন্দর্যের জন্য তার উপর বড়াই করা এবং স্বামীর মধ্যে বিদঘুটে কিছু থাকলে তার জন্য তাকে দোষারোপ করা বাঞ্চনীয় নয়।

স্ত্রীর উচিত স্বামীর সামনে লজ্জাশীলা থাকা, তার সামনে চোখ নামিয়ে রাখা, তার আদেশের অনুগত থাকা, তার কথা মনোযোগের সাথে শোনা, তার কথা বলার সময় চুপ থাকা, তার গৃহে আগমনের সময় দরজায় এগিয়ে গিয়ে অভ্যর্থনা জানানো, তার বাইরে যাওয়ার সময় দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দেয়া ও কিছুক্ষন দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা, সে যা যা অপছন্দ করে তা থেকে দুরে থাকা, তার ঘুমানোর সময় তার কাছে উপস্থিত থাকা, তার অনুপস্থিতিতে তার গৃহ, সম্পত্তি ও নিজের সতিত্বকে আমানত হিসাবে সংরক্ষন করা, নিয়মিত দাঁত মাজা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা ও তার কাছে নিজেকে সব সময় সুসজ্জিত ও সুবাসিত রাখা, তার অসাক্ষাতে তার কোন নিন্দা না করা। তার আত্মীয়স্বজনের যত্ন করা এবং তার ক্ষুদ্র উপকারকে বড় করে দেখা।

স্ত্রী যেমন স্বামীর আনুগত্য করতে ও তাকে সন্তুষ্ট রাখতে আদিষ্ট, তেমনি স্বামীও আদিষ্ট স্ত্রীর প্রতি সদাচরণ ও বিনম্র ব্যবহার করতে তার পক্ষ থেকে কোন দুর্ব্যবহার ইত্যাদি প্রকাশ পেলে তাতে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করতে, এবং স্ত্রীকে

খোরপোশ ও সম্মানজনক জীবন যাপনের সুযোগ দিতে। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ স্ত্রীদের সাথে উত্তম ব্যবহার কর। এক হাদীসে আছে যে, এক ব্যক্তি হযরত উমরের নিকট নিজের স্ত্রীর দুর্ব্যবহারের অভিযোগ পেশ করার জন্য উপস্থিত হলো। সে হযরত উমরের বাড়ীর দরজায় দাঁড়িয়ে তাঁর বাইরে আসার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো। এই সময় শুনতে পেল, হযরত উমরের স্ত্রী তাঁকে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করছে। কিন্তু হযরত উমর তার কোন জবাব না দিয়ে নীরবে সহ্য করছেন। এটা শোনার পর লোকটি ফিরে যেতে উদ্যত হলো। সে ভাবলো, এমন দুর্দন্ড ও প্রতাপান্বিত খলিফার যখন এই অবস্থা, তখন আমি আর কোথাকার কে ? ঠিক এই সময় হযরত উমর বাইরে বেরিয়ে দেখলেন, লোকটি চলে যাচ্ছে। তিনি ডেকে বললেনঃ তুমি কেন এসেছিলে আর কেনই বা দেখা না করে চলে যাচ্ছ ? সে বললোঃ আমীরুল মুমিনীন ! আমার সাথে আমার স্ত্রী যে দুর্ব্যবহার করে ও কটুবাক্য প্রয়োগ করে, তার বিরুদ্ধে ফরিয়াদ করার জন্য আমি আপনার কাছে এসেছিলাম। কিন্তু শুনতে পেলাম স্বয়ং আপনার স্ত্রীও তদ্রুপ। তাই ফিরে যাচ্ছিলাম। ভাবছিলাম যে, আমীরুল মুমিনীনের অবস্থা যখন এরূপ, তখন আমি আর কোথাকার কে ? হযরত উমর বললেনঃ শোন, ভাই ! আমার উপর তার কিছু অধিকার আছে বলেই আমি তাকে সহ্য করলাম। দেখ, সে আমার খাবার রান্না করে, রুটি বানায়, কাপড় ধোয়, এবং আমার সন্তানদের দুধ খাওয়ায়। অথচ এসব কাজ তার জন্য বাধ্যতামূলক নয়। তবে এসব কাজ করে দিয়ে সে আমার মনকে হারাম উপার্জন থেকে ফিরিয়ে রাখে। এ জন্যই আমি তাকে সহ্য করি। লোকটি বললোঃ আমীরুল মুমিনীন ! আমার স্ত্রীও তদ্রুপ। হযরত উমর বললেনঃ "তাহলে তাকে সহ্য করতে থাক, ভাই। দুনিয়ার জীবনটা তো নিতান্তই ক্ষনস্থায়ী।"

কথিত আছে যে, একবার জনৈক আল্লাহ ওয়ালা ব্যক্তির বাড়িতে তার এক দ্বীনী ভাই বেড়াতে এসেছিলেন। তিনি প্রতি বছর একবার বেড়াতে আসতেন। এসে দরজায় কড়া নাড়তেই তার স্ত্রী দরজা খুলে দিয়ে আগন্তুককে জিজ্ঞাসা করলেনঃ "কে আপনি?" আগন্তুক বললেন ঃ "আমি আপনার স্বামীর দ্বীনী ভাই ! তাকে দেখতে এসেছি।" স্ত্রী অত্যন্ত কর্কশ ভাষায় বললোঃ "সে জংগলে কাঠ কাটতে গেছে। আল্লাহ যেন ওকে নিরাপদে ফিরিয়ে না আনে। আল্লাহ যেন ওর অমুক করে, তমুক করে ! ইত্যাদি ইত্যাদি ....।" এভাবে অনুপস্থিত স্বামীর বিরুদ্ধে সে প্রচন্ডভাবে নিন্দাবাদ করতে লাগলো। ইতিমধ্যে সহসা তার স্বামী এসে উপস্থিত হলেন। একটা সিংহের পিঠে করে বিরাট এক কাঠের বোঝা নিয়ে এবং নিজে তার ওপর আরোহণ করে পাহাড়ের দিক থেকে ফিরে এলেন। তিনি তাঁর দ্বীনী ভাইকে সালাম করলেন এবং মোবারকবাদ জানালেন। অতঃপর তিনি গৃহের ভেতরে ঢুকে সিংহের পিঠ থেকে কাঠ নামালেন এবং সিংহকে বললেন ঃ যাও, আল্লাহ তোমার কল্যাণ করুন। অতঃপর তিনি তার দ্বীনী ভাইকেও ভেতরে এনে বসালেন। তার স্ত্রী তখনো তাকে বকা ঝকা করছিল। অথচ তার

স্বামী ছিলেন নিরুত্তর। অতঃপর খাওয়া দাওয়া শেষে অতিথি বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। তিনি তার বন্ধুর মুখরা স্ত্রীর ব্যবহার ও তার বন্ধুর ধৈর্য দেখে অবাক হয়ে গেলেন। পরের বছর একই সময়ে তিনি আবার এলেন। তিনি কড়া নাড়তেই ভেতর থেকে আওয়াজ এল ঃ দরজায় কে? আগন্তুক বললেন ঃ আমি আপনার স্বামীর দ্বীনী ভাই অমুক। তখন মোবারকবাদ বলে মহিলা দরজা খুলে দিল। সে আরো বললো ঃ "আপনি বসুন, আমার স্বামী ইনশাআল্লাহ শীঘ্রই ফিরে আসবেন। আল্লাহ তাকে নিরাপদে ফিরিয়ে আনুন। ইত্যাদি ইত্যাদি।" আগন্তুক তার সুমিষ্ট ব্যবহার ও কথাবার্তায় অবাক হয়ে গেলেন। একটু পরেই গৃহকর্তা কাঠের বোঝা নিয়ে বাড়ী ফিরে এলেন। কিন্তু এবার কঠোর বোঝা সিংহের পিঠে করে নয় - নিজের পিঠে করে আনলেন। অতঃপর তারা অতিথিকে যত্ন করে খাইয়ে দাইয়ে বিদায় করলেন। বিদায় কালে তিনি তার বন্ধুকে বললেন ঃ "গত বছর যখন এসেছিলাম তখন আপনার স্ত্রীর কর্কশ ব্যবহার ও দুর্বিনীত ভাষণ শুনেছিলাম। তিনি সর্বদাই আপনার নিন্দা করছিলেন। আর আপনি সিংহের পিঠে করে কাঠের বোঝা বয়ে নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু এ বছর দেখলাম আপনার স্ত্রীর সুমধুর ব্যবহার। অথচ আপনি বোঝা বয়ে এনেছেন নিজের পিঠে করে। ব্যাপারটা কি বলুন তো?" তিনি বললেন ঃ "হে ভাই! সেই কর্কশভাষিনী নারীর মৃত্যু হয়েছে। আমি তার উপর ধৈর্য ধারণ করতাম। ফলে আল্লাহ সেই সিংহটিকে আমার বশীভূত করে দিয়েছিলেন। পরে আমি এই সদাচারীনী মহিলাকে বিয়ে করেছি। আমি তার সাথে সুখী আছি। কিন্তু সেই সিংহ আমার হাতছাড়া হয়ে গেল। তাই আমি নিজের ঘাড়ে করে কাঠ বহন করতে বাধ্য হয়েছি এই অনুগত সৎস্বভাবা স্ত্রীর সাথে আমার সুখময় জীবন যাপনের খাতিরে।

এক সুতোয় গাঁথা

বিঃদ্রঃ উক্ত শাজারানাম আল্লামা আব্দুল আউয়াল জৌনপুরী (রহঃ) প্রনীত "শাজারাতে তাইয়েবাত" গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত এবং অনুবাদক কর্তৃক সংযোজিত।

সংযোজনের ক্ষেত্রে অনুসৃত গ্রন্থাবলী ঃ

১। সিহাহ্ সিত্তা
২। মিশকাত শরীফ
৩। তাফসীরে মাআরেফুলকুরআন - মুফতী শফী (রহঃ)।
৪। মিরকাত শরহে মিশকাত - মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ)।
৫। ফয়যুলবারী শরহে বুখারী - আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশমীরী (রহঃ)।
৬। বযলুল মাজহুদ শরহে আবু দাউদ - আল্লামা খলীল আহমাদ সাহারনপুরী (রহঃ)।
৭। আদ্দুররুল মান্দুদ শরহে আবু দাউদ - মাওলানা আকিল (দাঃ বাঃ) সাহারান পুর।
৮। হিদায়া।
৯। শরহে বেকায়া।
১০। আল-ফরকু বাইনাল-ফিরাক-ইমাম আব্দুল কাহের বিন তাহের আল-বাগদাদী (রহঃ) (৪২৯ হিজরী।)
১২। তালবীসু ইব্লীস - ইমাম আব্দুর রহমান ইবনুল জাওযী (রহঃ)।
১৩। শরহে মাওয়াকেফ - মীর সাইয়েদ শরীফ জুরজানী (রহঃ)।
১৪। শরহে আকাইদে নাসাফী।
১৫। তায়ীলে শরহে আকাইদ - আল্লামা আশ্রাফ আলী থানভী (রহঃ)।
১৬। শরহুল আরবাঈন - আল্লামা ইবনে দকীক-আল-ঈদ (রহঃ)।
১৭। কিতাবুল কাবাইর (গুনাহে কবীরা নামে বাংলায় অনূদিত)ইমাম শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন উছমান যাহাবী (রহঃ)
১৮। আহসানুল ফাতাওয়া - মুফতী রশীদ আহমাদ (দাঃ বাঃ)।
১৯। আত্তা'রীফাতুল-ফিক্হিয়্যা - মুফতী আমীমুল এহসান (রহঃ)।
২০। ঈযাহুল বুখারী- শায়খুল হাদীস যাকারিয়া (রহঃ)।
২১। দরসে তিরমিযী - আল্লামা তাক্বী উসমানী (দাঃ বাঃ)।
২২। দরসে মিশকাত - হযরত মাওঃ ইসহাক (দাঃ বাঃ)।
২৩। বেহেশ্তী জেওর।
২৪। উস্ওয়ায়ে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- আরেফ বিল্লাহ ডাঃ আব্দুল হাই (রহঃ)।
২৫। ইখতিলাফে উম্মত আওর সিরাতে মুস্তাকীম - আল্লামা ইউসুফ লুধিয়ানভী (দাঃ বাঃ)।
২৬। কিতাবুত্তাওহীদ - ডঃ সালেহ বিন ফাওযান আলফাওযান (দাঃ বাঃ)।
২৭। সুন্নাত ও বিদআত - মুফতী শফী (রহঃ)।
২৮। সঠিক ধর্ম বিশ্বাস ও উহার পরিপন্থী বিষয়-মূলঃআব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায (দাঃ বাঃ)।
২৯। হিদায়াতুল ইবাদ - মুফতী ফয়জুল্লাহ (রহঃ)।
৩০। তাওহীদ, রিসালাত ও নূরে মুহাম্মাদীর সৃষ্টি রহস্য - হযরত মাওঃ ফজলুল করীম (দাঃ বাঃ)।
৩১। তারীখে দাওয়াত ও আযীমত - আল্লামা আবুল হাসান আলী মিয়া নদভী (দাঃ বাঃ)।
৩২। হাবীবুল আনাম শরহে আযীযুল কালাম - মুফতী ইবরাহীম (দাঃ বাঃ)।
৩৩। মাযহাব কি ও কেন ? মূলঃ আল্লামা তাকী উসমানী (দাঃ বাঃ)।
৩৪। আল-বয়ানুল মুখ্তাছার ফিন্নিয়্যাহ-মুফতী নূর আহমাদ (দাঃ বাঃ)।
৩৫। আকাইদে উলামায়ে দেওবন্দ - আল্লামা খলীল আহমাদ সাহারানপুরী (রহঃ)।
৩৬। শাজারাতে তাইয়েবাত - হযরত মাওঃ আব্দুল আউয়াল জৌনপুরী (রহঃ)।
৩৭। মাকামে সাহাবা - মুফতী শফী (রহঃ)।
৩৮। বাতিল যুগে যুগে - হযরত মাওঃ ইসহাক ফরীদী (দাঃ বাঃ)।
৩৯। ফাযায়েলে তাওবা - আরেফবিল্লাহ শাহ হাকীম মুহাম্মদ আখতার (দাঃ বাঃ)।
৪০। আল-জাওয়াহেরুল আশারা হাওলাল-মাসাইলিল হাযেরা-মজলিসুল বুহুস আল-ইসলামীয়া বাংলাদেশ।
৪১। ফয়যুল হারাম - মুহিস্সুন্নাহ শাহ সাইয়েদ আবরারুল হক (দাঃ বাঃ)।
৪২। তোহ্ফায়ে ওযু ও নামায - হযরত মাওঃ মাহমুদুল হাসান " (দাঃ বাঃ)।
৪৩। আযান ইকামতের ফাযায়েল, মাসায়েল ও তাজভীদ-মূলঃমাওঃ কারী আবুল হাসান আযমী (দাঃ বাঃ)
৪৪। এহইয়াউ উলুমিদ্দীন (অনূদিত) ১ম খঃ - ইমাম গাযালী (রহঃ)।
৪৫। আহকামে মাইয়েত - আরেফবিল্লাহ ডাঃ আব্দুল হাই (রহঃ)।
৪৬। গুলযারে সুন্নাত - সাইয়েদ আসগর হুসাইন (রহঃ)।
৪৭। মুনাজাতে মাকবুল - (দোআ বিষয়ক সংযোজিত নোস্খা)।
৪৮। ওসীয়তনামা - হযরত মাওঃ আব্দুল কাহ্হার সিদ্দীকী আল-কুরায়শী (দাঃ বাঃ) ফুরফুরা।
৪৯। মোসলেম রত্নহার - সুফী মতি মিয়া ছাহেব-মূলঃহযরত মাওঃ নেছারুদ্দীন ছাহেব (রহঃ) ছারছীনা।
৫০। হাকীকাতুত্তাসাউফ শাইখুল হাদীছ হযরত মাওঃ নূরুল ইসলাম (দাঃ বাঃ)

প্রাপ্তিস্থান

আশ্রাফিয়া/মোসলেম লাইব্রেরী, রাজগঞ্জ, কুমিল্লা।
রশীদিয়া লাইব্রেরী/কুতুবখানায়ে রশীদিয়া, চকবাজার, ঢাকা।
সাউদিয়া কুতুবখানা, চকবাজার, ঢাকা।
মদীনা পাবলিকেশন্স/ আল-এছহাক প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা।
আজীজিয়া কুতুবখানা/হাবীবিয়া বুক ডিপো, বায়তুর মুকাররম, ঢাকা।
ইশাআতে ইসলাম কুতুবখানা, মার্কাযে ইশাআতে ইসলাম, মিরপুর, ঢাকা।
আশ্রাফিয়া লাইব্রেরী / আজীজিয়া কুতুবখানা, আন্দর কিল্লা, চট্টগ্রাম।
রশীদিয়া লাইব্রেরী / মাকতাবায়ে হেজায, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
ইসলামিয়া কুতুবখানা, পোঃ অফিস রোড, ফেনী।
ফয়জিয়া কুতুবখানা, কচুয়া বাজার, চাঁদপুর।
বাস ষ্টাণ্ড মাদ্রাসা, নতুন বাজার, চাঁদপুর।
পেন্নাই ঈদগাহ কওমী মাদ্রাসা, গৌরীপুর, কুমিল্লা।

সংক্ষিপ্তি

মুসঃ	মুসলিম
তাবঃ	তাবরানী
হাঃ	হাকেম
কিঃ কাঃ	কিতাবুল কাবাইর
তিরঃ	তিরমিযী
বুঃ ও মুঃ	বুখারী ও মুসলিম
আহঃ	আহমাদ
ইঃ হাঃ	ইবনে হাব্বান
আঃ ও বাঃ	আহমাদ ও বাযযার
আঃ দাঃ	আবু দাউদ
ইঃ মাঃ	ইবনে মাজা
মিশ ঃ	মিশকাত
বায়ঃ	বায়হাকী
বুঃ	বুখারী
নাঃ	নাসায়ী
বেঃ জেঃ	বেহেশ্‌তী জেওর
এহঃ উঃ	এহ্ইয়াউ উলুমিদ্দীন
তাঃ মাঃ কুঃ	তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন
আঃ ফাঃ	আহসানুল ফাতাওয়া

আলেম, হাফেয ও ইমামদের জন্য সমীচীন হবে, দ্বীনী অনুষ্ঠানে বা জুমআর দিনে এই হাদীসগুলো পড়ে মানুষকে বুঝিয়ে দেয়া।

মাওঃ আঃ বাতেন জৌনপুর (রহঃ)
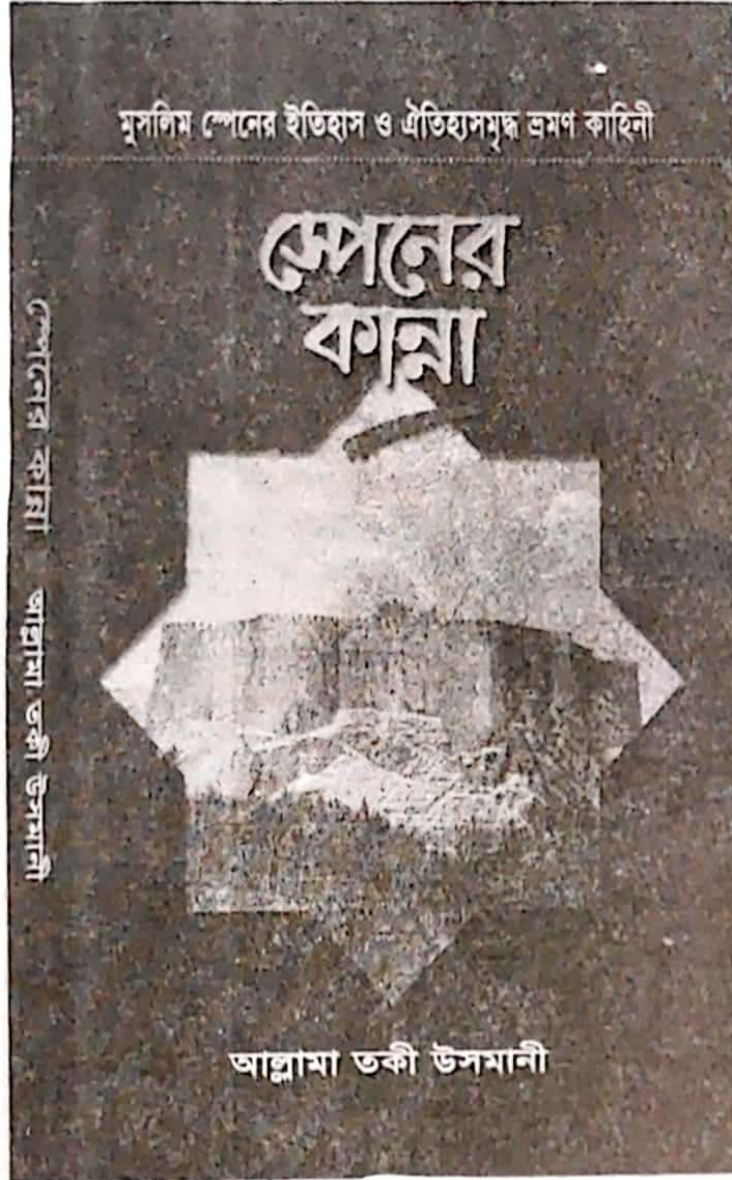
প্রকাশনায়
মৌলানা মুহম্মদ ফজ্লেল জৌনপুরী বিন শেখুত তরীকত মৌলানা
গালিব হুসাইন জৌনপুরী
ঠিকানা
গালিব মান্জিল মুল্লা টোলা জৌনপুর ভারত
+918960084528

(মারকাজ তালিব উল উলুম)